বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত।

Vol. IX. **Shilpa O' Sahitya.** Parts I to XII

শিল্প ও সাহিত্য

সচিত্র মাসিক পত্র

৯ম খণ্ড। ১৩১৬—১৭।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল,
৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

I. A. SCHOOL.

Printed and Published by Shyam Lall Chuckerbuty, 92, Bowbazar Street, Calcutt

সূচীপত্র ।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
অঙ্গুলি (পদ্য)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	২৮
অনুরোধ (ঐ)	ঐ ...	৬৩
অশোকসংক্রান্ত কিম্বদন্তী ।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২২৯
আসিরিয় দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা ।	ঐ	১০২
ইতিহাসের এক অধ্যায় ।	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৬, ৮১, ২০৮
একদিনের গবর্ণর ।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার	৫৩
ঐতিহাসিক তকির্থা ।	ঐ ...	৪৩
কাশীধাম ।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	৫, ২৬, ১৪৪, ১৬৩, ২১২, ২২২
কৃতঘ্নতার পুরস্কার (পদ্য)	শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৫
কে তুমি (পদ্য) ।	দেবশর্ম্মা	১৫১
কেন প্রাণ চাহেনা তোমায় (পদ্য)	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী	১৮৪
কোণার্ক দর্শন ।	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন	১১৫, ১৫১
গণিতের এক পৃষ্ঠা ।	শ্রীগণপতি রায় ...	৮৭
চিদম্বরম্ ।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়	৬৪, ৭৮
চিন্তে পাগলা ।	শ্রীউমাচরণ মিত্র	১০৫, ১৩৬
চীনে সমাধি প্রথা ।	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১
ঠাকুর মা ।	শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা	১৯, ১৮৬
ত্রিবর্ণ চিত্র মুদ্রণ ।	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী ...	১৩
ত্রিবস্তু বিজয় ।	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ...	১
দীন-সঙ্গীত ।	শ্রীমৎ দীনানন্দ স্বামী ...	১৩৫
দ্রাবিড়ী ভাষার প্রাচীনত্ব ।	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	১২৭
নটগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতি (পদ্য)	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
নিবেদন (পদ্য)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৫
প্রকৃতি ও মায়া ।	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন ...	২৯

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
প্রবৃদ্ধি (গল্প)	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভাট্টাচার্য্য	৯৭
প্রস্তর-চিত্রণ ।	শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৩৯, ১১৩, ১৩০, ১৪৮, ১৭৮
প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীঅরবিন্দ দত্ত ...	২১৬
বর্ণচিত্রণ ।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	১৩, ৪৭, ১০৯, ১৫৬
বাঙ্গালায় আর্য্যজাতির আগমন ।	শ্রীবাবুরাম কয়াল	২২১
বালবিধবার আক্ষেপ (পদ্য)	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী	১২৬
বৃষভাষ্টকং ।	শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী ...	৭১
ভাস্কর্য্য ।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	৩১, ৭২, ১৩১, ১৮৮
শান্তি (পদ্য)	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী ...	১৮৪
শিল্প ও শিল্পী ।	শ্রীঅরবিন্দ দত্ত ...	২০৬
শিক্ষা ।	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব ...	৯১
শিক্ষা-রহস্য ।	ঐ ...	৪২, ১৮০, ২২৬
শ্যামাসঙ্গীত ।	শ্যামানন্দ ...	১৮০, ১৮৫
সন্দেহ (গল্প)	শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়	১৬৯
সমালোচনা ।		৮৯, ১৮৪
সমুদ্র ।	শ্রীউমাচরণ মিত্র ...	৫৬
সূর্য্যমুখী (পদ্য)	শ্রী— ...	৫৩
হাট বাজার ।	শ্রীঅরবিন্দ দত্ত ...	২১৩

চিত্রসূচী ।

১ ।	ত্রিবর্ণচিত্র	১
২ ।	সারনাথস্তূপ ও মণিকর্ণিকা ...	২৫
৩ ।	উষারস্বপ্ন	৪৭
৪ ।	কোণার্কের অন্তর্গত অশ্বদ্বার ...	৭১
৫ ।	শিক্ষা (চিত্রচালক) ১ম ও ২য় আদর্শ	৯১
৬ ।	চীনের সমাধিপ্রথা	১১৫
৭ ।	কোণার্কে জগমোহন	১৩৫
৮ ।	কোণার্কের ভোগমণ্ডপ ...	১৫০
৯ ।	ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম	১৬৪
১০ ।	স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ...	১৮৬
১১ ।	স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	২১৪
১২ ।	বত্তিশখাম্বা বথরিয়াকুণ্ড । ...	২১৫

১১খানি স্বর্ণ ও ৯খানি রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

(স্থাপিত ১৮৯৫ খৃঃ অব্দ)

৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জেনারেল ক্লাস ঃ—ড্রয়িং, পেণ্টিং, এনগ্রেভিং, লিথো, ফটো ড্রাফটস্‌ম্যান ড্রয়িং ও আর্ট-প্রিণ্টিং আদি বিষয় প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তীর অধ্যক্ষতায় অন্যান্য বিজ্ঞ শিল্পিগণকর্ত্তৃক নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ৵১০ অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ আবেদন করুন।

শ্রীগোপীকান্ত সেন—ম্যানেজার।

সাধারণের বিশেষ সুবিধা ঃ—অর্থব্যয় করিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইবে না। প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসে উডএন্‌গ্রেভিং, হাফটোন, ইলেক্‌ট্রো-ব্লক, কপারপ্লেট, ফটোগ্রাফ, ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট, অয়েল পেণ্টিং ও আর্ট প্রিণ্টি আদি কার্য্য অতি সুলভে ও সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে মুদ্রিত মূল্যতালিকা পাইবেন।

এস, লাল ব্রাদার্স—ম্যানেজার্স। ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত

শিল্প ও সাহিত্য।

সচিত্র মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তীদ্বারা সম্পাদিত, বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ ইহাতে নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। ৶০ তিন আনার ডাঃ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে নমুনা পাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র গুপ্ত বৈদ্যরত্ন—কার্য্যাধ্যক্ষ।

আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফিশিক্ষা ১ম ভাগ।

৪র্থ সংস্করণ। শিল্প ও সাহিত্য সম্পাদক বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহার নূতন পরিচয় কি দিব? ঘরে বসিয়া ফটো শিখিবার ইহাই একমাত্র পুস্তক। সর্ব্বত্র একবাক্যে প্রশংসিত। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

ছায়া-বিজ্ঞান—ফটোগ্রাফিশিক্ষা ২য় ভাগ।

আলোকচিত্রণে যাহা নাই, ইহাতে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু তাহাই বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য।

স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, সুন্দর বাঁধান ও শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকার সুরঞ্জিত চিত্রসহ মূল্য ৸০ বার আনা। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। এ ধরণের পুস্তক এই নূতন। হিতবাদী, সময়, টেলিগ্রাম, এডুকেশন গেজেট ও অন্যান্য সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে সমালোচিত।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল,—৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

শিল্প ও সাহিত্য।

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৯ম খণ্ড } সন ১৩১৬—আশ্বিন। { ১ম স

ত্রিরত্ন-বিজয়।

(গত বর্ষের ২২৪ পৃষ্ঠার পর)

নৈরাশ্য।

সন্ধ্যারাগরঞ্জিত পশ্চিম গগনে কয়েকটী উজ্জ্বল নক্ষত্র-স্নিগ্ধ আলোক ছড়াইয়া—পূর্ব্বগগনে নবোদিত মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের অভ্যর্থনা করিতেছে—শোণভদ্রের মন্দমারুতান্দোলিত ক্ষুদ্রকায় বীচিমালার অস্ফুটধ্বনির সহিত মিশাইয়া মিশাইয়া—সুদূর সঞ্চারী পাপিয়ার স্বর লহরী কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে, শোণ-ভদ্রের পশ্চিম তীরে বিন্ধ্যের পাদমালার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যশৃঙ্গের উপরে—একটী দুর্গের প্রাকারো-পরিস্থিত প্রাসাদের মুক্ত বাতায়নে বসিয়া—একাকিনী কুণ্ডলেশ্বর দুহিতা—উদাস হৃদয়ে লক্ষ্যহীনদৃষ্টিতে সম্মুখে বিস্তৃত শোণভদ্রেরদিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছেন? ভাবিতেছেন—তাহা কিরূপে বুঝিব? কিন্তু তাহা বিষাদ রেখাঙ্কিত আপাণ্ডুর ললাটের নিম্নে জ্যোতির্ম্ময় অথচ স্থির নয়নদুটীর দিকে চাহিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজকুমারী মণিমঞ্জরী গভীর ভাবনা সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছেন,—গৃহমধ্যে একটীমাত্র দীপ—অল্পমাত্রায় অলোক বিকিরণ করিতেছে, গৃহে আর কেহ নাই, মধ্যে মধ্যে রাজকুমারী সেই গভীর চিন্তার ভার কোনক্রমে যেন সরাইয়া সেই গৃহের ভিতর হইতে রুদ্ধ কপাটের প্রতি এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন যে, তাহা দেখিলে অনুমান হয় যেন তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই রুদ্ধ দ্বারে কাহারও করাঘাত শব্দের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাস্তবিক তাই,—অনতিবিলম্বে সেই দ্বারে বাহির হইতে আস্তে আস্তে কেহ যেন আঘাত করিল, শব্দ শুনিবামাত্র

DAMAGED.

কুমারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, দ্বার খুলিবামাত্র কুন্তলা দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বায়ুবেগবিতাড়িত ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় রাজকুমারীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, বহুদিন পরে কুন্তলার সহিত রাজকুমারীর সাক্ষাৎ হইয়াছে কোথায় কুন্তলা আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে, কত অপেক্ষিত সুসমাচার শুনাইয়া তাঁহার কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিবে, রাজধানীতে রাজকুমার অশোকের নূতন সিংহাসনারোহণের আনন্দময় বার্ত্তায় তাঁহার প্রাণ পুলকিত করিবে, তাহা নহে, কুন্তলা গৃহে প্রবেশ করিয়াই রাজকুমারীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, কুন্তলাকে উঠাইয়া নিজের কোলের উপর তাহার মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং অঞ্চল দিয়া তাহার নয়নের দরদরিত অশ্রুধারা মুছাইতে মুছাইতে আবেগ কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুন্তলে! আজ প্রাতঃকালে তুমি এই দুর্গে আসিয়াছ আর এখন রাত্রি হইয়াছে—ইহার মধ্যে কি এ হতভাগিনীর সহিত দেখা করিবার একক্ষণও অবসর পাইলে না? বল কুন্তলে, এ কিরূপ ব্যবহার? আমি যে কি ভাবে এতটা সময় কাটাইয়াছি তাহা যদি তুমি বুঝিতে তাহা হইলে কখনই এত বিলম্ব করিতে না।

তখন ধীরে ধীরে রোদনের প্রথম বেগকে প্রশমিত করিয়া কুন্তলা উঠিয়া বসিল এবং অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে রাজকুমারীকে বিনীতভাবে প্রণাম করিল, তাহার পর তাঁহার তীব্রোকণ্ঠাবিস্ফারিত—সমুজ্জ্বল—জ্যোতির্ম্ময় নয়নের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল।

রাজকুমারি! আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন এখানে আসিয়া এ পর্য্যন্ত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় যে আমি মনে মনে কিরূপ বেদনা অনুভব করিয়াছি, তাহা আমি ছাড়া আর কে বুঝিবে! যাক্ সে কথা, আমি কাল প্রাতঃকালেই এখান হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ পাইয়াছি, আপনার নিকট অনেক কথা বলিবার আছে আপনি ধীর হইয়া শুনুন।

কুন্তলার সহিত আবার বিয়োগ—এবং সেই বিয়োগ প্রাতঃকাল হইতেই আরম্ভ হইবে, এ কথা কুন্তলার মুখে শুনিয়া রাজকুমারী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কেন কে এই প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া তাঁহার এই প্রকার বৈরাচরণ করিতেছে—ইহা জানিবার জন্য রাজকুমারী নিতান্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তখন কুন্তলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল ও রাজকুমারীর হাত ধরিয়া আবার সেই উন্মুক্ত বাতায়নের কাছে গিয়া বসিল, এবং ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—সে বলিল—

"রাজকুমারি আমি সংক্ষেপে বলিয়া যাই—অনেক কাজের কথা আছে, বিস্তার করিয়া বলিতে হইলে একরাত্রিতে কুলাইবে না, আপনি মন দিয়া শুনুন, আপনাকে এই দুর্গে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজকুমার—আর রাজকুমারই বা বলি কেন? ভারতসম্রাট অশোক এইস্থান হইতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন আমি তাঁহার সহিত ভিক্ষুণীর বেশ ধরিয়া শিবিরে গিয়াছিলাম—তাহার পর সেই রাত্রিতেই পাটলীপুত্রে মন্ত্রী রাধগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাটলীপুত্রে যাই মন্ত্রী রাধগুপ্তের সুব্যবস্থার

প্রসাদে—তাহার পরদিনই একশতজন অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে কুমার অশোক সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রাজধানীতে প্রবেশ করেন এদিকে সকল ব্যবস্থাই পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল। সেই রাত্রিতেই নগররক্ষী সেনাগণের সাহায্যে রাজপ্রাসাদ অবরোধ করা হইল বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই হইবার সম্ভাবনাও ছিল না, অচিরেই রাজপ্রাসাদ হস্তগত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সুষীমের সিংহাসনে কুমার আরোহণ করিলেন, ওদিকে সুষীমের অঙ্গরক্ষী সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া পরদিন সায়ংকালে রাজধানীতে লইয়া আসিল সুষীম এক্ষণে রাজগৃহের দুর্গে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। ভবিষ্যতে তাঁহার ভাগ্যে কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। যাহা হউক এই সকল ব্যাপারে এক সপ্তাহকাল অতীত হইয়া গেল, কুমার মহেন্দ্রের সেনাদল বিনাবাধায় শোণভদ্র পার হইয়া অষ্টম দিবসে রাজধানীতে উপস্থিত হইল, কুমার মহেন্দ্র এখনও পাটলীপুত্রেই রহিয়াছেন আমি ঐ কয়দিনের মধ্যে বহু চেষ্টা করিয়াও সম্রাটের দর্শন লাভ করিতে পারিলাম না। এই ভাবে আরও দুইদিন কাটিয়া গেল পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি—সম্রাট একজন দাসী পাঠাইয়া দিয়াছেন, আদেশ—আমি তখনই তাঁহার দর্শন করি তাড়াতাড়ি হাতে মুখে জল দিয়াই আমি সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে কিন্তু আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কুন্তলা রাজকুমারীর মুখেরদিকে বিস্ফারিত নয়নে আরএকবার তাকাইল এবং কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল।

"চুপ করিলে কেন কুন্তলে তুমি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া যাও আমার ভাগ্যে বিধাতা সুখ লিখেন নাই, ইহা আমি বহুপূর্ব্ব হইতেই জানি। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে এখন তুমি যাহা বলিবে তাহা আমার পক্ষে শুভকর নহে। যাহাই হউক কুন্তলে আমি বিপদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত আছি তুমি নির্ভয়ে বল।

এই কথা বলিয়া রাজকুমারী আবার কুন্তলার মুখের দিকে তাকাইলেন, কুন্তলা আবার বলিতে লাগিল।

"রাজকুমারী! কুন্তলা আপানার আজন্ম দাসী, আপনার দুঃখ দেখিলে আমার আর একক্ষণও বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না। আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরা তাই আপনাকে ক্লেশ দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। রাজকুমারী ক্ষমা করিবেন একটা কথা বলি কিছু মনে করিবেন না, রাজকুমারি আপনি কেন কুমার—না না সম্রাটকে—ভুলিয়া যান না। ভারতে ভগবান্ শাক্যসিংহের পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারে আজ সত্য যুগ আসিয়াছে অনেক মহাকুলের রমণী সংসারের মায়া মমতা ভাসাইয়া জীবোদ্ধারের জন্য ধর্ম্মসঙ্ঘে আশ্রয় লইয়াছেন ও নারীজাতির নাম গৌরবোজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন। আপনিও কেন সেই পথ অবলম্বন করুন না, এই অকিঞ্চন সেবিকাও তাহা হইলে আপনার চিরসঙ্গিনী হইয়া জীবনের শেষ কটা দিন বেশ শান্তি সুখে কাটাইয়া যাইতে পারি।

কুন্তলার কথা শেষ হইতে না হইতে রাজকুমারী বাধা দিলেন, ঔদাস্যপূর্ণ জলভারাবনত নয়নদ্বয় অঞ্চলে

মুছিয়া তিনি কম্পিত স্বরে কহিলেন কুন্তলে আমি বুঝিয়াছি যে এ হতভাগিনীর ভাগ্যে পত্নী হইয়া কুমারের চরণ সেবা ঘটিয়া উঠিবে না যাহা ঘটিবার তাহাত ঘটিয়াছে সখি! আমার বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? জীবন থাকিতে আমি যখন তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না—তখন, আমাকে পরিব্রাজিকা হইতে উপদেশ দিয়া কি ফল? তাঁহার দাসী হইবার আশা যে মূহূর্ত্তে আমাকে ছাড়িবে সেই মূহূর্ত্তের পরে এ জগতে আমাকে আর কেহ জীবিত দেখিতে পাইবে না, সুতরাং নির্ভয়ে সব বলিয়া যাও, কোন কথা গোপন করিও না, আমি যে দিন কুমারের বিনা অনুমতিতে পাটলীপুত্রের রাজান্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই দিনই বুঝিতে পারিয়াছি যে আমার কপাল চিরদিনের মত পুড়িয়াছে।

এই বলিয়া ভাবাবেশে বিহ্বল রাজকুমারী কুন্তলার কণ্ঠ বাহুদ্বয় দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন, দরদরিত অশ্রুধারায় তাহার সুন্দর মুখখানি বর্ষা বারিশিক্ত শতদলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, এইভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল, অনেকক্ষণ পরে দুইজনেই কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন রাজকুমারীর বাহুপাশ হইতে নিজের কণ্ঠ অপসারিত করিয়া কুন্তলা আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

"রাজকুমারি! সম্রাট আমাকে দেখিয়া যেন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, আমি ভয়ে ভয়ে অভিবাদন করিয়া মাটিরদিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটা অতর্কিত ভয়ের কেমন একটা বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি যেন আমার চক্ষের সম্মুখে অন্যান্য সকল পদার্থকে যবনিকার ন্যায় আবরণ করিয়া রহিল একখানি পত্র আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন কুন্তলে দেখদেখি এই পত্রখানায় কি লিখিত আছে?

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মর্ম্মর রচিত কুট্টিম হইতে পত্রখানি কুড়াইয়া লইলাম। পড়িবামাত্রই বুঝিলাম যে কুমার মহেন্দ্র তোমাকে যে পত্রখানি তাঁহার গুপ্তচর দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন; ইহা সেই পত্র, রাজকুমারি আমি তখনই আপনাকে বলিয়াছিলাম যে ঐ পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলুন আপনি নিশ্চয়ই তাহা করেন নাই, সে পত্র সম্রাটের হস্তগত হইল কিরূপে?

"তাঁহার হস্তগত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে—শোণভদ্রবিহারে তিনি যে সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন সেই সময় আমার বিছানার উপরই ঐ পত্রখানা পড়িয়াছিল, তাহার পর তিনি ঘরে বসিয়া রহিলেন পরিব্রাজিকা সজ্জমতি ক্ষণকালের জন্য আমাকে বিশেষ কার্য্যের জন্য ডাকিয়া পাঠান আমি আবার গৃহে আসিয়া দেখিলাম রাজকুমার সে গৃহে নাই তিনি আমাকে না বলিয়াই বিহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এতটা তখন ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই—বাস্তবিকই তিনি আমাকে না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন, বাহিরে তাড়াতাড়ি আসিয়া শুনিলাম রাজকুমার তোমাকে সঙ্গে লইয়া শিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন, কেন এমন হইল তাহা ভাবিয়া তখন কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, পত্রখানির কথা আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তিনি যে আমাকে না জানাইয়া আমার নামে প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিতে

পারেন সে ভাবনা একক্ষণের জন্যও আমার মনে এ পর্য্যন্ত কখনও উঠে নাই, আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার সকলই মনে পড়িতেছে। তোমাদের যাওয়ার দুইদিন পরেই আদেশ হইল যে, আমার শোণভদ্র-বিহারে থাকা হইবে না, এই গিরিদুর্গে বন্দিনী হইয়া সে অবধি আমি বাস করিতেছি, কেন বন্দিনী হইলাম, কাহার আদেশে এমন হইল, কতদিন আমাকে এখানে এই ভাবে কাটাইতে হইবে—তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহারা আমার পরিচর্য্যা করে, তাহারা স্ত্রীলোক হইয়াও কি জানি কেন আমার সহিত কোন কথা কহে না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেবল হাসে, কিন্তু, কোন জবাব দেয় না। এসব কি কুন্তলে, আমিত তাহা বুঝি না; আমাকে কোন অপরাধে অপরাধিনী করিয়া রাজ-রাজেশ্বর প্রাণেশ্বর এমন করিয়া আমাকে বন্দিনী করিয়াছেন, সখি, তুমি যদি তাহা জানিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্ব না করিয়া এখনি খুলিয়া বল; আমি দীনদুঃখিনী হইলেও রাজনন্দিনী! এ অপমান এ ক্লেশ আর আমি সহিতে পারি না, এই বলিয়া রাজকুমারী মণিমঞ্জরী হৃদয়ের তীব্র আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছিন্ন লতিকার ন্যায় ভূমিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ—

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

কৃতঘ্নতার পুরস্কার।

সংসার-সমরে যুদ্ধ পারি করিবারে,
অনলে, সাগরে পারি করিতে প্রবেশ;
অনায়াসে গিরি-শৃঙ্গে পারি আরোহিতে—
সহিতে পারি না শুধু কৃতঘ্নের হাসি।
যা'র অন্নে পরিপুষ্ট শরীর তাহার,
যা'র বস্ত্রে আবরিত লজ্জাটুকু তা'র
যাহার দয়ায় তা'র অর্থ ও গৌরব
তারি দ্বেষ করিবে যে--সে কি সহ্য হয়?
যে করেছে উপকার অযাচিত ভাবে,
রোগে, শোকে, শ্মশানেতে যে জন সুহৃদ,
ঝঞ্ঝাবাতে উল্কাপাতে যে দেছে আশ্রয়,
তা'রি হিংসা করিবে যে, সে কি কভু নর?
বিষধর অহি বলি' খেদাইব তা'য়,
ক্ষতি বৃদ্ধি নাহি মানি যদি ধর্ম্ম যায়!!!

শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

কাশীধাম।

(গত বর্ষের ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ জেমশ্ প্রিনসেপ একবার কাশীর এই বর্ত্তমান সহর বেনারসের মন্দিরাদির এক হিসাব-পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে জানা যায়—তখন কেবল এই সহরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য প্রায় ১০০০এক সহস্র হিন্দুমন্দির ও ৩৩৩টী মোসলমানদিগের মসজিদ্ ছিল। অনন্তর তাহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে, এখন হইতে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ শেরিং যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত মন্দির ও মস্‌জিদের সংখ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন এও এক মোটামুটী

হিসাব মাত্র। তবে যতদূর সম্ভব তিনি নির্ভুল হিসাব দিবার জন্যই প্রয়াস পাইয়াছেন।

মহল্লা।	মন্দির।	মস্‌জিদ্‌।
কোতোয়ালি	২৬১	১৯
কাল ভৈরব	২১৬	২০
আদমপুরা	৪৮	৫৪
জৈৎপুরা	৩০	৯৭
চেৎগঞ্জ	৫৩	৩২
ভেলুপুরা	১৫৪	১৬
দশাশ্বমেধ	৬৯২	৩৪
	১৪৫৪	২৭২

ইহার পর ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে এখন হইতে প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে বেনারসের একজন প্রাচীন অধিবাসী (পুস্তকে তাহার নাম নাই) "বেনারাস গাইডবুক" নামে যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে তিনি ১৫৫০টী মন্দির ও ৩০০ তিনশত মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আরও বলিয়াছেন যে, এখন নিত্যই মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

এই সকল হিসাব হইতে কাশীর আধুনিক মন্দির-সংখ্যা এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। বহু কাশীবাসী শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিলাম, আজ কাল মন্দির সংখ্যা এই বারাণসীর মধ্যে প্রায় চারি হাজারেরও অধিক। ইহা অসম্ভব নহে। এসকল ব্যতীত এমন অনেক ক্ষুদ্র ও সামান্য সামান্য মন্দির আছে, যাহা প্রকৃতই গণনাতীত। কথিত আছে, এক সময় জয়পুরের মহারাজ মানসিংহ একদিনে এক লক্ষ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। (মিঃ শেরিংও সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন।) সেই মন্দির-গুলি একদিনেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজ মানসিংহ বহু প্রস্তর-শিল্পীকে তাহা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেন। তাহারা এক এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া তাহারই মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ সমন্বিত মন্দির খোদিত করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে লক্ষ শিবমন্দির নির্ম্মিত হইলে, তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সকল মন্দিরাভাস বেনারসের নানাস্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বহু মন্দির-খোদিত এক-খানি প্রশস্ত প্রস্তর মানমন্দিরের নিকট দশাশ্বমেধঘাটে রক্ষিত আছে। যাহা হউক যে সকল মন্দির ও শিবলিঙ্গ নিত্য পুষ্পাক্ষত-গঙ্গাজলে পূজিত হয়, তাহা বোধ হয়, কাশীবাসী জনমণ্ডলীর সংখ্যারও তিন চারি গুণ অধিক হইবে।

বিশ্বেশ্বর-মন্দির।

এই মন্দিরসমূহের মধ্যে বিশ্বেশ্বর মন্দিরই সর্ব্ব-প্রথম উল্লেখযোগ্য। অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব মন্দির ধ্বংস হইবার পর, প্রাতঃস্মরণীয়া অমর-কীর্ত্তিবতী ইন্দোরেশ্বরী শ্রীমতি অহল্যাবাই বিশ্বেশ্বরের এই বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহার উচ্চতার পরিমান ৫১ ফিট। অনন্তর পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহার চূড়াগুলি স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, মহারাজ যাহাকে এই কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ সুবর্ণের পরিবর্ত্তে তাম্রমণ্ডিত করিয়া তাহার উপর সূক্ষ্ম সুবর্ণ স্তবক

মাত্র বসাইয়া দিয়াছেন ও অবশিষ্ট অর্থ আত্মসাৎ করিয়া অসি-সঙ্গম সন্নিধে নিজের এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক সেই অবধি বিশ্বেশ্বরের এই মন্দিরকে সকলেই (বিশে-ষতঃ য়ুরোপীয়গণ) 'Golden temple' বা স্বর্ণ-মন্দির বলিয়া আসিতেছেন।

বিশ্বেশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া "Hand book of Bengal"এর রচয়ীতা Edward B. Eastwick, তাহার পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠায় এক বিচিত্র অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বের+ঈশ্বর—বিশ্বেশ্বর না বলিয়া বিষ ও ঈশ্বর বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ সমুদ্রমন্থনকালে শিব বিষ খাইয়াছিলেন, সেই কারণ বিশ্বেশ্বর হইয়াছেন, ইত্যাদি বলিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের এ এক বিচিত্র অর্থ নহে কি?

ভারতের অন্যান্য তীর্থ হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করিলে এক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থানে দর্শকের নিকট হইতে কোনরূপ দর্শনী বা 'tax' আদায় করিবার কড়াকড়ি নিয়ম নাই। আমাদের কালীঘাটের কালী-মন্দির বা অন্যান্য বহু মন্দিরের দ্বারদেশে সাক্ষাৎ কালের অনুচর-স্বরূপ যেমন একজন ব্রাহ্মণ দ্বাররক্ষক দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের নিকট হইতেই প্রত্যেকবার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পয়সা আদায় করে, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। যাহার যতবার ইচ্ছা বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া আসিতে পারেন, কেহ কোন বাধা আপত্তি করিবেন না। মন্দিরমধ্যে পূজারী বা পাণ্ডার লোকজনও পূজা ও দক্ষিণার জন্য কোনরূপ জিদ্‌ করেন না। যাহার যাহা অভিরুচি তিনি তাহাই দিতে পারেন, কিছু না দিলেও কেহ কোন কথা বলে না। বহু ব্যক্তি কেবল গন্ধাক্ষতবিল্বপত্রেই বাবার পূজা করিয়া আসিতেছে।

বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডাবংশে এখন কোন পুরুষ জীবিত নাই, কেবলমাত্র দুইটী বিধবা রমণীই লোকজন রাখিয়া বিশ্বনাথের সেবায়েতরূপে সেবা করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদেরই কোনও দূর আত্মীয়ের হস্তে মন্দিরের পরিদর্শন ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

বিশ্বনাথের মন্দিরমধ্যে একটী চতুষ্কোণ গহ্বর আছে, উহা দৈর্ঘ্য বিস্তারে দুই হস্ত এবং গভীরতায় প্রায় এক হস্ত পরিমিত হইবে। উহা কখন কখন সমৃদ্ধিশালী জনমণ্ডলীকর্ত্তৃক নানা রত্ন ও অলঙ্কার অথবা টাকা, কড়ি বা পয়সায় পূর্ণ করিয়া বিশ্বনাথকে উৎসর্গ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, কেবল মাত্র মহারাজ রণজীৎ সিংহই উহাতে স্বর্ণ-মুদ্রায় বা মোহরে পূর্ণ করিয়া দিয়া ছিলেন, কয়েক ব্যক্তি রজত মুদ্রা বা টাকায় পূর্ণ করিয়া ছিলেম এবং অনেকে তাম্র মুদ্রা বা পয়সা দ্বারাও পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ অর্থের সৎব্যবহার করিয়াছিলেন!

বিশ্বেশ্বরের সেবায় বহু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, কেহ মন্দির ধৌত ও পরিষ্কারের জন্য, কেহ নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য, কেহ চামর, কেহ ঘণ্টা, কেহ শিঙ্গা, কেহ শঙ্খ, ঢক্কা প্রভৃতি বাজাইবার জন্য, কেহ বা পূজা, কেহ আরত্রিকাদি নানা কার্য্যের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন।

বহু স্থানে দেব বিগ্রহের পুজা ও আরতি দেখিয়াছি, কিন্তু বিশ্বনাথের আরতি প্রকৃতই এক অদ্ভূত ও দেখিবার জিনিষ। তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে, ঠিক

বুঝিবার উপায় নাই। সেই প্রাণ-মন-মোহিতকর পবিত্র স্তোত্র—কেমন একস্বরে বিশুদ্ধ তাল লয়ে, নাগরা ও ঘণ্টা ধ্বনির সহিত তালে তালে মিলিত হইয়া গীত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই বাবা বিশ্বনাথের চারিধারে কত সন্ন্যাসী, সাধু, ব্রাহ্মণ, পুজারী একাগ্রচিত্তে ভক্তি ভরে সেই স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আরতি-প্রদীপ হস্তে বাবাকে আরতি করিতেছে। সে ভাব দর্শকের হৃদয়ে সেই অল্পক্ষণের জন্য যেন উন্মত্ত করিয়া তুলে, অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় তাহা দেখিয়া বিগলিত হইয়া যায়। বাস্তবিক সে ভাব বর্ণনা করা বোধ হয় মনুষ্যের ভাষাতীত।

বিশ্বনাথের এই মন্দির ও নাট মন্দির আশানুরূপ যথেষ্ট বিস্তৃত নহে, পূর্ব্ব মন্দিরের এক চতুর্থাংশ হইতেও ইহা ক্ষুদ্র। স্থানাভাবই ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ব মন্দির কলুষিত ও বিনষ্ট হইবার পর, নিকটে সম্ভবতঃ সেরূপ বিস্তৃত স্থান একেবারেই পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ ভক্তবৃন্দ বাবার স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব অবগত হইয়াছিলাম। অতএব এই সল্প বিস্তৃত স্থানেই তাঁহার মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

মন্দির মধ্যে যে সকল ঘণ্টা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট সেটী নেপাল মহারাজকর্ত্তৃক উৎসর্গিত হইয়াছে। মন্দির মধ্যে রাণী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক একটী লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছে।

শিব-সভা।

এই মন্দিরের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে একটী স্বতন্ত্র দ্বারবিহীন গৃহমধ্যে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ শ্রেণীবদ্ধভাবে একত্র রহিয়াছে। স্থানীয় লোক ইহাকে শিব-সভা বা শিবের কাছারী বলিয়া অভিহিত করে। এই সকল শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তিগুলির মধ্যে এরূপ বহুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেগুলি দেখিলে বহুকালের প্রাচীন লিঙ্গ বলিয়া মনে হয়। অনেকে বলেন, প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দির কুতব কর্ত্তৃত বিচূর্ণ হইবার সময় পাণ্ডা ও পূজারীগণ এই মূর্ত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া ছিল। পরে এই শিব-সভায় রক্ষা করিয়াছে। ইহার মধ্যে একটী দীর্ঘ্য শ্মশ্রু বিশিষ্ট মূর্ত্তি অনেক দিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেটী বিশ্বনাথের একজন ভক্ত সন্ন্যাসী পূজারীর প্রতিমূর্ত্তি। পূজা করণান্তর শিবমন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার শিবত্ব লাভ হয়।

জ্ঞানবাপী।

বিশ্বনাথের মন্দিরের ঠিক উত্তর পার্শ্বে বিস্তৃত ক্ষেত্রে এক প্রকাণ্ড কুপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকেই সকলে জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকুপ বলে। ইহার গভীরতা জলের উপর পর্য্যন্ত প্রায় ৫৫ ফিট হইবে, কুপের মধ্যে নামিবার এক সোপানশ্রেণী আছে। কিন্তু তাহার দ্বার সততঃ তালা বন্ধ থাকে, কখন কখন কুপ পরিষ্কার করিবার জন্য তাহার ব্যবহার হয়। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। কথিত আছে, কোন কালে একাধিক্রমে

দ্বাদশ বর্ষ বা এক যুগব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়ায় কাশীরাজ্য বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন একজন মহাতপা ঋষি অন্যান্য বহু সহস্র ঋষিকে সমবেত করিয়া শিবের আরাধনা করেন ও আরাধনায় সিদ্ধ হইলে, শিবের আদেশ অনুসারে এই কুপ খনন করান, তাহাতে কাশীরাজ্যবাসীর জীবন রক্ষা হয়। সেই অবধি প্রবাদ আছে, দেবাদিদেব শিব চির দিনই এই স্থানে অবস্থান করিবেন; সেই ভক্তের নিকট তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কাশীখণ্ডে ৩৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, "রুদ্ররূপী ঈশান ত্রিশূল দ্বারা এই স্থানের ভুমি খনন করিয়া একটী কুণ্ড নির্ম্মান করতঃ জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপী মহালিঙ্গকে সেই কুণ্ড হইতে সহস্র কলস জল লইয়া স্নান করাইলেন, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া রুদ্রকে বর দিলেন যে, আমার শিব শব্দের অর্থ জ্ঞান, সেই জ্ঞানই এখানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এইজন্য এই তীর্থ জ্ঞানদ নামে অভিহিত হইবে। এই তীর্থ স্পর্শে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট ও আচমন করিলে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। ইহার নাম যথাক্রমে শিব তীর্থ, জ্ঞান তীর্থ, তারক তীর্থ ও মোক্ষ তীর্থ। এই তীর্থ-জলে শবলিঙ্গ স্নান করাইলে সর্ব্ব তীর্থের ফল লাভ হয়। আমি এই স্থানে জ্ঞান স্বরূপ দ্রবমূর্ত্তিতে জীবের জড়তা বিনাশ করিয়া জ্ঞানোপদেশ প্রদান করি।" পরবর্ত্তী ৩৪ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "দণ্ডনায়ক এই জ্ঞানাব্যাপীর জল দুর্ব্বৃত্তগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সুভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয় দুর্ব্বৃত্তগণের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে, শাস্ত্রে মহাদেবের যে অষ্টমূর্ত্তির বিষয় উক্ত আছে, জ্ঞানবাপী তাহারই অন্যতম জলময়ী মূর্ত্তি।"

এতদ্ব্যতীত যখন দুষ্ট যবন বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির নষ্ট করে, তখন একজন পাণ্ডা বিশ্বনাথের পবিত্র মূর্ত্তি কলুষিত হইবার আশঙ্কায় গোপনে এই কুপমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করেন। কেহ কেহ বলেন কালাপাহাড় কাশীর দেব মন্দির গুলি ধ্বংস করিবার সময় বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞানব্যাপীর জলে বিলীন হইয়াছিলেন, অনন্তর বিশ্বনাথের পরম ভক্ত নারায়ণ ভট্ট জনৈক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানব্যাপীর দক্ষিণে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নব বাণলিঙ্গ স্থাপন করেন। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতানুসারে ভগবান বিশ্বনাথ সেই বাণালিঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই সকল কারণে জ্ঞানবাপী ভক্তের অতি পূজার্হ। এখনও লোকে বিশ্বনাথের উদ্দেশে এই কুপমধ্যে পুষ্প চন্দন বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিয়া থাকে। নিত্য পুষ্প ও পত্রাদি পড়িয়া কুপের জল দুর্গন্ধ হইয়া যায়, সেই কারণ উহার উপর লৌহের জাল দিয়া এক্ষণে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে, একখণ্ড বস্ত্র সততঃ তাহার উপর বিস্তৃত থাকে। যাহা কিছু ফুল পত্র তাহারই উপর পতিত হয়। ইহাতে কুপের জল সেরূপ দুষিত হইতে পারে না। যাত্রীগণ ভক্তিভরে এই জল বিশ্বনাথের চরণামৃত বোধে পান করে।

এই পবিত্র কুপের উপর ১৮২৮ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়ারপতি মহারাজ দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার বিধবা মহিষী পুণ্যবতী মহারাণী বৈজাবাই একটী বিস্তৃত দালান প্রস্তুত করিয়া দেন। দালানের ছাদটী প্রতি-

সারে দশ দশটী করিয়া, চারি সারে মোট চল্লিশটী অনুচ্চ প্রস্তর স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এই দালানের মধ্যে সন্ন্যাসী যাত্রীগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

নন্দী বা বিশ্বনাথের শাঁড়।

পুণ্যসলিল-গর্ভা জ্ঞানবাপীর পূর্ব্ব পার্শ্বে বিশ্বনাথ বাহন এক প্রকাণ্ড প্রস্তর বৃষ উত্তরাস্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা শায়িত অবস্থাতেও উচ্চে প্রায় সাত ফুট হইবে। নেপালের মহারাজ কর্ত্তৃক এই বৃষ-মূর্ত্তিটী স্থাপিত হয়। কিন্তু কোন মহারাজ কোন সময়ে ইহার স্থাপনা করেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই ; তবে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও যে ইহা স্থাপিত ছিল, তাহা এক কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ যখন দুষ্ট যবন কর্ত্তৃক বিশ্বনাথের পূর্ব্ব মন্দির ও মূর্ত্তিসমূহ বিনষ্ট হইতেছিল সেই সময় এই প্রস্তর বৃষ কি এক দেববলে চৈতন্য লাভ করিয়া বিকট নাদে চিৎকার করিয়াছিল। এখনও বৃষের মুখ সেই পূর্ব্ব মন্দিরের প্রতিই বা বর্ত্তমান মসজিদেরদিকেই রহিয়াছে।

হর-পার্ব্বতী।

ইহার নিকটেই শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত এক হর-গৌরি মূর্ত্তি আছে। মিঃ শেরিং বলিয়াছেন ইহা "হায়দ্রাবাদের রাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে," কিন্তু 'হ্যাণ্ডবুক অফ বেঙ্গলের' রচয়িতা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, হায়দ্রাবাদে সেরূপ কোন রাণী কখনই ছিলেন না। কিন্তু আমার বিশ্বাস হায়দ্রাবাদাধিপতি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অনেক সময় তাঁহার মন্ত্রি হিন্দুই হইয়া থাকেন এবং মহামান্য নিজাম কর্ত্তৃক মহারাজ উপাধিতে তিনি সম্মানিত হইয়া থাকেন ; সুতরাং মন্ত্রিপত্নী মহারাণী বা 'রাণী' সম্মানে অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন সময়ে এইরূপ কোন মন্ত্রিমহিষী 'রাণী' কর্ত্তৃক ইহা যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি ?

অক্ষয় বট।

এই বৃষ-মূর্ত্তির সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, ইহাকে অনেকে অক্ষয় বট বলে। বিশ্বনাথ দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ এই অক্ষয় বৃক্ষকে পূজা করিয়া থাকেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী স্বতন্ত্র গৃহসংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত বটবৃক্ষ আছে, তাহাও অক্ষয় বট বলিয়া সাধারণের পূজার্হ।

প্রাচীন বিশ্বেশ্বরের মন্দির বা অওরঙ্গজেব-মস্ক।

উক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষের পশ্চিমে, বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত, প্রাচীন বিশ্বনাথের মন্দিরের উপর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এই মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্ব মন্দিরের ভগ্নলব্ধ প্রস্তরাদিই এই মসজিদের প্রধানতম উপকরণ— সেই স্তম্ভ, উপান, আলীঙ্গ, সেই কম্প, কন্ধর, উত্তীরা, প্রভৃতি আর্য্য-স্থাপত্য-সুলভ প্রস্তরালঙ্কার এখনও মসজিদের পশ্চাৎদিকে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। * তাহা দেখিলে বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন

* গত ভাদ্রের শিল্প ও সাহিত্যের চিত্র দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

মন্দির যে কত বিস্তৃত, উন্নত ও কত নয়নতৃপ্তিকর ছিল, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়—তাহা দেখিলে এখনও আর্য্য-সন্তান ভক্তের পবিত্র হৃদয় যুগপৎ বিষম বিস্ময়ে, ক্ষোভ ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া যায়—তাহা দেখিলে উদার ও পরম প্রজাবৎসল মোগল সম্রাটকুলের কুলাঙ্গার অওরঙ্গজেবের ঘোর আর্য্য-বিদ্বেষতা ও ঘৃণিত নীচান্তকরণের কথা এখনও স্মরণ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষণেকের জন্য চিরশান্তিপ্রিয় হিন্দুর হৃদয় যেন উত্তপ্ত করিয়া তুলে। যাহাহউক সকল বিষয়ে সুসভ্য ইংরাজ রাজ এ প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণে যেরূপ সচেষ্ট, যে কোনও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রাচীন মন্দির, মঠ ও মসজিদাদির রক্ষাকল্পে তাঁহারা যেরূপ উদার, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

মস্‌জিদের সম্মুখভাগে যে সুবৃহৎ স্তম্ভসমূহ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা নিকটস্থ বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশিষ্ট বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, তাহারা যেন মহা মহিমান্বিত সসাগরা পৃথিবীপতি অশোকের শোকে কাতর হইয়া, তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ স্মরণ করিতে করিতে, যবনকরে আত্ম-কলঙ্কিত হইয়া লজ্জায় ঘৃণায় যেন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে অতি সঙ্কুচিতভাবে কোনরূপে কালাতিপাত করিতেছে। সেই স্তম্ভগুলির সেই বিশালতার মধ্যে প্রকৃতই যেন কি এক ম্লান ও কালিমা-ছায়া পরিলক্ষিত হয়, তাহা হৃদয়বান দর্শকবৃন্দ দর্শন মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। 'এডওয়ার্ড বি, ইষ্টউইক' প্রভৃতি বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ পাশ্চত্য পণ্ডিতও তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কে অপমানিত করিবার জন্যই এবং হিন্দু এবং বৌদ্ধের হৃদয়ে চিরদিন আঘাৎ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই যেন মন্দির ও বিহারান্তর্গত প্রস্তরালঙ্কার ও তাহার উপাদান রাশিকে অবিকৃত অবস্থায় মসজিদে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাকে ক্রূড়মতির দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারেন না।"

এই মসজিদ, চারিদিকে প্রায় ৫ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তাহা মৃত্তিকায় পূর্ণ করতঃ তাহারই উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই প্রাচীরমধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন-স্থাপত্যানুগত বহু প্রস্তরালঙ্কার পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিত্য কত নূতন ভাবের উদ্বোধন করিয়া দিতেছে।

এই মসজিদ ও জ্ঞানবাপীর মধ্যস্থিত ভূমি লইয়া বহুদিন ধরিয়া হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে বিষম বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। কতকগুলি দুষ্ট মোসলমান সেই অক্ষয় বটের বা পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষের সম্মুখে মসজিদের একটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিত্য গোমাংস বহন করিয়া লইয়া যাইত, গোরক্ত ও গোঅস্থি নিক্ষেপ করিত। শান্তপ্রিয় হিন্দুদিগের প্রতি ধর্ম্মহানীকর এই সকল আচরণে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে অশান্তির উদয় হইল, সহিষ্ণুতার সীমা অতীত হইল, তখন তাহারা উন্মত্ত হৃদয়ে মোসলমান-দিগের অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ পরিকর হইল— উভয় পক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হইল। এবার হিন্দু কর্ত্তৃক সেই অওরঙ্গজেব-মস্ক বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঙ্গা মিটাইয়া দিলেন। মসজিদের সে দ্বার রুদ্ধ হইল, এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, গোমাংসাদি আনয়

বন্ধ হইল, মসজিদের দক্ষিণদিকে রাজপথের সম্মুখে একটীমাত্র দ্বার মোসলমানদিগের যাতায়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল, পবিত্র অশ্বত্থের একটী পত্রও আর কোন মোসলমানের স্পর্শ করিবার ক্ষমতা থাকিল না, স্বয়ং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মসজিদের রক্ষণভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের বিরোধ উপস্থিত মিটিয়া গিয়াছে। এখন আর কোনও গোলযোগ নাই। হিন্দু মোসলমান স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে আপন আপন মন্দির ও মসজিদে নির্ব্বিঘ্নে পূজা ও উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

নষ্টগুরু

অর্দ্ধেন্দু শেখরের প্রতি।

অচির বসন্ত আসে ফিরে চলে যায়,
ক্ষণিকের আলিঙ্গন—চারু পরশনে—
চঞ্চল পবনে দোলে শ্যাম কিশলয়
শুনায় গুঞ্জন অলি অস্ফুট প্রসূনে!
নব নীল বনান্তের আনন্দ মর্ম্মর,
মুক ধরণীর চির অব্যক্ত বেদনা,
প্রীতির বন্ধনে দোঁহে মিলি পরস্পরে,
বিরহিণী বুকে ঢালি নবীন প্রেরণা
প্রবাসী বাঞ্ছিত স্মৃতি জাগায় হৃদয়ে
মুগ্ধ প্রাণে স্বপ্ন আনে কনক বরণ,
কোনদূর সিন্ধু পারে চন্দ্রকরচ্ছায়ে
নির্ঝরিণী তীরে বসি করিছে স্মরণ
প্রিয়জন তারে নিত্য;—জাগে শুধু প্রাণে
লুপ্ত বিশ্ব চরাচর সেই শুধু আছে,
একত্র মিশিয়া গেছে জীবন-মরণে
ব্যবধান নাহি আর বঁধু আছে কাছে।
গৃহ হারা কেঁদে ওঠে স্মরি মুখ দেহ
তবু তাহা বসন্তের ক্ষণিকের স্নেহ।
অকস্মাৎ হে সুন্দর, বসন্তেরি মত
এসেছিলে কুঞ্জ দ্বারে অতিথির বেশে,
তখনো গাহেনি প্রভাতী সঙ্গীত,
তখনো ফোটেনি ফুল, নিশার বাতাসে
কামিনী কবরীচ্যুত বকুল মালিকা
অন্তিম নিশ্বাস তরে দেয়নি মিলায়ে,
বিরহীর দ্বারে শুধু ম্লান দীপ-শিখা
প্রিয় আগমন আশা রেখেছে জাগায়ে।
হে কপর্দ্দী, মহাযোগী নীলাম্বর হ'তে
নামায়ে আঁখির দৃষ্টি, দেখিলে চাহিয়ে
আমাদের গৃহ দ্বারে, শুষ্ক মুঞ্জরীতে
অফুরান ফুলবীথি উঠিল ফুটিয়ে,
চরণের রেণু আশে গর্জ্জিয়া নাচিল
পদতলে মহাসিন্ধু, ধীরে পূর্ব্বাসায়
তোমারি কিরীটী সম হাসিয়া উদিল
প্রভাত কণক রবি নবীন বিভায়।
হে তপস্বী-মুগ্ধ বিশ্ব রাতুল চরণে
স্মরণ মাগিল আসি, কমল নয়নে
চাহিয়া মুখের পানে, শরদিন্দু সম
হাসিয়া মধুর হাসি, অপরূপ প্রেম
ঢেলেদিলে সম ভাবে সর্ব্বত্র সমান

নাহি উচ্চ নীচ ভাব, নাহি ভেদজ্ঞান,
আনন্দে বিপুল মন্দ্রে উঠিল ধ্বনিয়া
আকাশ অনিল সিন্ধু ভুবন ভরিয়া—
নবীন মিলন-গীতি;—শরতের মেঘ—
প্রভাতের পুষ্প পুঞ্জ—ঘণ্টার আবেগ—
উষার বরণ বিভা বসন্তের হাসি—
প্রণয় সিন্ধুর বক্ষে ফেণ রাশি রাশি,
আষাঢ়ের ঘন ঘটা শ্রাবণ গর্জ্জন
দ্যুলোক ভূলোক মনে অপূর্ব্ব মিলন,
তারি মাঝে হে সাধক মুরতি তোমার,
অনন্ত, বিরাট শান্ত নমি বারম্বার।
ফুল নিল কোমলতা, চাঁদ নিল হাসি,
মাধুর্য্য মাগিয়া নিল সাদরে রূপসী,
প্রীতি নিল তরুচ্ছায়া, করুণা সলিল,
সর্ব্বত্রই সমভাব শিথিল অনিল,
মহত্ত্ব পাইল ভিক্ষা সাগর অম্বর,
ধৈর্য্য গুণবতী মেদিনী সুন্দর
সমগ্র থানা প্রাণে প্রেম সঞ্চারিলে
বিশ্ব মাঝে আপনারে ব্যস্ত করে দিলে।
বসন্ত ফিরিয়া আসে বরষের পরে
তুমি আছ চিরন্তন হৃদয় মন্দিরে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ণ-চিত্রণ।

(গত বর্ষের ২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

নিসর্গ-চিত্র।

(Landscape painting.)

লীলাময়ী প্রকৃতির বিশ্ববিমোহিনী নগ্ন লাবণ্যরাশি তদ্গতচিত্তে চিন্তা ও উপভোগ করিবার অভিলাষ যে হৃদয়ে নাই,—যে হৃদয় অনিন্দ্য নিসর্গ-সুন্দরীর বিমল রূপমাধুরী উপলব্ধি করিবার জন্য কোনও দিন ব্যাকুল হয় নাই, বিশ্বরাজ্যে—প্রকৃতির লীলা নিকেতনে তাহার অবস্থিতির কোনও সারবত্তা আছে কি না—কে বলিবে! মানুষ অভাবের তাড়নায় আবিষ্কারের পথে কেবল মাত্র কৃত্রিমতারই বিনিময়ে নিজ দেহ-প্রাণ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া বসে—স্বভাবের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়—তাহার স্বরূপ ও সারল্য অনুভব করিবারও অবসর পায় না; কিন্তু যদি সহসা কোনওরূপে একবার সেই অনাঘ্রাত সৌরভের অতি সামান্যমাত্রও আঘ্রাণ পায়—সেই স্বভাব-সঞ্চিত মধুরতার বিন্দুমাত্রও আস্বাদ লইতে পারে—তাহা হইলে মানবের সাধ্য নাই যে, সেই মাধুরী-সৌরভের উন্মাদনা শক্তির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে। মানব বস্তুতই তখন উন্মত্ত হইয়া যায়। কিন্তু সেই উন্মত্ত হৃদয়ের এমন এক স্বভাব সিদ্ধ গুণ হউক বা দোষ হউক—আছে, যাহা উপভোগ করিয়া কেহই গোপনে অন্তরে জীর্ণ করিয়া লইতে পারে না। তাহার অভ্যাস ও সামর্থ্য থাকিলে, কেহ বা শব্দে, কেহ বা বর্ণে তাহার অভিব্যক্তি করিতে প্রয়াস পায়, অন্যকেও তাহার

রসাস্বাদনে উন্মত্ত করিতে যত্ন করে। ইহাই পাত্র নির্ব্বিশেষে কবির স্বভাব-কাব্য অথবা শিল্পীর নৈসর্গিক চিত্রকলা। যিনি তাঁহার ঐন্দ্রজালিক শব্দ-সম্পদ বা বর্ণাবলীর বিচিত্র কলা-কৌশলে দৃশ্যমানা প্রকৃতির পাদমূলস্থিত পুষ্প পল্লব ও গুল্মাদি হইতে তরু লতা প্রস্তর প্রান্তর পর্ব্বত প্রস্রবণ ক্রমে নদ নদী জলধি ও তাহার শিরোমুকুট স্বরূপ জলদ্ পর্য্যন্ত উন্মুক্ত রূপ-সমষ্টি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অসংখ্য ভাবাবলীর যতই তন্ন তন্ন রূপে বিন্যাস করিতে পারেন, অন্যের হৃদয়েও তাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা যে পরিমাণে পুষ্ট করিয়া দিতে পারেন, যিনি জগৎবাসীকে সেই কলা-চাতুর্য্যে যতদূর বিমোহিত করিতে সমর্থ হন, তিনি ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীর কবি বা চিত্রশিল্পী। মানব হৃদয়ের ইহা এক স্বভাবসিদ্ধ শক্তি, ইচ্ছা থাকিলে—ইহার সাধনায় অনেকেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। শিল্পীর তুলিকা-নিসৃত প্রকৃতির লীলা-রহস্যই তাহার অপূর্ব্ব নিসর্গ চিত্র। প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণের পরেই শিল্পীর সেই সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে তাহার সিদ্ধির পথ সরল ও সুগম হইতে পারে--এই অধ্যায়ে তাহাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

চিত্রের শ্রেণী-বিভাগ অংশে যে সপ্তদশবিধ চিত্রের উল্লেখান্তর উহাদের সাধারণ বিভাগ—প্রতি-মূর্ত্তি ও নিসর্গ চিত্র, এই দুইটী প্রধান শ্রেণীতে রক্ষা করা হইয়াছে, তাহা শিক্ষার্থীর অবশ্যই স্মরণ আছে। সুতরাং এই নিসর্গচিত্র-প্রক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে চিত্রের অন্যান্য বিভাগ যে, সহজ ও সুবোধ্য হইয়া পড়িবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহা হউক এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই নিসর্গ-চিত্রের বা Landscape Paintingএর আবার কোনও অনুবিভাগ আছে কি না। পাশ্চাত্য শিল্পা-চার্য্যগণ ইহার দুইটী অনুবিভাগের উল্লেখ করেন। একটী বীর-রসাত্মক বা শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক চিত্র, ইংরাজীতে ইহাকে 'Heroic Landscape Pain-ting' বলে, অন্যটী সাধারণ পল্লী-চিত্র বা 'Rural Landscape Painting' বলিয়া পরিচিত। এতদ-সম্বন্ধে কিঞ্চিত বিস্তৃত করিয়া না বলিলে সাধারণে ইহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ বীর-রসাত্মক বা শ্রেষ্ঠ নিসর্গচিত্র,—ইহাতে স্বভাবের যে সকল বস্তু সমাবিষ্ট হয়, তাহাতে প্রকৃতি ও কলাসম্ভূত উভয় বিধ অদ্ভুত ও অসাধারণ আদর্শেরই বিকাশ হইয়া থাকে। কোথাও প্রাচীন পবিত্র বিমান, সুন্দর সৌধাট্টালিকা, প্রসিদ্ধ মঠ ও মন্দিরাদি দেবালয়, সাধনা ও সমাধি-স্থান; প্রকৃতির কোমল কর-সঞ্চিত দিব্য তরুগুল্ম-সমাচ্ছাদিত বিচিত্র বনপথ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, পশ্চাতে কোথাও বা বিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-পালনী-শক্তির প্রত্যক্ষ স্বরূপ—শস্য-শ্যামলা-কমলা যেন অচলা রূপে অবস্থিতা, কোথাও বা তাহারই সীমান্তে বিশাল-বপু অচলমালা অসংখ্য রত্নরাজি বিভূষিত হইয়া শুভ্রোজ্জ্বল তুষার-ধবলিত বিরাট কিরীট শিরে ধারণ, করতঃ আপন অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রকাশ করে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত নীলাভা-মণ্ডিত নভোমণ্ডল মেঘমালার দিব্য রাগরঙ্গে গম্ভীর ভাবে রঞ্জিত,

আবার কোথায় বা সম্মুখে কুল কুল প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা বক্ষে ধারণ করিয়া তন্বী স্রোতস্বিনী সেই পবিত্র মন্দির-পাদ বিধৌত করিয়া অনন্ত সাগরাভিমুখে দ্রুতপদে চলিয়াছে, কোথায় বা সাগরের সেই উত্তাল তরঙ্গরাজি যেন উন্মত্ত হইয়া সেই বরেণ্য মন্দির-পাদ স্পর্শ করিবার আশায় বিফল মনোরথ হইয়া ক্ষোভে শিরোলুণ্ঠনচ্ছলে বেলায় প্রতিহত হইতেছে। এই সকল বিবিধ বিরাট ও বিস্তৃত ব্যক্তভাবের অভিনব উচ্চ অঙ্গের অব্যক্ত ভাবসমূহ একত্র করিয়া—শিল্পী, তাহার দৈব-শক্তি সম্পন্ন কল্পনার সাহায্যে যে চিত্রে বিচিত্রভাবে বিন্যাস ও বিকাশ করিতে পারেন, তাহাকেই শিল্পামোদী-গণ বীর-রসাত্মক শ্রেষ্ঠ নিসর্গচিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আর, যাহাতে পল্লীর অযত্নসঞ্চিত বিমল সারল্য-বিজড়িত কৃষকের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পল্লী-পথ তাহার ক্ষুদ্র আয়াস লব্ধ পর্ণ-কুটীরের পার্শ্বদিয়া কোথাও বা কৃষক-বালক গরুর পাল লইয়া পল্লী-সুলভ গীত গাহিতে গাহিতে মনের আনন্দে ছুটিয়াছে, কোথায় বা গ্রামের পার্শ্বে একটী সংকীর্ণ খালে কোন কৃষক বালিকা কোমরে আঁচল আঁটিয়া ক্ষুদ্র ডোঙ্গা বাহিয়া গ্রামান্তরে যাইতেছে, হয়ত সেই খালের ধারে বা বিলের পার্শ্বে পল্লী-যুবক মৎস্য ধরিবার আশায় টোপ ফেলিয়া ছিপ হাতে বসিয়া আছে, কোথাও বা আর্দ্র-বস্ত্র-পরিহিতা পল্লী-রমণীগণ জলপূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া পরস্পর নানা গল্প করিতে করিতে সেই গ্রামের পথে চলিয়াছে। কোন স্থলে ধীবর-কন্যাগণ স্বল্প জলপূর্ণ বিলের সেই মৃত্তিকা কর্দ্দম আমূল আলোড়িত করিয়া বিপুল আয়াসে মৎস্য আহরণ করিতেছে, প্রকৃতির এই নিরাভরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপরাশি যে চিত্রে আংশিক ও বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত হয়, তাহাকেই পল্লী চিত্র বা Rural Landscape painting বলে।

নিসর্গচিত্রের এই উভয়বিধ বিভাগ উপলব্ধি করিয়া শিল্পী তাহার অভিলষিত কর্ম্ম পথে অগ্রসর হন। যাহার যেমন সামর্থ্য তিনি সেইরূপই রচনা দ্বারা নিজেত তৃপ্তি লাভ করেনই—অন্যকেও তাহাতে অনুপ্রাণিত করিয়া পরিতৃপ্ত করেন। বিরাট ও সংকীর্ণ ভেদে সাধারণ নিসর্গচিত্রের উপাদান সমষ্টি প্রায় একরূপ। এই হেতু সাধারণ ভাবেই নিসর্গ চিত্রের উপাদানাবলীর একটী সংক্ষিপ্ত আভাস ও আলোচনা ক্রমে প্রদত্ত হইতেছে। শিল্প-শিক্ষার্থী ও অনুরাগী ব্যক্তিগণের সেগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে।

নিসর্গচিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই প্রকৃতির এমন একটী দৃশ্য বা স্থান নির্ব্বাচনের কথা বলিতে হয়, যাহাতে সেই চিত্রের প্রতিপাদ্য দৃশ্যমধ্যে অভিলষিত সকল ভাবই সুন্দররূপে প্রকাশ হইতে পারে। ইংরাজীতে ইহাকে Sitations or openings বলে। এই শব্দটী ইটালীয়ন ভাষায় 'Sito' শব্দ হইতে ইংরাজীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহার অভিধানিক ইংরাজী অর্থ View Prospect or Opening of a country. প্রাকৃতিক চিত্র সম্বন্ধে এই প্রাথমিক লক্ষ্য বা বিধি সকল সভ্য প্রদেশে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের মধ্যে চিরদিনই প্রচলিত আছে। যাঁহার সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়েই লক্ষ্য নাই, তিনি কখনই নিসর্গচিত্রে

আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না। চিত্রোপযোগী প্রাকৃতিক দৃশ্য নির্ব্বাচন মধ্যে শিল্পীকে স্থান কাল ও অবস্থা বিশেষে নানা বিষয় চিন্তা করিয়া চিত্রবিন্যাস করিতে হয়। কখন সেই দৃশ্য বিজনতাবিহীন 'উন্মুক্ত' কখন নিসর্গবৈচিত্রে ঘনাবিষ্ট, কখন কুটিরাদিও পরিবর্জ্জিত নির্জ্জন বনভূমি, কখন বা সৌধাট্টালিকা পরিশোভিত জনাকীর্ণ নগরাংশ, কখন সমুচ্চ পর্ব্বতমালায় সমাবৃত পার্ব্বত্য প্রদেশ, কখন বা নদ নদী তড়াগাদিতে পরিশোভিত নিম্ন সমতল ভূমিখণ্ড, আবার কখন বা ইহাদের পরস্পর মিলনজাত বিচিত্র দৃশ্য, শিল্পী নিবিষ্ট চিত্তে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চিত্রে বিন্যাস করিবেন, কিন্তু সেই সকল আদর্শের অনুকরণ-ব্যপদেশে প্রকৃতির যে কোনও সময় বা অবস্থা যথাযথ অনুকৃত হইলেই চিত্রের মনোহারিত্ব রক্ষা হইবে না। সুতরাং কাল এবং তদনুগত ছায়ালোক ও বর্ণাবলীর প্রতি শিল্পীর সুতীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেখিতে হইবে প্রাতে বা অপরাহ্লে, বরষায় বা বসন্তে কোন সময়ে সেই সৌন্দর্য্যাধার নিসর্গ সুন্দরী অপেক্ষাকৃত শ্রী সৌন্দর্য্যে পরিপুষ্ট হয়। সেই আদর্শ প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় এই নিসর্গমূর্ত্তি কোনও দিনই শিল্পীর আয়ত্বাধীন নহে, শিল্পী ইচ্ছা করিলেই নিজ অভিলষিত ছায়ালোকে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া লইতে পারেন না, কাজেই প্রকৃতির ইচ্ছাধীন হইয়াই তাহার অবসর অন্বেষণ করিতে হইবে—কখন বা কোন্ সময়ে কোন্ পার্শ্ব হইতে সূর্য্যালোক পতিত হইয়া অথবা পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্না পুলকিত হইয়া সেই অনুকরণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর দেখাইতেছে—বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই উপযুক্ত সময়েই শিল্পী তাহার অনুকরণ কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিয়া লইবেন; 'সত্বর' বলিলাম তাহার কারণ, সে কাল অতীত হইলে আবার রূপের পার্থক্য প্রতীত হইবে, সেই পরম প্রীতিপ্রদ ছায়ালোক পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই মনোজ্ঞ বর্ণের মাধুর্য্য তিরোহিত হইবে, মেঘের সেই অপূর্ব্ব রাগরঙ্গের এককালীন বিলয় হইবে; সততঃ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির সেই মোহন রূপচ্ছটা যাহা একবার আসিবে ঠিক তেমনটী হয়ত আর আসিবে না; প্রতিমূর্ত্তি আদর্শের ন্যায় শিল্পী আপন ইচ্ছায় আর তাহাকে পূর্ব্বের মতটী করিয়া দেখিতে পাইবে না, সুতরাং শিল্পীর ক্ষিপ্রকারিতা ও সম্পূর্ণ কলানিপুণতার উপরেই নিসর্গচিত্র প্রস্তুতের সকল কর্ম্ম নির্ভর করিতেছে।

নৈসর্গিক আদর্শ যেমনই হউক, তাহার বৈচিত্র ও শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে, যে আলোক বিন্যাস ও উপযুক্ত বর্ণানুকরণ বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় শিক্ষার্থিগণের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এক্ষণে ঐ আলোক সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। কোন কোন সুবিজ্ঞ শিল্পী তাঁহার সেই অনুকৃত চিত্রের মধ্যে 'আকস্মিক আলোকচ্ছায়া পতন' দ্বারা চিত্রের এমন এক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ঔৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহা দেখিলে, অসাধারণ বলিয়াই মনে হয়। বহুদর্শী সুদক্ষ শিল্পী ব্যতীত সকলেই তাহার প্রকৃত সমাবেশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ নবীন শিল্পীর হস্তে তাহা ত সহজে সম্পন্ন হইবারই নহে। তবে প্রথম হইতে

...কার্য্যাই অভ্যাস বা সাধনা সাপেক্ষ। শিক্ষার্থী ...ই তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সেই কারণ "আকস্মিক আলোকচ্ছায়া পাতন" সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। পাশ্চাত্য শিল্পাচার্য্যগণের মধ্যেও অনেকে এ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় 'আকস্মিক আলোকচ্ছায়া-পতন' এই পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ "Accident" বা "An accident in painting" এইরূপ কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার মর্ম্ম এই যে—নিসর্গচিত্র-অঙ্কনসময়ে চিত্রের প্রত্যেক স্থানেই স্বভাবদৃষ্ট সূর্য্যালোকজাত আলোকছায়া সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, সহসা আকাশ-পথে এক খণ্ড ক্ষুদ্র ঘনমেঘ কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন কোন স্থানে অবিরোধ প্রখর সূর্য্যকিরণ প্রতিবাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কারণ নিম্নে সেই দৃশ্যান্তর্গত স্থান বিশেষে অল্পাধিক ছায়া মণ্ডিত হইয়া কেমন এক বৈচিত্র ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ডের আকার ও গতি অনুসারে অনুকৃত দৃশ্য মাঝে কোথাও উজ্জ্বল আলোক, কোথাও অল্প ছায়া, কোথাও বা অধিকতর ছায়া—ছায়ালোকের এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনে চিত্রের যে কি অতুলনীয়সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুদক্ষ শিল্পী তাঁহার বহুদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে চিত্রের কোন স্থানে সেই মেঘাবরিত ছায়ালোক চিত্রিত করিলে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, তাহার নির্ব্বাচন করিয়া লন। সকল সময়েই বা সকল স্থানেই যে, উক্ত 'আকস্মিক আলোকচ্ছায়া' পাতিত করিতে হইবে, তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, সুশিল্পীর নিজ ইচ্ছার উপরই তাহা নির্ভর করে।

নিসর্গ চিত্রের ভূমি ও আকাশাংশ ধরিয়া দুইটী বিভাগ করা যাইতে পারে এবং সেই দ্বিতীয় বিভাগ আকাশাংশও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধেও বলিবার এবং বুঝিবার অনেক কথা আছে। মহামানাস্পদ তত্ত্ববিদেরা আকাশ অর্থে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা এক্ষণে আমার আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের শিল্পী-সমাজ যাহাকে আকাশ বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহাই বলিতেছি। চিত্রশিল্পী বা দর্শক উর্দ্ধদিকে দেখিলেই যে বায়ুস্তর ও বাষ্পরাশি পরিপূর্ণ মেঘমালা ও কুজ্ঝটিকাদি সমাবৃত নীল, পীত, লোহিত ও পাটলাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত আকাশ-অম্বর যেন ছত্রাকারে দর্শকের চারিদিকে তাঁহার দৃষ্টির শেষ সীমারেখায় দিগ্বলয় পর্য্যন্ত নামিয়া ক্রমে যেন পৃথিবীর পার্শ্বেই ঢলিয়া পড়িতেছে, তাহাই নিসর্গচিত্রে শিল্পীর আকাশ-পদবাচ্য। এই আকাশ পূর্ব্বোক্ত নানা বর্ণে রঞ্জিত হইলেও, ইহার বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে একটী সুন্দর বিধি আছে। চিত্রবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ শিল্পিগণ জানেন যে, দৃষ্টির শেষ সীমায় দিগ্বলয় রেখায় [Line of Horizon] এ সকল জিনিসই লীন (Vanish) হইয়া যায়, যে বিন্দুতে সেই সকল জিনিস লীন হয়, তাহাকে লীয়মান বিন্দু বা Vanishing Point কহে। (এ সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে চিত্র বিজ্ঞানাংশে বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে) ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধ লীয়মান বিন্দুই যে ক্রমে রেখাকারে লীয়মান বা দিগ্বলয় রেখা (Line of Horizon)

রূপে পরিলক্ষিত হয় তাহা বোধ হয়, সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিতেছেন। এক্ষণে যদ্যপি কল্পনায় বা চক্ষে ঐরূপ লীয়মান বিন্দুর বিস্তৃত সমষ্টি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, আমাদিগের মস্তকের উপরদিকে ঐ প্রকাণ্ড বিস্তৃত আকাশপটই পূর্ব্বোক্ত লীয়মান বিন্দুর বিরাট সমষ্টি ক্ষেত্র। বলিতেছিলাম, এই আকাশের বর্ণ-বিলেপন সম্বন্ধে একটী সুন্দর নিয়ম আছে—সে নিয়মটি এই যে, দূরে বহু দূরে যাইলে যেমন সকল সামগ্রীই একেবারে ধুঁয়ার মত মিলাইয়া বা লীন হইয়া যায়, আর দেখা যায় না; সেইরূপ সকল বর্ণও দূরে—দৃষ্টির সেই শেষসীমায় যাইলে ক্রমে ধূম্রবর্ণে বা ক্ষীণ নীলবর্ণে লীন হইয়া যায়, সেই কারণ আকাশ নীলবর্ণেই আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আমরা যে স্থানে ঐ নীল আকাশ সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাই, বাস্তবিক সে স্থানে ঐরূপ নীল কোনও পদার্থ নাই, উহা কেবল আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। যগুপি সম্ভব হয়, আমরা কোনরূপে ঐ আকাশের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমীপবর্ত্তী ঐরূপ কোনও নীল পদার্থ আর আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে না—এখন আমাদিগের নিকট হইতে আকাশ যত দূরে, তখন সেই স্থান হইতেও ঠিক ততদূরেই আমাদের আকাশ দেখিতে পাইব। তবে মধ্যে মধ্যে যে পীত, লোহিত ও পাটলাদি নানা বর্ণ আকাশের গাত্রে দেখিতে পাই, তাহা মেঘরাগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহা আমাদিগের দৃষ্টির সীমারেখার বহু ভিতরের সামগ্রী, তাহাদ্বারাই অনেক সময় সেই অনন্ত নীল আকাশপথ আবৃত হইয়া থাকে। চিত্রের নিয়মই এই যে, যে জিনিস[illegible] আমরা সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহাই চিত্রিত করি[illegible] তাহা ভেদ করিয়া পিছনের কোন দ্রব্য আম[illegible] চিত্রের অন্তর্ভূত করিবার প্রয়াস করি না, আ[illegible] তাহা সম্ভব অথবা সঙ্গতও নহে। সুতরাং মে[illegible] মুক্ত শারদীয় আকাশ আমরা নীলবর্ণে চিত্রি[illegible] করিলেও হেমন্ত, শীত ও বর্ষার আকাশ প্রকৃতি[illegible] অনুগত করিয়া পরস্পর বিভিন্ন বর্ণ ও ভাবে চিত্রি[illegible] করিতে বাধ্য। ষড়্ঋতুপূর্ণ সমগ্র বর্ষের এক একী[illegible] ঋতু-পরিবর্ত্তন অনুসারে প্রকৃতির যেমন নানা ভা[illegible] পরিলক্ষিত হয়, নিত্য দিবারাত্রের মধ্যেও সেইরূ[illegible] নৈসর্গিক ষড়ভাবপূর্ণ আকাশাদি উপলব্ধি করি[illegible] থাকি। যাঁহারা কালবোধক সঙ্গীত-তত্ত্ব বুঝে[illegible] ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর অর্থ যথার্থ উপলব্ধি করিয়া[illegible] ছেন, তাঁহারা এ তত্ত্বটীও বেশ সহজে অনুভ[illegible] করিতে পারিবেন। ইতিপূর্ব্বে এবং চিত্র-বিজ্ঞানে[illegible] মধ্যেও এই বিষয়টী অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে ব[illegible] হইয়াছে। যাহা হউক দিবারাত্রের মধ্যে প্রাতঃ[illegible] মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এবং প্রথম নিশা, মধ্য নিশা ও শে[illegible] নিশা ভেদে আকাশাদির ষড়বিধ পার্থক্য পরিলক্ষি[illegible] হয়। শিল্পীর সুদক্ষ নয়ন তাহা দর্শন মাত্রে[illegible] অবিকৃত অনুকরণ করিবার জন্য শিল্পীকে অনু[illegible] প্রাণিত করে। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময়[illegible] পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে যে অরুণরাগরঞ্জিত পরে পীতবর্ণে[illegible] যে তীব্র রশ্মিঝলক সেই নীল আকাশের সম্মুখ[illegible] ছুটিতে থাকে, তাহাতে আকাশের প্রকৃত নীলব[illegible] পীত বর্ণ আলোকের মধ্য হইতে দেখিবার কারণ[illegible] তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অল্পাধিক হরিতবর্ণে প্রতী[illegible]

[illegible]তে থাকে, সুতরাং শিল্পী সে সময়ের আকাশ [illegible] নির্ম্মল নীলবর্ণে চিত্রিত না করিয়া অল্পাধিক হরিতা-[illegible]ভায় রঞ্জিত করিবেন এবং দিগ্বলয়ের সমীপবর্ত্তী [illegible]নসমূহ অল্পাধিক গাঢ় পীতবর্ণে তাৎকালিক [illegible]আকাশের অনুরূপ করিয়া অঙ্কিত করিবেন। অপরাহ্ণ[illegible]কালে সূর্য্যাস্ত সময়ে বা সায়ংকালীন পশ্চিম আকাশও [illegible]ঠিক এই ভাবেই জবাকুসুমসম সুন্দর লোহিতাভায় [illegible]রঞ্জিত করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঠাকুরমা।

(গত বর্ষের ৯৩ পৃষ্ঠার পর)

বিমলার শাশুড়ী কয়দিনের পর চাড্ডি ভাত পাইয়া ভারি খুসী। আহারান্তে শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া বিমলার ঠাকুরমাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছেন। বিমলা সকলের আহারাদির পর নিজেও তাড়াতাড়ি দুইগাল মুখে দিয়া সেইখানে আবার ছুটিয়া আসিল। তখন আবার ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া একটী শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া শাশুড়ীর হাতে দিল। তিনি ঔষধ হাতে লইয়া, নাক মুখ শিট্‌কাইয়া বলিলেন "আর বাপু ডাক্তারি ঔষধ গুলো গিলিতে পারি নি! ঔষধ খেয়ে খেয়ে ত পেটে চড়া পড়ে গেল, কৈ রোগের ত [illegible]নিশ বিশ হলো না!" বিমলার ঠাকুরমা বলিলেন —"আচ্ছা আজ্‌গের মত ওষুধটুকু খেয়ে নাও মা—কাল থেকে আমি আমাদের সেকেলে গিন্নি বান্নিদের ওষুধই ব্যবস্থা করে দেব, দুদিনে সেরে উঠবে; ঠিক বলেছ বাছা, এ সব রোগ সারান ও তোমার ডাক্তারি ওষুধের কম্ম নয়। আমার এই তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে—অনেক দেখেছি! বাছা, আজ কাল কথায় কথায় ঐ ডাক্তার আর ডাক্তার—তা ছাড়া আর যেন কোন কথাই নেই, কি বল্‌বো বল? একটা চিকিৎসে হচ্চে, মাঝখান্ থেকে উপর পড়া হয়ে কোন কথা বলা ভাল দেখায় না, বিশেষ আজকাল ছেলে ছোকরাদেরই দিন পড়েছে! যখন যার রেওয়াজ! আজকাল বদ্দিগুলোও নাকি ডাক্তারি ঢং ধরেছে গা! সে দিনে আমাদের বাড়ী রামেশ্বর বদ্দি এসেছিল, তার হাতেও আবার কিনা ডাক্তারদের মত একটা সেই কি নল—নিমির অসুখের সময় তার বুকে পিটে সেই নল বসিয়ে ডাক্তারদের মত কত রকম ঢং করে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। আবার একটা কাচের সেই কি জ্বরকাটি না থারমাটি বগলে দিয়েও দেখতে লাগলো, তা কি করে বল—তা না হলে ত আর দেশের লোকের বিশ্বাস হবে না? হয় ত তাদের ডাকবেও না? তাদের যে অন্ন উঠবার যোগাড় হয়েছে গো! ক্রমে দেখছি বদ্দিরা নাড়ি টেপাটা পর্য্যন্ত ভুলে যাবে! তখন দেখিছি, রামেশ্বরের বাপ পঞ্চানন কব্‌রেজ বুড়ো লাঠি নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে এসে রোগীর পাশে বসতো, কেমন আদর করে রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে রোগীর যন্ত্রণাকষ্ট অসুক বিসুকের কত কথা জিজ্ঞাসা করতো—তাতেই যেন রোগীর অদ্দেক রোগ সেরে যেতো। তারপর নাড়ী ধরে এমন ব্যবস্থাটী করে দিতো তা আর কি বলবো বাছা—

তার এক পান ওষুধ খেয়েই রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠত। পঞ্চানন কব্‌রেজ নাড়ি ধরে যা বলে দিত, তা ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও নড় চড় হতো না। রোগী মরবে কি বাঁচবে, রোগীর ক'দিন ভোগ, কি ক'দিন বাদে কোন্ সময় রোগীর মরণ হবে তা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে বলে দিত। তাই বলি সে রামও নেই মা সে অযুদ্ধেও নেই! কালে কালে সবই গেল! এখন কব্‌রেজেরা পর্য্যন্ত কথায় কথায় তেরগণ্ডা বড় বড় ঔষধ ব্যবস্থা করে দেয়, আর অনুপানই বা তার কত, আর হপ্তা অন্তর মোট মোট টাকার হিসেব! অবাক্ করেছে, বলবো কি—কব্‌রেজদেরও আজকাল আবার চার টাকা, আট টাকা, ষোল টাকা বিজিট হয়েছে মা! কখনও শুনেছ? কালে কালে কতই দেখবে মা! কতই দেখবে!! তখন এত তেত ছিল না বাছা, মাস গেলে, কি ব্যায়রাম সারলে যা হোক কিছু দিলেই হয়ে যেত। তারপর গেরস্থ ঘরে সিদেটা পত্তরটা, গাছের ফল মূলটা আর দোলে দুগ্‌গোচ্ছবে বার্ষিকটা, তা যার যেমন অবস্থা সে তেমনি দিত। এখন আর তা হবার যোটী নেই! তখন অসুক বিসুক হলে আগেই পাচনের ব্যবস্থা হতো—বেনের দোকান থেকে ২।৫ মোড়া পাঁচন এনে সেদ্ধ করে দিত, আর তাহাতেই ব্যায়রাম একেবারে সেরে যেতো। আমাদেরও সেই সব দেখে শুনে কোন্ রোগে কি পাঁচন দিতে হবে, তা প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে—আমার বড়্‌দিদির টোট্‌কা ওষুধ, দেশের লোকে খেয়ে আরাম হতো। তা মা, কাল থেকে আর তোমার ও ডাক্তারি ওষুধ খেয়ে কাজ নেইকো! আমি আজই তোমার একটা ওষুধ তৈয়রি করে দিচ্চি! দেখ্ বিমল, আজই বেণের দোকান থেকে 'শালপাণি, চাকুলো, বেড়েলা, বেলশুঁটো আর দালিমের খোসা' প্রত্যেকটা ৩৯ রতি করে সাত পুরিয়া আনিয়ে নে, আধসের জলে কাঠের কি ঘুঁটের জ্বালে সেদ্ধ করে আধপো থাকতে নামিয়ে সকাল সন্ধ্যা একছটাক করে তোর শাউড়ীকে খাওয়া—দেখ দেখি, কাঁলকেই ফল বুঝতে পারবি। সাত দিনে একেবারে সহজ মানুষ হয়ে যাবে, কোন রোগ থাকবে না। শুধু বেলশুঁটোই পেটের অসুখের একটা চমৎকার ওষুধ। একটু একটু জলে সেদ্ধ করে খাওয়ালেই সব রোগ সেরে যায়, তবে সঙ্গে জ্বর ছিল নাকি তাই ঐ পাঁচটা মিলিয়ে একটা পাচন করে দিতে বললুম। যা বিমল, এখনই ওষুধটা আনিয়ে নে।" বিমলার শাশুড়ী কথায় কথায় একটু ঘুমাইয়া পড়িল। বিমলা একখানি কাগজে ফর্দ্দ করিয়া চাকরাণীর হাত দিয়া তাহার দেওরের কাছে ঔষধ কয়টী আনাইতে পাঠাইয়া দিল। তাহার ঠাকুরমা বলিলেন ঘরে বেলশুঁটো নেই।"

বি—'না ঠাকুরমা! বাজার থেকে আনতে দিয়েছি।'

ঠা—"গেরস্থ ঘরে এসব জিনিস ঘর করে রাখতে হয়। দেখিস নি—বেলশুঁটো, পুরনো ঘি, পুরনো গুড়, পুরনো মূলো, পুরনো তেঁতুল, নাল্‌তে, মধু, কাঁজি, দালিমের খোসা, কমলানেবুর খোসা, কাঁমেঘ, কপ্‌পুরের জল কত কি জিনিস আমি ভাঁড়ারে তাংড়ে রেখে দিই, কখন কোনটার হঠাৎ দরকার পড়ে কে জানে আমি যোগাড় করে রাখি—পাড়ার পাঁচজনের কত উপকার হয়—আমার বড়্‌দিদি এসব আমায় শিখিয়ে গেছেন। বাড়ীর বৌ ঝি গিন্নি বান্নির এও একটা ভারি দরকারি কাজ। তা তোদের এখানেত তা

কিছুই দেখচি না। তুই ক্রমে ক্রমে এসব যোগাড় করে রাখবি—মাঝে মাঝে রোদ্দুরে দিয়ে ঝেড়ে বেছে ভাল করে ঢাকা ঢুকি দিয়ে রাখবি, যেন ইঁদুরে বাঁদরে নষ্ট না করে। যাক, এখন অজীর্ণ অতিসারের আরও দুই একটা ওষুধ তোকে বলে দিই শোন্। এসব ভারি উপকারী জিনিস। (১) এক সিকি ওজনের জোয়ান আর দুআনা ওজনের সন্ধব নুণ একত্রে খাবার পর খেলে অজীর্ণরোগ সেরে যায়। (২) এক ভরি মৌরী আর এক ভরি সন্ধব গুঁড়িয়ে রেখে দিতে হয়, তার পর তাই রোজ খাবার পর সিকিভরি করে খেলে অজীর্ণ ব্যারাম ভাল হয়। (৩) অজীর্ণির সঙ্গে আমাশয় কি তার সঙ্গে রক্ত থাকলে গাঁদা পাতার রস এক তোলা আর কাশীর চিনি আধ তোলা মিশিয়ে খেতে হয়। যদি জ্বর টর না থাকে শুধু আমাশা হয়, তা হলে (৪) খুব পুরোণ তেঁতুল আগের রাত্রে পাথর বাটীতে একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়, পর দিন পাকা চাঁপাকলা আর কাশীর চিনির সঙ্গে বেশ করে চটকে খাওয়াতে হয়—এই রকম তিন চার দিন খাওয়ালেই আমাশায় সেরে যায়। ৫। নালতে পাতাও আমাশার চমৎকার ওষুধ। নালতে ভিজন জল সকালে খাওয়াতে হয়, আর সেই গোটা পাঁচ ছয় নালতে পাতা, গোটা দুই সরষে বাটা দিয়ে একটু খাঁটী সরসের তেলের সঙ্গে নুণ দিয়ে মেখে ভাতের সঙ্গে প্রথমেই তিন গালে সেইটুকু খেতে হয়। (৬) বাতাবি নেবুর রস দু তিন তোলা আর কাশীর চিনি মিলিয়ে দু এক দিন খেতে হয়। এ ছাড়া অবসর মত দুই একটা ওষুধের বড়ি তৈয়রি করে রাখলে সময় অসময়ে ভারি উপকার হয়। (৭) হিং জিরে, মরিচ, সোহাগার খৈ, লবঙ্গ, বেলশুঁটো, দালিমের খোসা আর রসাঞ্জন প্রত্যেকটা সিকি ভরি করে বেশ করে গুঁড়িয়ে নিয়ে আধ ভরি আফিং দিয়ে ছাগলের দুধে বেশ করে মেড়ে কুঁচের মত ছোট ছোট গুলি করে রাখবে, তার পর রোজ সকালে বিকেলে ১টা করে সেই বড়ি চাল ধোয়া জলের সঙ্গে মেড়ে খেতে দিতে হয়, ছোট ছেলে পুলেদের আধখানা সিকিখানা করে বয়েস বুঝে দিতে হয়। এতে যেমনতর অতিসার হোক না সেরে যেতেই হবে। অজীর্ণের আর একটা খুব ভাল ওষুধ বলে রাখি শোন্—(৮) হত্তুকি, বয়ড়া, আমলা, জোয়ান আর সন্ধবনুণ সমান সমান নিয়ে জল দিয়ে বেশ নিখিঁচ করে বেটে ছোট কুলের মত গুলি পাকিয়ে রেখে দিতে হয়, খাবার পর একটা করে সেই গুলি খেলে যেমনতর অজীর্ণ হক না সেরে যাবে, আর বাহ্যেও বেশ খোলসা হবে। বিমল এসব কথা ভাল করে মনে রাখবি, সময়ে এতে ভারি উপকার হয়।"

বিমলা ঠাকুরমার সকল উপদেশই অতি মনোযোগ দিয়া শুনিত, আবশ্যক বোধে একখানি ছোট খাতায় সে সব কথা লিখিয়া রাখিত।

দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই তাহার শাশুড়ী বেশ সারিয়া উঠিলেন, তাহার ঠাকুরমা সে দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। চারু তার মায়ের সুস্থ সংবাদ পাইয়া বিমলাকে কত আদর করিয়া কত ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছে। বিমলা সে পত্র যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পুরস্কার স্বরূপ অতি যত্ন করিয়া

রাখিয়া দিয়াছে। বিমলা ক্রমে আপনার সংসার বুঝিতে পারিতেছে। শাশুড়ীর অনুগত হইয়া ঠাকুরমার উপদেশসকল ক্রমে পালন করিতেছে। তার নিজের মনোমত করিয়া ভাঁড়ারের নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছে, শাশুড়ীকে বলিয়া ভাঁড়ারের মধ্যে কতক গুলি নূতন তাক সেলফ্ তৈয়ার করাইয়া লইয়াছে, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলি টিনের কৌটায়, কাঁড়-মাটীর জারে করে নিম্নে স্তরে স্তরে সাজাইয়া, উপরে নানা প্রকার পুরাতন দুষ্প্রাপ্য অসময়ের জিনিস, নানাবিধ আচার, মসলা, মোরব্বা, শিশি, বোতল কৌটা যাহাতে যেটী রাখিলে ভাল থাকিবে রাখিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিয়াছে। চাল ডাল ঝাল মশলা, সব জিনিসের গায়েই এক এক টুকরা কাগজে তাহার নাম লিখিয়া মারিয়া দিয়াছে, যেন দোকান সাজাইয়াছে। এতে ভারি সুবিধা—কোনও একটা জিনিস খুঁজিবার জন্যে বিশ জায়গায় বিশটা হাঁড়ি উট্‌কাইতে হয় না। যেটী দরকার সেটীর নাম পড়িয়া লইলেই হইল। তাহাও আবার এমন শ্রেণী বিভাগ করা—ডালের দিকে ডাল, মশলার দিকে মশলা ইত্যাদি। এদিকে পুরাণ মাটির হাঁড়িকুঁড়ি গুলি ক্রমে দূর করিয়া দিয়াছে, প্রত্যহ ইঁদুর বিড়ালের দৌরাত্ম্যে আজ এটা কাল ওটা পড়িয়া নষ্ট হয়, সেই কারণে ক্রমে ছোট বড় টিনের কৌটা এরারুট, বার্লি, বিস্কুটের টিন ও ঘিয়ের ক্যানেস্ত্রার ঢাকনা করিয়া রং করিয়া লইয়াছে, দেখিতেও বেশ আর একবার একটু খরচ করিয়া করিলে দশ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত, তা আর নষ্ট হয় না। ধরিতে গেলে প্রায়ই ভাঁড়ারের যত হাঁড় কুঁড়ি, ভাঁড় কোঁড় ভাঙ্গে তাতে জিনিস পত্র যা লোকসান হয়, এরকম ব্যবস্থায় সংসারের এতে অনেক লাভ, অনেক সাশ্রয় হয়। বিমলার শাশুড়ী এসব বন্দোবস্তে তাহাকে খুব উৎসাহ দেয়। এখন আর অমুক জিনিসটা ইঁদুরে খেয়ে গেল, বেড়ালে ঐ হাড়িটা ফেলিয়া দিল বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় না। তার পর দোকানদারের মত একটা দাঁড়ি পাল্লা কিনিয়া আনাইয়াছে। এখন বিমলাই রোজ ভাঁড়ার দেয়—নিত্য যা যা দরকার সব ওজন করিয়া দেয়, আন্দাজী কম হ'ল কি বেশী হ'ল সে ভাবনা ভাবিতে হয় না। এক দিন দেখিয়া লইয়াছে, তার পর যতটুকু দরকার ঠিক ওজন করিয়া দেয়—মাসকাবারি কোনটা কত দরকার তাও ঠিক করে নিয়েছে,—এতে তার আর একটা ভারি লাভ হইয়াছে, চাকর বাকরে আর চুরি করিতে পারে না। আড়াইসের নুণ, কি পাঁচসের আলু, কি দশ সের ডাল যাই চাকরে আনুক না কেন, তাই ঘরে আস্‌লে ওজন করে নেয়, আগে চাকরদের চির প্রথা মত কোন-টায় একসেরে আধপো কম, কোনটায় বা পাঁচসেরে আধসের কম, এরকম প্রায়ই হত, এ সেই চাকরেরই চুরি! বিমলা এই সব দেখিয়া তাহার শাশুড়ীকে বলিয়া সেই চাকরের সামনে ওজন দেখাইয়াছিল, চাকর নিজের চুরি ঢাকিবার জন্য স্বভাবতঃ দোকান-দারের দোষ দিল, যদিও এমন দোকানদারও আছে—কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপার বুঝিয়া বিমলা সস্নেহে হাসিতে হাসিতে বলিল "তাই হবে ভুতো, দোকান-দার গুলো ঠকাতে পারলে আর ছাড়ে না—তা বাছা এবার থেকে এক কাজ করিস্, জিনিস পত্র দেখে শুনে ভাল করে ওজন দেখে নিস্। পয়সা

[illegible] জিনিস আনবি ঠকে আসবি কেন? তোরা এমন চালাক চতুর লোক! সেই অবধি আর কোন জিনিসই কম হয় না। এদিকে চাকর চাকরানী ক্রমে ধরা পড়িয়া নিজে নিজে সাবধান হইয়া গেল। তাহাতে বিমলার উপর কেহই বিরক্ত হইতেও পারে নাই,—কারণ সকলের উপর তাহার যেরূপ যত্ন দয়া স্নেহ তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট—সকলেই তাহাদের বৌমার গুণে মুগ্ধ—বৌমা আসিয়া তাহা-দের যেন অনেক সুখ সচ্ছন্দতা বাড়িয়াছে। তাহাদের যে কোন অভাব অভিযোগ সব বৌমাকে বলা চাই—বৌমাও প্রাণপণে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিত। তাহাদের কাজের এমন শৃঙ্খলা করিয়া দিল যে, এক কাজে আর সবাই ছোটে না অথচ অন্য দিকে আর পাঁচটা কাজ পড়িয়াও থাকে না। বিমলার বন্দোবস্তে ক্রমে সংসারের শ্রী ফিরিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পরে চারু মাকে দেখিবার জন্য বাড়ী আসিল। তাহার মা বিমলার ঠাকুরমার কত সুখ্যাতি করিলেন, বিমলার যত্ন ও সেবা সুশ্রুষার কথা বলিলেন, তাহার পর বৌ বেটাকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিমলার গুণের কথা শুনিয়া চারুর হৃদয় আনন্দে ভরিয়াগেল। বিমলা গৃহের মধ্যে দরজার পাশ হইতে চোরের মত লুকাইয়া লুকাইয়া স্বামীকে দেখিতেছিল। চারু গৃহ মধ্যে যাইয়াই সেই চোরটীকে ধরিয়া ফেলিল ও খুব আদর করিয়া তাহার কৃত-[illegible]র দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখ-চুম্বন করিল। বিমলাও অবনত মস্তকে লজ্জা ও আনন্দ-বিজড়িত বদনে তাহা [illegible] করিল। ক্রমশঃ—

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

ত্রিবর্ণচিত্র-মুদ্রণ।

(The Art of three colour Printiug.)

গত বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় আমরা "ত্রিবর্ণচিত্র মুদ্রিত করণ" শির্ষক প্রবন্ধে এ বিষয় বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছি। তৎসঙ্গে ত্রিবর্ণের যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাতে স্বতন্ত্র ও সমষ্টি ভাবে মুদ্রিত করিয়া তাহার মুদ্রণ প্রণালীও সুস্পষ্ট দেখান হইয়াছে। তাহাতে আমরা বলিয়াছিলাম "বারান্তরে অন্যান্য ত্রিবর্ণচিত্র মুদ্রিত করিয়া 'শিল্প ও সাহিত্যের' পাঠকবর্গকে উপহার দিব।" বর্ত্তমান] সংখ্যায় একটী ত্রিবর্ণ চত্র পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া হইল। তাহা দেখিয়া বোধ হয় সকলেই এই শিল্পের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ ইহা ক্রমোলিথোর (Chromo Lithography) গর্ব্ব অনেকাংশে খর্ব্ব করিয়াছে। তাহাতে ১৩।১৪ খানি বর্ণের প্রস্তর প্রস্তুত করিয়া সেই ১৩।১৪ বার ছাপিলে যাহা সম্পন্ন হইত, তাহাই এই নূতন শিল্পের সাহায্যে তিনখানিমাত্র ব্লকে তিনবার মাত্র ছাপিয়াই সম্পন্ন হইতেছে, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধেও বলিয়াছি। পাশ্চাত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের বলে অচির কালের মধ্যে ইহার যথেষ্ট উন্নতির আশা করা যায়। কোনও কোনও পাশ্চাত্য শিল্পী তিনখানির পরিবর্ত্তে চারিখানি চিত্রফলক প্রস্তুত করিয়া চারিবারে ছাপিয়া আরও ভাল ফল পাইয়াছেন। সে চিত্র আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু ভারতে এখনও তাহার প্রচলন হয় নাই। আজকাল দুই চারি খানি মাসিকপত্রে

ত্রিবর্ণচিত্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইতেছে। ক্রমে এইরূপে ইহার বহু প্রচার হইলে ভারতেও ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইবে। তবে যাহাতে প্রতিচ্য প্রদেশানুরূপ প্রকৃত ত্রিবর্ণচিত্র এদেশে প্রস্তুত ও মুদ্রিত হয়, তদ্বিষয়ে দেশীয় শিল্পিগণের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি।

আলোকচিত্রণের উন্নতির পথ দিয়াই এই শিল্পের আবিষ্কার হইয়াছে। গত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে রয়েল ইনষ্টিটিউসন্ (Royal Institution) গৃহে বিজ্ঞানবিদ্দিগের এক সভা হয়, তাহাতে পণ্ডিত প্রবর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বক্তা ক্লার্ক মক্সওয়েল (Clarke Maxwell) মহোদয় আলোকচিত্রণ সাহায্যে তিনটী মূলবর্ণ হইতে প্রাকৃতিক সকল বর্ণই যে চিত্রে প্রতিফলিত হইতে পারে তাহার পরীক্ষা দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন ও চিত্রশিল্পিগণকে ঐরূপ চিত্রফলক প্রস্তুত ও মুদ্রণ করিবার পরামর্শও দেন। অনন্তর বহুদিন যাবৎ অনেকেই নানা পরীক্ষা করিতে থাকেন। পরে মিঃ এফ্, ই, অইভিস্ (F. E. Ives) সর্ব্ব প্রথম হাফ্টোন প্রস্তুত করিবার প্রথায় তিনখানি ব্লক প্রস্তুত করিয়া ত্রিবর্ণচিত্রের মুদ্রণ শিল্পে কৃতকার্য্য হন। তাহার পরই সকল সভ্য প্রদেশে ইহার প্রচার হইয়াছে। জগতের সকল জাতিই এমন কি মার্কিন ও জার্ম্মানও এ বিষয়ে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ। জগতের সকল দেশেই ইহর যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও ইংলণ্ডের তুলনায় অন্য কোনও দেশই ত্রিবর্ণ চিত্রে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। মিঃ কার্ল হেনশেল (Mr. Carl Hentschel) এখন ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ত্রিবর্ণ চিত্রের ব্লক প্রস্তুত কারক। ইহাঁর প্রস্তুত ব্লক সুনিপুণ মুদ্রাকর দ্বারা মুদ্রিত হইলে ক্রোমো চিত্রের সহিত কোনও প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এমন কি তৈল চিত্রের প্রতিলিপিতে বিভিন্ন বর্ণের পরস্পর মিলনজাত পার্থক্য ও তুলির আঁচড়টী পর্য্যন্তও বর্ত্তমান থাকে। একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানবিদ্ না হইলে ত্রিবর্ণের সাহায্যে এরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ করা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। আক্ষেপের বিষয় আমাদের দেশে কি চিত্রকর (Painter) কি মুদ্রাকর (Printer ও Pressman) সকলেই সমান! মুদ্রণ শিল্পেও যে কিছু শিখিবার পড়িবার আছে, তাহা এ দেশের শিক্ষিত সমাজ এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেই কারণ নিরক্ষর প্রেসম্যানের হাতেই ইহা নিতান্ত নীচ কার্য্য বলিয়া এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য মুদ্রণ-শিল্পের তুলনায় ভারত যে এখনও এক শতাব্দী পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সূচী।

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
ত্রিরত্ন-বিজয়।	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।	১
কৃতঘ্নতার পুরস্কার।	শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।	[illegible]
কাশীধাম।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	[illegible]
নটগুরু অর্দ্ধেন্দু শেখরের প্রতি।	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১[illegible]
বর্ণ-চিত্রণ।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	১[illegible]
ঠাকুরমা।	শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।	১[illegible]
ত্রিবর্ণচিত্র মুদ্রণ।		২[illegible]

কাশীধাম।

সারনাথ স্তূপ।

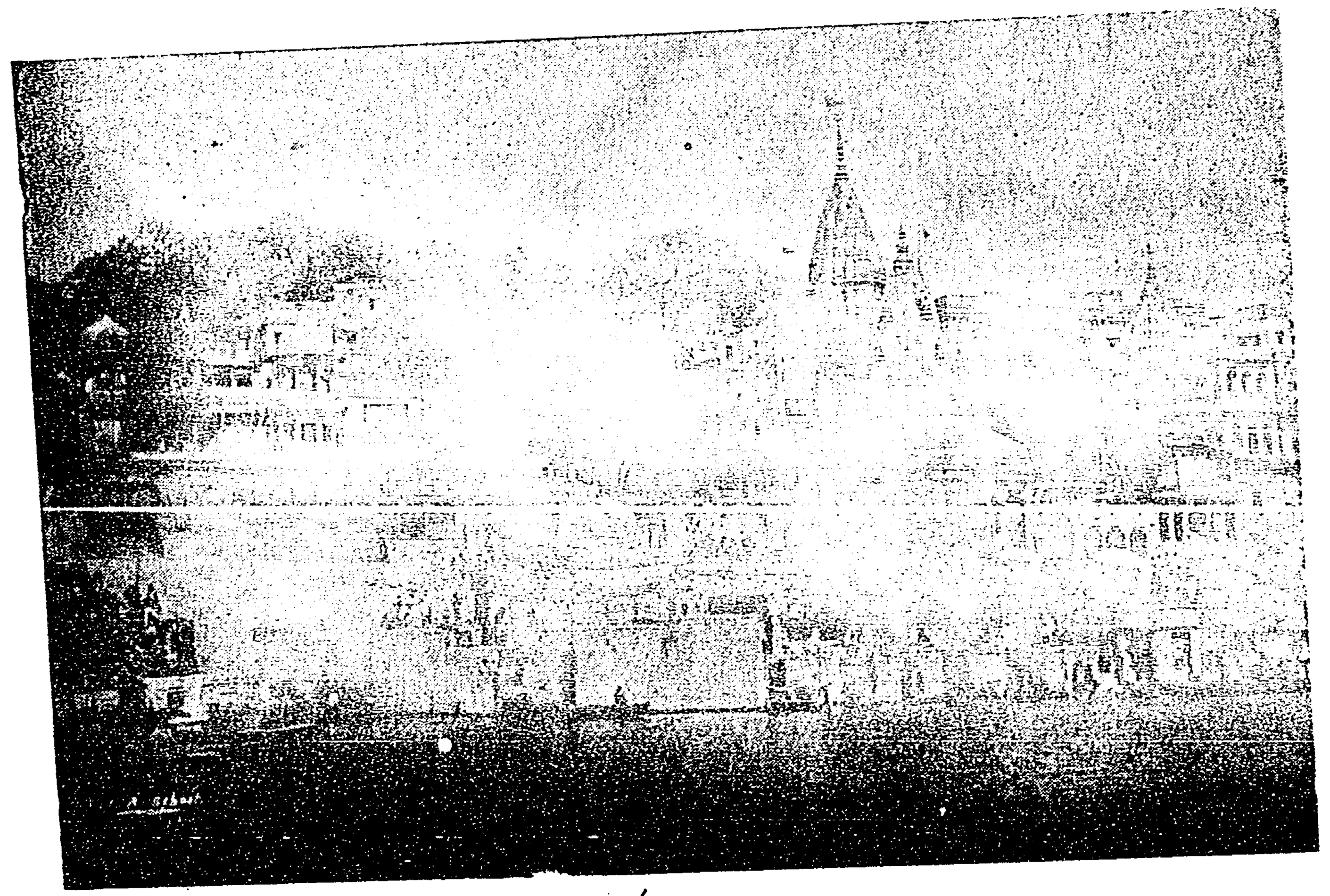

মণিকর্ণিকা।

The Indian Art School, 92, Bowbazar Street, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৯ম খণ্ড } সন ১৩১৬—কার্ত্তিক। { ২য় সংখ্যা

কাশীধাম।

(১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

আদি বিশ্বেশ্বর।

এই মস্‌জিদের কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর পশ্চিম কোণে আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহাই বিশ্বনাথের সর্ব্ব প্রাচীন মন্দির বলিয়া সকলের বিশ্বাস। এই স্থানে হিউয়েন্থ সাং প্রায় ৬৬ হস্ত দীর্ঘ সেই বিরাট তাম্রময় শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। লোক-পরম্পরায় তাহাই প্রসিদ্ধ আছে। বোধ হয় ১১৯৪ খৃঃ অব্দে যখন দুর্বৃত্ত কুতব, কাশী-নরেশ মহারাজ জয়চাঁদকে পরাভূত করিয়া কাশীস্থিত সহস্রাধিক মন্দির ও দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করে, সেই সময় বিশ্বেশ্বরের এই প্রাচীন মন্দিরও বিনষ্ট করিয়া সমভূমি করিয়া দেয়। অনন্তর বিশ্বনাথের দ্বিতীয় মন্দির যাহা এক্ষণে অওরঙ্গজেব-মস্করূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুতবের কাশী পরিত্যাগের পর মোসলমানদিগের উৎপীড়ন কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইলে, হিন্দুগণ সমাগত হইয়া পুনরায় পুর্ব্ব মন্দিরের স্থানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে ও 'আদি বিশ্বেশ্বর' নামে এক সুন্দর শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মহাত্মা শেরিং প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগেরও এইরূপ অভিমত। এই মন্দির প্রায় ৬৫ ফিট উচ্চ, মন্দির চূড়া প্রকাণ্ড গম্বুজাকারে শোভিত। ইহার উপাদানে প্রস্তর অপেক্ষা ইষ্টকাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিনের সংস্কারাভাবে ইহা ক্রমে জীর্ণ হইয়াছিল, প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় এক তামাকু ব্যবসায়ী স্বধর্ম্ম পরায়ণ ধনী হিন্দু কর্ত্তৃক সুন্দররূপে সংস্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে মন্দিরের অবস্থা মন্দ নহে।

অনেক ইংরাজ পণ্ডিত অনুমান করেন, ইহার নিকটেই এক বৌদ্ধবিহার ছিল। এই মন্দিরের এবং সেই বৌদ্ধবিহারের প্রস্তরাদি সহযোগে পার্শ্বস্থ অসম্পূর্ণ এক মস্‌জিদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থাভাবে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদির মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যানুগত অলঙ্কার-পারিপাট্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক আদি বিশ্বেশ্বরের এই মন্দির হিন্দুর অতি আদরের বস্তু। ভক্তিবান হিন্দু মাত্রেই তাহা দর্শন করিয়া মন্দিরস্থিত বিশ্বেশ্বরের নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে "বারাণসী" অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, কাশীতীর্থ গঙ্গাতটস্থিত একটী অনুচ্চ পার্ব্বত্যভূমির উপর অবস্থিত। মহাত্মা "কেন" প্রভৃতিরও সেইরূপ অভিমত। প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দিরের স্থান নির্ব্বাচন বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করিলেও তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ বরুণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূমিখণ্ডের মধ্যে এই সর্ব্বোচ্চস্থান, অথবা এই বারাণসীর অন্তর্নিহিত সেই অনুচ্চ পর্ব্বতের চূড়ার উপরেই যে বিশ্বনাথের আদি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও সে আদি মন্দির বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার সন্নিধানেই বা সেই স্থানের উপরেই আদি বিশ্বনাথের এই বর্ত্তমান মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা কাশীবাসিগণ বংশ-পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ এই স্থান যথার্থই সহরের মধ্যে এখনও সর্ব্বোচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের প্রধান পথ কাশী মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক যথাসাধ্য সমতলীকৃত হইলেও ক্রমে উভয় দিকে এত অধিক নিম্নগামী হইয়াছে যে, অতি সহজেই তাহা অনুভূত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় এই মন্দিরস্থিত বিশ্বনাথ লিঙ্গের গৌরীপট্টটী অতি প্রাচীন। ইহা উৎকৃষ্ট কষ্টি পাথরে নির্ম্মিত। কুতব ও কালাপাহাড় কর্ত্তৃক কাশী বিধ্বস্ত হইবার পর নিকটস্থিত মসজিদের দ্বারদেশে ইহা পতিত ছিল, মোসলমানগণ তাহারই উপর পা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিত। অনন্তর মহারাজ মানসিংহ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রজারঞ্জন সম্রাট আকবরের সহায়তায় সেই গৌরীপট্ট মসজিদ-দ্বার হইতে উঠাইয়া যথারীতি অভিষেকান্তর বর্ত্তমান মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন লিঙ্গটীর কোনও সন্ধান না পাইয়া সেই প্রাচীন গৌরীপট্টের উপরেই আর একটী নূতন লিঙ্গ সংস্থাপিত হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা।

কাশীশ্বরী জগজ্জননী মা অন্নপূর্ণা বিশ্বব্যাপী শিবময় !জীবের বিশ্বকরে নিত্য অন্ন পরিবেশন করিতেছেন। বিশ্বনাথের রাজ্যে মায়ের কৃপায় কেহই অনশনে জীবন অতিবাহিত করে না। সন্তান অভুক্ত থাকিবে, মায়ের অন্তরে কি তাহা সহ্য হয়? মায়ের আদেশে অসংখ্য অসংখ্য 'ছত্র' চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-রূপিণী হিন্দুকুল ললনাগণ অন্নপূর্ণা দর্শন করিতে আসিয়া নিত্য কত যে, অন্ন বিলাইতেছেন তাহারইবা কে গণনা করিবে? মা কাশী-রাণী কাশী-রাজ্যে যেন প্রত্যক্ষই বিরাজমানা। কোন্ অতীত যুগে

মায়ের যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। কত বিপ্লব কত দুর্ঘটনায় মায়ের সে পবিত্র মন্দির কতবার সমভূমি হইয়াছে, আবার কতবার কত ভক্ত সন্তান কর্ত্তৃক যে, সেই মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার নিরূপণ করাও বস্তুতঃ দুরূহ! তবে ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক যে মায়ের মন্দির শেষ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার পর ১৭৮০ সম্বতে বা খৃঃ ১৭২৫ অব্দে বাজীরাও পেশোয়া কর্ত্তৃক এই বর্ত্তমান অন্নপূর্ণা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহ দৈর্ঘ্যে ৫৭॥ ফিট এবং প্রস্থে ১৯৶ ফিট হইবে। মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর ও মনোহর। মায়ের প্রস্তরময়ী অতি শীর্ণা আদি-মূর্ত্তি সততই স্বর্ণাবরণে আবৃতা থাকে। দর্শনাভিলাষী ভক্ত সন্তান তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিলে পূজারীকে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়, তাহা হইলে পূজারী বস্ত্রের কাণ্ডার করিয়া গোপনে মায়ের সেই অনাবৃতা মূর্ত্তি দেখাইয়া থাকে। সে মূর্ত্তি দেখিলেই অতি প্রাচীনা বলিয়া মনে হয়, সুতরাং তাহাই যে মায়ের আদিমূর্ত্তি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মন্দিরের সভামণ্ডপ ও পার্শ্ববর্ত্তী দালানের মধ্যে সতত বহু সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, পূজক ভক্তিভরে গদগদ কণ্ঠে বিবিধ বিশুদ্ধ স্বরলহরীতে নিত্য সপ্তসতী চণ্ডী পাঠ করিতেছেন, কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন, কেহ ভিক্ষা দিতেছে, কেহ বা অন্নপূর্ণার সেই নধর [illegible]গুলির পরিচর্য্যা করিতেছে। নবরাত্র বা দুর্গাপূজা উপলক্ষে সে শোভা এতই বৃদ্ধি হয় যে, তাহা দেখিলে বা কিয়ৎক্ষণ মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিলে প্রকৃতই মনে হয় যেন সহসা কোন্ পুণ্য ফলে সত্যযুগ-প্রবর্ত্তিত কোনও যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। "সে ভাব বস্তুতই চিত্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলে, অতি বড় পাষণ্ডেরও চিত্তে কিছুক্ষণের জন্য পবিত্র ধর্ম্মভাব আনাইয়া দেয়, আর্য্য পবিত্রতার সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সূর্য্য, গণপতি, গৌরীশঙ্কর এবং হনুমানজীর আরও চারিটী মূর্ত্তি এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভক্তগণ মায়ের নামে কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, অন্ন প্রস্তুতের কত উপকরণরাশি নিত্য যে উৎসর্গ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শনিমূর্ত্তি।

এই মন্দিরের নিকটে আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। তাহার মধ্যে শনিগ্রহের মূর্ত্তিটীই উল্লেখ যোগ্য। অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে বাহির হইয়া বিশ্বনাথে যাইবার পথে দক্ষিণদিকে এই মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

ঢুণ্টিরাজ গণেশ।

অন্নপূর্ণা হইতে পশ্চিমদিকে বাহিরে আসিবার পথে খর্ব্বাঙ্গ স্থূলতনু সিন্দুর-রজত-শোভিত একটী অতি ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীগণপতিমূর্ত্তি ঢুণ্টিরাজ বিরাজিত আছেন। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনাভিলাষী ভক্তমাত্রেই সর্ব্ব প্রথমে এই গণপতির পূজা করিয়া যান। কাশী খণ্ডে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন:—"ঢুণ্টি অর্থে

অন্বেষণ, সমস্তই তাঁহার অন্বেষিত, সেইকারণ তিনি ঢুণ্ডিরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ঢুণ্ডিরাজকে পূজায় পরিতুষ্ট করিতে না পারিলে, কেহই কাশীতে আসিতে পারে না। কাশীবাসী যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরে আমায় প্রণাম করে, তাহার আর ইহ সংসারে জন্ম হয় না। স্বয়ং কাশীপতি বিশ্বনাথকেও এক সময় ঢুণ্ডির সাহায্যে নিজ পুরীর অন্বেষণ করিয়া লইতে হইয়াছিল। এই কারণে কাশী-যাত্রা করিতে হইলেও সর্ব্বপ্রথমেই ঢুণ্ডিরাজের পূজা করিতে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

অঞ্জলি।

—ঃ০ঃ—

আমি বহিয়া এনেছি হৃদয় বেদনা
তোমারে সঁপিব বলে—
তুমি যেওনা দেবতা, এখনি যেওনা
নিঠুর চরণে দলে!
সারা বুক মোর মন্থন করি'
যে দীরঘ-শ্বাস দিবা-বিভাবরী
উঠিছে নিয়ত তোমা শুধু স্মরি'
নিরাশার দাবানলে,—
পূজার অর্ঘ্যে সাজায়ে শ্রীহরি,
এনেছি চরণ-তলে!
ওগো, তোমারি হাতের করুণার দান
আমার নয়ন-বারি,
হের সঞ্চয় করি রেখেছি মহান্
প্রতি কণিকাটী তা'রি!
বিফল সাধনা, অপূর্ণ সাধ,
দুঃখ দৈন্যের হাহাকার-নাদ,
পদে পদে শত শঙ্কা-প্রমাদ
অপযশ প্রাণ-হারী,—
কিছুই আজিকে দেই নাই বাদ
আসি নাই কিছু ছাড়ি!
প্রভো, সংসার ভুলে দিয়েছে আঘাত
অঙ্কিত সব বুকে,—
আজো হয়নি শুষ্ক সে শোণিত পাত
সত্ত রেখেছি সুখে!
যে গানের সুর হয়েছি বিস্মৃত,
আধখানি গেয়ে স্তব্ধ সে গীত,
যে লয়ে তন্ত্রী ছিন্ন লাঞ্ছিত
লুণ্ঠিত ধূলি মুখে,—
সকলি কুড়ায়ে আজি বাঞ্ছিত,
আনিয়াছি সকৌতুকে!
এ যে কুসুম-মাল্য পবিত্রতম
অঞ্জলি অভিনব—
কহ ব্যর্থ কেমনে হবে প্রিয়তম,
তোমারি দত্ত সব!
এমন বিমল, এমন শোভন,
অর্ঘ্য কোথায় পাইবে ভুবন,
মর্ম্মের ব্যথা মোর হে রাজন্
যোগ্য বিভূতি তব!
নিজ করে তুমি করগো গ্রহণ
অঞ্জলি এই নব!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

প্রকৃতি বা মায়া।

"ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণ … বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ।" সৈব …ত্যাচাতে।

এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, পালনাদি কার্য্য-…রিণী ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্ম শক্তিই প্রকৃতি বা মায়া। …ক প্রধান, অব্যক্ত, এবং স্বভাব শব্দ দ্বারাও স্থানে …নে অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রকৃতি তিন …শে বিভক্ত; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। যথা—

"সত্ত্বরজস্তমঃ সমতারূপৈব মূলপ্রকৃতিঃ।"

যাহা উৎকৃষ্ট, প্রকাশশীল, শান্ত, সুখজনক ও …ত্র তাহাই সত্ত্ব। যাহা নিকৃষ্ট, স্থূল, নিদ্রা, আলস্য, …ড়তা ও অজ্ঞান প্রভৃতির জনক, অত্যন্ত মলিন এবং আবরক তাহাই তমঃ। এই উভয় গুণই নিষ্ক্রিয়। রজোগুণ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ও পরিচালক; …দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতির জনক এবং রাগাত্মক অর্থাৎ প্রবৃত্তিজনক। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে "লোহিত শুক্ল …কৃষ্ণাং" ইত্যাদি উল্লেখ আছে। রজঃ লোহিত অর্থাৎ রক্তবর্ণ; সত্ত্ব শুক্ল অর্থাৎ শুক্লবর্ণ (প্রকাশক); তমঃ কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ (আবরক)। সৃষ্টির আদিতে …প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায়, এই—সত্ত্বাদি গুণত্রয় …মা, সঙ্কোচ বা যুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করে। এই …মিত্ত পরমেশ্বরের মায়া বা সৃষ্টিশক্তিকে শাস্ত্রকারেরা …গমায়া, মহামায়া এবং যোগনিদ্রা ইত্যাদি শব্দে …হিত করিয়াছেন।

বোধ হয় সৃষ্টির প্রাক্‌কালে যখন সত্ত্বাদি গুণত্রয় সম বা যুক্ত অবস্থায় থাকে, তখন পরমেশ্বর সৃষ্টি সম্বন্ধে একরূপ সুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন। এজন্যই ঐ অবস্থা যোগনিদ্রা নামে কথিত হইয়াছে।

"অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়, একান রমতে দ্বিধা ভবতি"

ভগবানের এইরূপ ইচ্ছা প্রযুক্ত পৃথগ্‌ভূতা প্রকৃতি বৈষম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় সৃষ্টি প্রবাহ আরব্ধ হয়। অর্থাৎ যেমন পঙ্গু ও অন্ধ ইহারা উভয়েই পৃথগ্‌ভাবে কোনরূপ কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয় না, কিন্তু পঙ্গু যদি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহা হইলে গমন এবং দর্শনাদি কার্য্যে সমর্থ হইয়া কার্য্যান্তর করিতেও সক্ষম হয়। তদ্রূপ জড়াত্মিকা প্রকৃতি অজ্ঞানতা নিবন্ধন স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হন না। পরমেশ্বরও স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, তিনিও শক্তি বিরহিত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। অতএব উভয়ের অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়ার সান্নিধ্য বশতঃ চিৎপ্রতিবিম্বিতা প্রকৃতি জগৎ নির্ম্মাণে সমর্থা হন। এই জন্যই তাঁহাকে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া বলিয়া থাকে। পুরুষপদবাচ্য পরমেশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃতির বিকার বা গুণবৈষম্যরূপ যে প্রথম সৃষ্টি তাহারই নাম—মহৎ বা মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব শাস্ত্রে হিরণ্যগর্ভ শব্দ দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাই স্থূল, সূক্ষ্ম জগৎনির্ম্মাণের মূলীভূত কারণ অথবা ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বুদ্ধি। সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন। এক্ষণে জগৎনির্ম্মাণেচ্ছু হইয়া, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে তাহাতে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। তৎপরেই

তাঁহাতে যে অহং ভাব অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে আমিত্ব জ্ঞান জন্মে, শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কার তত্ত্ব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। যথা—

"মহত্তত্ত্বাদ্বি কুর্ব্বাণাদহং তত্ত্বং ব্যজায়ত।"

এই অহংতত্ত্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন প্রকার।

প্রথমতঃ তামসিক অহংতত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়, তৎপরে উক্ত তন্মাত্র সমূহের মিলিত সত্ত্বাংশে সাত্ত্বিক অহঙ্কার দ্বারা মন এবং রাজসিক অহঙ্কার দ্বারা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। (কেহ কেহ বলেন মন এবং বুদ্ধি উভয়ই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়।) উক্ত ভূত সমূহের মিলিত রজো অংশে রাজসিক অহঙ্কার দ্বারা প্রাণ এবং প্রত্যেক ভূতের সত্ত্বাংশে সাত্ত্বিক অহঙ্কার দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও প্রত্যেকভূতের রজো অংশে রাজসিক অহঙ্কার দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র এবং দিক্‌, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দশ দেবতার উৎপত্তি হয়। যথা—

"বৈকারিকান্মনোযজ্ঞে দেবাবৈকারিকাদশ।
দিগ্বাতার্ক প্রচেতোঽশ্বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্রকাঃ।"

শাস্ত্রে যাহা মহত্তত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই অধ্যাত্মরূপে—চিত্ত, উপাস্যরূপে—বাসুদেব। এই প্রকার অহঙ্কারতত্ত্ব—সঙ্কর্ষণ স্বরূপ; বুদ্ধি, প্রদ্যুম্ন ও মন অনিরুদ্ধ। ইহাই চতুর্ব্যূহ অন্তঃকরণরূপে অভিহিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ বহুকালাবধি অসংহত বা অপঞ্চীকৃত অবস্থায় ছিল। সুতরাং তাহাদের স্থূল জগৎ নির্ম্মাণে সামর্থ্য ছিল না। পরে সময়ানু সারে সূক্ষ্মভূত সকল পঞ্চীকৃত * হইল, এবং আত্ম মাত্রাসকল উহাদের সহিত মিলিত হইয়া রহিল সেই পঞ্চীকৃত স্থূল পঞ্চভূত হইতে ভূরাদি লোক সৃষ্ট হইয়াছে।

শাস্ত্রান্তরের মত এই যে, মিলিত পঞ্চভূত ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত জীবাত্মা কাল সহকারে সূর্য্যে ন্যায় দীপ্তিশালী এক বৃহৎ অণ্ডরূপে পরিণত হইল। যথা—

"তদণ্ড মভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহঃ।"

প্রথমতঃ পঞ্চভূত মিলিত থাকায় অত্যন্ত তর ছিল; পরে ক্রমশঃ মূল অণ্ডস্বরূপ পৃথিবীর গা জল, জ্যোতিঃ বায়ু এবং আকাশ পৃথক্ পৃথক্ রূপে সংসক্ত হইতে লাগিল। জল পৃথিবীর কারণ স্বরূ এবং পৃথিবী অপেক্ষা লঘু; অতএব জল পৃথিবীকে বেষ্টন ও প্লাবিত করিয়া রহিল। এইরূপে জ্যোতি জলকে, বায়ু জ্যোতিকে এবং আকাশ বায়ুকে বেষ্টন করিল। এতদ্‌ভিন্ন পুরাণকারেরা "মহৎ ও অহ স্কারকে" দুইটী আবরণ স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন এই সময়ে চতুর্দ্দিকে কেবল জলই দৃশ্য হইল পশ্চাৎ সেই জলপ্লাবিত পৃথিবী উন্নত হইয়া উঠিল অর্থাৎ জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবা নিমিত্ত ভগবান একদিকে পর্ব্বতসমূহ নির্ম্মাণ ক লেন, এবং অন্যদিকে জলরাশিকে সমুদ্ররূপে স্থাপি

* কালক্রমে এক এক সূক্ষ্ম ভূতের অর্দ্ধেকের সহিত অপ চারি চারি ভূতের অষ্টম অংশ মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেকেই পুষ্ট পরিণতি লাভ করে। সেই পরিণতিকে পঞ্চীকরণ কহে।

রিলেন। এই জল হইতে উদ্ধার করাই শাস্ত্রে ন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক কল্পারম্ভে গবান ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে সৃষ্টি চনা করেন।

ঐ সময়ে ব্রহ্মা জাগ্রত থাকেন, ইহাই তাঁহার ন এবং প্রতি কল্পান্তে তাঁহার রাত্রি উপস্থিত হইলে ান পৃথিবীরূপ অণ্ড জলমগ্ন হয়, তখন তিনি পুনর্ব্বার নিদ্রিত হন। কিন্তু ভগবৎ শক্তি তখন জলব্যাপী হইয়া জাগ্রত থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গবানের পৃথিবী পৃষ্ঠের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বরূপ কল্পিত ব্রহ্মা দ্রিত হন, কিন্তু জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার রিবার নিমিত্ত নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত জলব্যাপী ভগবৎ ক্তি জাগ্রত থাকেন। বস্তুতঃ পরমেশ্বর তাঁহার ই সৃষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া াকে এই বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। নও তিনি এই সৃষ্টির প্রত্যেক অংশে অণুপ্রবিষ্ট য়া অবস্থিতি করিতেছেন ও চিরকালই এইভাবে অবস্থান করিবেন। অতএব আমাদের ভোগায়তন শরীর, অণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্তু সমূহ, এবং তদাহরণকারী ইন্দ্রিয়গণ এই সমস্তই প্রকৃতি বা মায়াজাত। এতদ্ব্যতিরিক্ত পুরুষ ভোক্তা এবং দ্রষ্টা নামে অভিহিত।* এই পুরুষ জ্ঞানই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু তাহা সাধন এবং তদনুগ্রহ ক্ষ। এই মায়া কল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদিতে আসক্ত হইয়া সেই পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য প্রত্যেকেরই য় বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয় সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদির ভূত কারণ স্বরূপ প্রাণ সংযমের উপায়ভূত প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ প্রাণস্পন্দ রোধ হইলেই চিত্তবৃত্তি সমূহ নিরুদ্ধ হয়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই মন স্থিরতা লাভ করে। এইরূপ চিত্তৈকাগ্রতা হইতেই লোক সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সমাধি বা নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ হইলেই সেই পরমপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া মানব পুনরাবৃত্তি রহিত হইয়া সেই সচ্চিদানন্দময় পুরুষে মিলিত হইয়া সোঽহং অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কবিরাজ শ্রীঅমূল্য চন্দ্র বৈদ্যরত্ন।

ভাস্কর্য্য।

(গত বর্ষের ২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

অনেকে মনে করেন য়ুরোপীয় চিকিৎসায় বিশেষ বৃটিশ জাতির ধারাবাহিক শবচ্ছেদনাদি অভ্যাস ও পরীক্ষা দ্বারা শস্ত্র-চিকিৎসার আবিষ্কার ও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস ঠিক সেই কথার পোসকতা করে না। ইতিহাস বলে "ভারতই শল্য-চিকিৎসার আদিম স্থান। ভারতের চিকিৎসক ঋষিমণ্ডলীই ইহার আবিষ্কর্ত্তা। আমি কিরূপে বা কেন এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সে কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলে বোধ হয় অনেকের সংশয় দূর হইবে না। যাহা হউক সংক্ষেপেই বলি,—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি এই 'ভাস্কর্য্যের' কোন কোন উপাদান সংগ্রহ করিবার আশায় পাটলি-পুত্রে (অধুনা ইহা পাটনা বলিয়া প্রসিদ্ধ) ভারত-সম্রাট অশোকের প্রাসাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়

সেই সসাগরা পৃথিবীপতির প্রাসাদাপাদে কতকগুলি চূর্ণ ইষ্টকস্তূপ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া তাহার অস্তিত্বের শেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে, আর তাহারই এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র লৌহ ফলকে ইংরাজীতে লিখিত আছে "Exavating in 1896 cy Dr. L. A. Wadder M. B. Site discovered the ancient Pataliputra." ইহাইমাত্র দেখিলাম, আর দেখিলাম সেই চূর্ণ ইষ্টকস্তূপের পূর্ব্ব প্রান্তে পুষ্করিণীর শেষ চিহ্ন একটী অতি সামান্যখাদমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিকটস্থিত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহার নাম 'চন্দনতলাও'; এটী সম্রাট অশোকের প্রাসাদান্তর্গত খিড়কির পুষ্করিণীরূপে ব্যবহার্য্য হইত; দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলাম, আর সাশ্রুনয়নে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম—তখন কেবলই মনে হইতে লাগিল--হায়! ভারতসাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজধানী, এক সময় যথা হইতে সমগ্র ভারতের শাসনচক্র পরিচালিত হইত, সেই জগৎ প্রসিদ্ধ পাটলিপুত্রের এই পরিণাম। যে অশোকের শত শত জয়স্তম্ভ আজিও ভারতের নানা প্রদেশে তাঁহার অপ্রতিহত বিমল জয়কীর্ত্তন করিতেছে, সেই অশোকের সর্ব্ব প্রধান আদরের, কত রত্নরাজি বিভুষিত প্রাসাদ-অট্টালিকার এই পরিণতি! কাল, তুমি কখন যে কি কর, কে তাহার নিশ্চয় করিবে—কেবল মুর্খ মানব আমরা, দুর্দ্দিনের ভয়ে তোমার ক্রোড়ে স্থান পাইয়া মনে করি তোমাকেও বুঝি আয়ত্ত্ব করিতে পারিয়াছি। যাক সে শোক প্রকাশের এখন সময় নয়, যাহা বলিতে ছিলাম তাহাই বলি। পাটলীপুত্রের সেই দুর্ব্বহ স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া বাঁকিপুরে আমার পরম সুহৃদ বৈদ্যকুলতিলক সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজমোহন রায় কবীন্দ্র ভায়ার বাটীতে আসিলাম। তিনি এক্ষণে পাটনা বিভাগের সর্ব্বপ্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। তাঁহার সহিত ভাস্কর্য্য-সম্পর্কীয় নানা কথা প্রসঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র ক্রমে শল্যাস্ত্র সম্বন্ধে কথা উঠিল—তাঁহার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার সেই দুর্ব্বহ স্মৃতিকষ্ট অনেকটা প্রশমিত হইল। তিনি বলিলেন, এখানে মৌলবী খোদাবক্স খাঁ বাহাদুর সি, আই, ই মহাশয়ের একটী অতুলনীয় সাধারণ পুস্তকাগার (Public Library) আছে, তথায় বহু প্রাচীন আরব্য ও পারস্য ভাষায় লুপ্ত গ্রন্থ সংগৃহীত রহিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে শল্যাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে। আমি তাঁহার কথা শুনিবামাত্র তাঁহার সহিত খাঁ বাহাদুরের লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইলাম। খাঁ বাহাদুর তখন সে-স্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার ভীষ্মের ন্যায় বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহারই এক পুত্র বি, এ; উপাধিধারী, নাম ঠিক স্মরণ নাই, তিনিই গ্রন্থরক্ষক বা লাইব্রেরীয়নের কর্ম্মে নিযুক্ত, গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি উপযুক্ত মাসহারা পাইয়া থাকেন। তিনিও অতি অমায়িক ব্যক্তি, আমাদের লইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা কাল এ গ্রন্থ সে গ্রন্থ বাহির করিয়া কত কথা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, আরব্য বা পারস্য ভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত আমাদিগের অপরিচিত। তিনি নানা গ্রন্থের নানা ব্যাখ্যা করিলেন, সকল কথা স্মরণ নাই, তবে একখানি গ্রন্থ যেখানি আমি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়াছিলাম, যাহাতে

আমার ভাষাতেও বা সাধারণের ভাষাতেও কিছু লিখিত অর্থাৎ অঙ্কিত ছিল। সেই অল্পক্ষণের মধ্যে তাহা হইতে দুই একটী বিষয় নকল করিয়া লইবারও প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, পাঠকবর্গকে তাহা পরে উপহার দিব। এই গ্রন্থ হইতে ও অন্যান্য গ্রন্থহইতেও তিনি যেরূপ মর্ম্মানুবাদ বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল। কয়েক বৎসরের কথা, সব ঠিক স্মরণ নাই, তবে যে গুলি সংক্ষেপে লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি।—

প্রথমে সেই গ্রন্থখানি শল্যচিকিৎসক মহাত্মা জারাভির (Zahravi's Book on Surgery) শস্ত্র-চিকিৎসার প্রকাণ্ড গ্রন্থ, ৫০০ হিজরি সালে আরব্য ভাষায় গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত এবং তাঁহার নিজ হস্ত রচিত প্রায় পাঁচশতেরও অধিক শস্ত্র-চিত্র তাহাতে অঙ্কিত আছে। স্পেনের আণ্ডালুসিয়া নামক স্থান হইতে এই গ্রন্থখানি সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত লাইব্রেরীয়ন মহাশয়ের প্রমুখাৎ ও এসিয়াটিক রিসার্চের (Asiatic researches, Vol. XII. P. P. 161—164.) গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে, ৭৮৬ হইতে ৮০৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে আরব দেশের প্রসিদ্ধ নরপতি হারুণ অল রসীদের উৎকট পীড়া হয়, কিছুতেই তাহার প্রতিকার না হওয়ায় তাঁহার প্রতিবাসী ও বন্ধু ভারতসম্রাটের নিকট হইতে মঙ্ক (মানিক্য) নামক জনৈক চিকিৎসককে নিজের চিকিৎসার জন্য লইয়া যান এবং অতি অল্পকালমধ্যে রোগমুক্ত হইলে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। "উমুন অল্ অম্বা ফিতল্ কাতুল অৎবা" নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে—আরবাধিপতি এই সময় উক্ত মঙ্ক (মানিক্য) বাথর (ভাস্কর) ও কঙ্ক প্রভৃত পণ্ডিতগণকে নিজ রাজ-সভায় সভাসদরূপে পরিগৃহীত করিয়া, সম্রাট তাঁহাদের দ্বারা অনেকগুলি জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের গ্রন্থ আরব্য ও পারসীক ভাষায় অনুবাদ করাইয়া লন। আরব্য ভাষায় সংস্কৃতের সেই নাম ও শব্দগুলি যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় বিন্দু বা নুক্তার অভাবে অথবা লিপিকর-দোষে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে 'সিরক্' 'সর্সদ' ও 'য়েদান' এই তিনখানি চিকিৎসা গ্রন্থের উল্লেখ আছে। উহা যে আমাদের বৈদ্যকগ্রন্থ যথাক্রমে চরক, সুশ্রুত ও নিদান তাহা বোধ হয় বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। ৭৭৩ খৃঃ অব্দে বা কিছু পরে অল্ মন্সুর নামক অন্য এক আরবীয় নরপতির অনুমতিক্রমে একখানি আর্য্য-জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুবাদ হইয়াছিল, উহার আরবী নাম সিন্দহিন্দ। মহাত্মা 'কোলব্রুক' উহা সংস্কৃত 'ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের' অনুবাদ বলিয়া অনুমান করেন। এই সিন্দহিন্দ পুস্তক অবলম্বন করিয়াই 'য়াকুব' নামে আর একটী গ্রন্থকার আরব্য ভাষায় আর একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বীজগণিত-বিদ্যাও ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে আরবে, পরে গ্রীসদেশে প্রচারিত হয়। গ্রীক পণ্ডিত ডায়োফ্রেণ্টস্ নিজ পুস্তকে বারম্বার ভারতবর্ষীয় বীজগণিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে যাহা হউক চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বলিতেছিলাম—সুশ্রুতের অনুবাদের পর বহু আরব দেশীয় চিকিৎসক তাহাতে কৃতবিদ্য হন ও মানিক্য প্রভৃতির নিকট হইতে হাতে কলমে

শস্ত্র-চালনা অভ্যাস করেন। পরে আরব-সম্রাট কর্ত্তৃক যুরোপের স্পেন প্রভৃতি দেশ আবিষ্কৃত হইলে তত্তৎ স্থানে আরব্য শাস্ত্রের-প্রচার ও শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেন দেশেই তাঁহাদের প্রধান স্থান ছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ শল্য-চিকিৎসক জারাভিও চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপনা ব্যপদেশে স্পেনে প্রেরিত হন। তিনি সুশ্রুতে যেরূপ সুপণ্ডিত হইয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজকৃত গ্রন্থেই প্রমাণ হইতেছে। তিনি সুশ্রুত অবলম্বন করিয়া শিষ্যমণ্ডলীকে যাহা উপদেশ দিতেন, তাহাই তাঁহার স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে যে সকল শস্ত্রের আদর্শ চিত্রিত আছে, তাহা অদ্ভূত ও অসাধারণ। সে সকল চিত্র দেখিলে বর্ত্তমান সময়ের যে কোনও শ্রেষ্ঠ শস্ত্র-চিকিৎসক বিস্মিত হইয়া যাইবেন। আমি পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে কয়েকটী শস্ত্রের আদর্শ প্রদান করিলাম। অধুনা এমন কোনও আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি দেখি না, যাহা তাঁহার এই গ্রন্থে অঙ্কিত নাই। যে সকল যন্ত্র যুরোপীয়গণ নিজেদের আবিষ্কৃত বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাহার মূল আদর্শ ইহাতেই চিত্রিত রহিয়াছে। সামান্য ফোড়া অস্ত্র করিবার বেল্‌কার বা বেধনী, অস্থিচ্ছেদক আরা বা করাৎ, ক্রমে চক্ষু চিকিৎসার (Eye operation) এর যন্ত্রাদি, দাঁত তোলা, গর্ভস্থ শিশু বাহির করিবার (Forceps) আদি সকল যন্ত্রই আছে, এ ক্ষেত্রে সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। কোনও সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ইচ্ছা করিলে, তাহার অনুবাদ করাইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসায় এক নবযুগের আবির্ভাব করিতে পারেন।

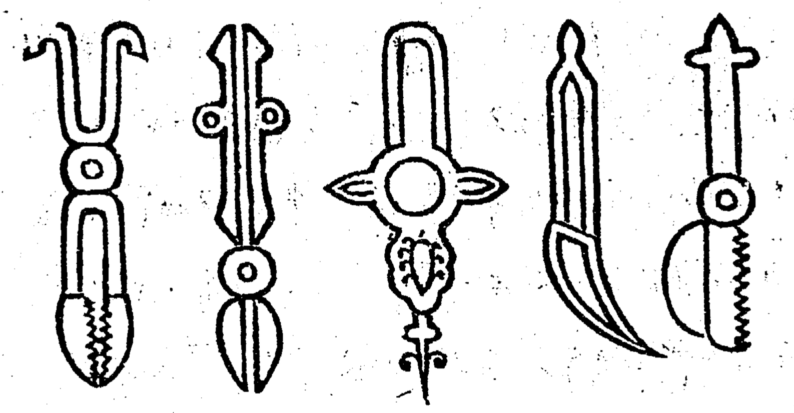

১ ২ ৩ ৪ ৫

এই যন্ত্রগুলি অবশ্য প্রাচ্য প্রদেশ-সুলভ আদর্শেই চিত্রিত। আধুনিক যুরোপীয় ধরণে যথেষ্ট চাকচিক্য-শালী নহে অথবা সেই গ্রন্থকার নিজে সেরূপ উৎকৃষ্ট চিত্রকরও ছিলেন না, সে কারণেও সেগুলির ততদূর সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয় নাই। তবে স্থূলতঃ যন্ত্রগুলির চিত্র মনোরম। ১মটী অস্থিচ্ছেদক আরা যন্ত্র বা করাৎ, ২য়টী সাধারণ বেলকার বা বেধনী, ৩য়টী চক্ষে ঔষধের বিন্দু প্রয়োগজন্য ড্রপার (Dropper) ইহার মধ্যস্থল রবার ভল্‌ভযুক্ত, ৪র্থটী ফরসেপ, ৫মটী দাঁত তুলিবার যন্ত্র। এই সামান্য পাঁচটি যন্ত্র হইতেই প্রাচীন আর্য্যদিগের শল্যাস্ত্রের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। যে কেহ যাইয়া বাঁকিপুরের খোদা-বক্স লাইব্রেরীতে তাহা দেখিয়া নয়ন-মন-চরিতার্থ করিতে পারিবেন। অনেকে হয়ত এখন মনে করিবেন, যদি ভারতে শস্ত্র-চিকিৎসার এতই প্রাধান্য ছিল, তবে তাহা লোপ পাইল কেন? ইহার উত্তরে দুইটী কথা বলিবার আছে—প্রথম বহুকাল ধরিয়া বিদেশীয় রাজার আধিপত্যহেতু ভারতের সর্ব্ব বিদ্যা ও সকল শাস্ত্রই বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থাদি বিদেশীয় দিগের উৎপীড়নায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, সেই কারণ পরবর্ত্তী সময়ে উপযুক্ত শাস্ত্র এবং রাজ-সহানুভূতির অভাবে

ক্রমে সেই শল্যচিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ লুপ্ত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ এ দেশে একদিন ভৈষজ্য-বিধানের এতই উন্নতি হইয়াছিল যে, কোন ব্যাধিতেই অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক পড়িত না। সকল রোগই কেবলমাত্র ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা নিরাময় হইত। ভারতে, বিশেষ বঙ্গ ও গৌড় প্রদেশে যে, ঔষধের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তাহার এখনও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌড়ের বৈদ্য-সম্রাট-দিগের সময়ে আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদ উন্নতির চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। হিন্দু সম্রাটগণ সে কালে আয়ু-র্ব্বেদের উন্নতিকল্পে নানাবিধ বিধানে সহায়তা করি-তেন। নূতন ঔষধের আবিষ্কার ও তাহার পরীক্ষার জন্য রাজ-বিধান অনুসারে প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে শ্মশানে চরমদণ্ড প্রদান না করিয়া কবিরাজদিগের নিকট প্রদত্ত হইত। এইরূপ ব্যক্তিকে 'রোম্‌থা' আখ্যা প্রদান করিয়া তাহাদের কপালে 'রোম্‌থা' এই শব্দটী চিরস্থায়ীরূপে উলকি দ্বারা লিখিয়া দেওয়া হইত। কবিরাজগণ ইচ্ছা করিলে যে কোনও ঔষধ সেই সকল লোককে অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। সেই চরমদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবন বর্ত্তমান সময়ের মত বৃথা বিনষ্ট না হইয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত হইত। এইরূপে সুবিজ্ঞ তান্ত্রিকসাধক ও কবিরাজগণ দ্বারা প্রত্যহ কত নব নব ঔষধের আবিষ্কারপথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহারই ফলে দেশের সাধু সন্ন্যাসী অবধূত হইতে গৃহের প্রবীণা গৃহিণী পর্য্যন্ত সকলের নিকটই এখনও কত শত অমূল্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ টোটকা ও ধাতুঘটিত ঔষধের সংবাদ শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও হাত পা ভাঙ্গিলে, ফোড়া হইলে, দাঁতের গোড়ায় পোকা লাগিলে, প্রসূতি প্রসব বেদনায় অস্থির হইলে, কত পাতা লতা শিকড় বাকড় প্রভৃতি সিদ্ধ-ঔষধি প্রয়োগদ্বারা তৎক্ষণাৎ সুফল পাইতে দেখা যায়। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের সহিত এ সকল তত্ত্বের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ না থাকিলেও, প্রসঙ্গ ক্রমে নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ ঘটনাটী এ স্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া বোধ হয়, বরং শল্যচিকিৎসায় শস্ত্রপ্রয়োগ প্রভৃতির বর্জ্জন-পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল মতের পোষকতাই করিবে। বহু দূরের বা বহু দিনের কথা নহে—এই কলিকাতারই উপকণ্ঠস্থিত বড়িশাবেহালা গ্রামে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাস করেন। তাঁহারই চতুর্থীকন্যার বালিকা অবস্থায় পশ্চাতে কোমরের উপর একটী প্রকাণ্ড আব (টিউমার) হয়। সকল ডাক্তারেরই অভিমতে তাহাতে শস্ত্রপ্রয়োগ করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির হয়। কলিকাতার প্রধান প্রধান সকল চিকিৎসকই তাহার পরীক্ষা করিলেন, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস সাহেবও দেখিয়া বলিলেন ইহা কাটিয়া দিলে সারিলেও সারিতে পারে—কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনের আশা করা যায় না, কারণ ইহার ক্রিয়া এখন অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ডাঃ নন্দী বিদ্যুৎ প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ অনেক রোগ আরোগ্য করেন, তাঁহাকেও দেখান হইয়াছিল, তিনিও বলিলেন ইহা সারিবে না। হঠাৎ একদিন ট্রামে যাইতে যাইতে অবিনাশ বাবু আর এক

ব্যক্তির সহিত কন্যার এই রোগের কথা বলিতে-ছিলেন। সেই গাড়ীর কণ্ডাক্টার শুনিয়া বলিল "বাবু আমি একবার দেখিতে পারি কি? যদি প্রকৃত আব্ হয়, তাহা হইলে আমি সারাইয়া দিতে পারিব।" অবিনাশ বাবু তাহাকে বাড়ীর ঠিকানা দিলেন। পর দিবসেই বেচারা অবিনাশ বাবুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়া কন্যার সেই ফোড়া দেখিল এবং প্রকৃত আব বুঝিয়া অনতিবিলম্বে একটী সেঁকুল কাঁটার মুখে সামান্য মেটে সিন্দুর ও একটী কি গাছের রস দিয়া সেই আবের উপর বসাইয়া দিল, তাহার উপর একখানি কাপড় দিয়া বাঁধিয়া, বলিল "আমি তিন দিন পরে আসিয়া খুলিয়া দিব, ইহাতে কোনও যন্ত্রণা হইবে না।" তৃতীয় দিবসে সেই ব্যক্তি যথাসময়ে আসিয়া কাপড়ের বাঁধন খুলিয়া দিবামাত্র হুড় হুড় করিয়া পুঁজ বাহির হইতে লাগিল, পুঁযের সহিত হাড়ের কুচা চূণের জলের মত বাহির হইতে লাগিল, দুই তিন দিন ক্রমাগত মালসা মালসা পুঁজ বাহির হইলে তাহার সহিত খণ্ড খণ্ড অস্থিচূর্ণ তাহার মুখে আসিয়া আটকাইতে লাগিল, অবিনাশ বাবু তাহা দেখিয়া নিকটস্থ এক ডাক্তারকে দেখাইলেন—ডাক্তার বাবু সেই মুখ ছুরি দিয়া একটু বড় করিয়া দিলেন। কিন্তু ছুরি স্পর্শ হইবার পর হইতে রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। সেই কণ্ডাকৃটার আসিয়া বলিল, আপনারা ভারি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, ইহা অবধৌত ঔষধ, ইহাতে আপনদের বিশ্বাস চাই? যাহাহউক আমি ঔষধ দিতেছি, আর কোনও কষ্ট হইবে না, তবে ঘায়ের চিহ্নটী থাকিবে। ছুরি ছুয়ান না হইলে ক্ষতটী বেমালুম মিলাইয়া যাইত। যাহ... হউক এই মলমটী দিতে থাকুন সমস্ত সারিয়া যাইবে। বাস্তবিক ১০।১২ দিনের মধ্যে সম... শুখাইয়া গেল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারা গিয়াছে, কোনও এক সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পিতাকে এই ঔষধটী দিয়া গিয়াছেন, ... পর্য্যন্ত যাহাকে যাহাকে দেওয়া হইয়াছে কেহ... নিরাশ হন নাই। অবিনাশবাবু সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিলে, ... ব্যক্তি সন্ন্যাসীর অনুমতি ক্রমে একটী কড়িও লইতে পারিবনা বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল। কন্যা... এখন বেশ সারিয়া গিয়াছে। মাজু-সন্তোষবা... নামক স্থানে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যা... হউক বোধ হয় এক্ষণে পাঠক সহজেই অনুমা... করিয়া লইতে পারিবেন যে ভারতে চিকিৎসা বিদ্যায় উন্নত শল্যাস্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন থাকিলে কেন তাহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছিল!

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী

ইতিহাসের এক অধ্যায়।

যে সময়ে ভারতে মোগল সিংহাসন টলটলায়মা... চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র-বিপ্লবের খরস্রোত প্রবাহিত—মুকু... ধারী নরপতি হইতে পর্ণকুটীরবাসী কৃষক পর্য্য... শস্ত্রধারী—ভারতের অধীশ্বর হইবার কামনায় না... শক্তি প্রাণপণে প্রয়াসী—সেই বিষম সময়ে ভা...

...লাভের সেই সন্ধিকালে ভারতবর্ষে কতিপয় উদ্যম-...ল য়ুরোপবাসী ভাগ্য-পরীক্ষা মানসে উপস্থিত হইয়া-...লেন। যে ক্লাইব ভারতে ইংরাজ রাজ্যের ...পয়িতা, সেই ক্লাইবই স্বদেশে বাল্যাবস্থায় সামান্য ...শোদ্ভব বলিয়া গণ্য ছিলেন। ক্লাইবের জীবনী ...ঠে অবগত হওয়া যায়, জীবনভার দুঃসহ বোধে ...ইব তিনবার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ...লেন। তাঁহার অভিভাবক তাঁহার মৃত্যু কামনা করিয়া ...রতবর্ষে প্রেরণ করেন। মরিতে আসিয়া বা সামান্য ...জীবীরূপে দিনাতিপাত করিতে আসিয়া ক্লাইব ...রতবিজয়ী হইয়াছিলেন।

...শুদ্ধ ক্লাইব নহেন, ঐরূপ অনেক মহাপুরুষ সে ...ময়ে ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ভারতের ...ঐশ্বর্য্য-কথা সুদূর ইয়ুরোপখণ্ডে প্রবাদের মত প্রচারিত ...হইয়াছিল। ভারত-কামধেনুকে দোহন করিতে ...পারিলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুধা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ...ইহা ইয়ুরোপবাসীর ধ্রুব ধারণা হইয়াছিল। সেই ...বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কতিপয় ইয়ুরোপবাসী ভারতে উপস্থিত হন। এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে জনৈক ফরাসী বীরের ভারতকীর্ত্তি আলোচনা করিব। ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে কোম্পানীর কার্য্যকলাপ ও কর্ম্মচারীবৃন্দের কথা ভারত-ইতি-হাসে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা ইহাঁদিগেরই কার্য্যাবলীর সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ...যে সকল ইয়ুরোপীয়ান তদানীন্তন দেশীয় রাজন্যবর্গের অধীনে কার্য্য করিয়া সুযশ লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্য কোম্পানীর ভৃত্যদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা তাঁহাদিগের কার্য্যাদির পর্য্যা-লোচনায় বিশেষ তৎপরতা প্রকাশ করেন নাই।

যাঁহারা কেবল স্বদেশী ও স্বজাতি বীরবৃন্দের কাহিনী পাঠ করিতে চাহেন, বিদেশীর কীর্ত্তিকথা অপাঠ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে সুবোধ বলিতে পারি না। কারণ, উহাতে এক-দেশদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা কিছু সদ্‌গুণ, যাহা কিছু উত্তম, তাহা স্বদেশীয়েরই হউক আর বিদেশীয়েরই হউক গ্রহণযোগ্য এবং অবলম্বনীয়। পৃথিবীস্থ যাবতীয় সভ্যদেশের বরেণ্য নরগণের ইতিবৃত্ত পাঠ না করিলে জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ হয় না। যে ভাণ্ডারে যত রত্ন সঞ্চিত হয়, সেই ভাণ্ডারের ততই গৌরব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতে যে সকল শ্বেতাঙ্গ কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী পাঠে বুঝা যায়, কি কারণে, কি প্রকারে ভারত-রাজ্য হিন্দু মুসলমানের অধিকার-বিচ্যুত হইল। আত্মছিদ্র অবগত হইতে না পারিলে কোন জাতিই উন্নততর সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। যাঁহারা আত্মদোষ সংশোধন করিতে ইতস্ততঃ করেন, অন্যের গুণানুকরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে "যে তিমিরে, সেই তিমিরে" থাকিতেই হইবে। আমরা এই প্রবন্ধে যে চরিত্র বর্ণনা করিব, তাহা সম্পূর্ণ ইতিহাস-মূলক, কিংবদন্তী বা উপকথার উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত নহে।

সকলেই জানেন ইংরাজের ভারত-লক্ষ্মী লাভের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফরাসীরা। ভাগ্যদেবী যখন ইংরেজের উপর প্রসন্না হইয়াছিলেন, যখন ভারতের রাজন্যবর্গও ইংরেজ শক্তির করায়ত্ত হইয়াছিলেন, তখন ফরাসীবিক্রম ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করণাশায় মার্কুইস অফ ওয়েলেসলী যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেই উপায় সম্বন্ধে ১৭৯৮ সালে যে যে ডেসপ্যাচ লিখিয়াছিলেন, তাহার স্থানবিশেষ পাঠকের অবগতির নিমিত্ত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

In the present weak state of the Nizam of Haiderabad's Government. the French corps in his service would (in the event of a war between the English and Mysore, which was anticipated) openly join Tipu Sultan, and by a sudden blow endeavour to seize the Nizam's territores, and to secure them with Dominion of France under an alliance offensive and defensive with Tipu Sultan. * * * The interest and the inclination of Sindhia, who entertains a large army in his sevice under the command of a French officer (Perron). would lead him to engage with Tipu Sultan and the French * * *. The junction which might thus be effected between the French officer's with their several corps in the respectiv... service of the Nizam, of Sindhia and... of Tipu might establish the powers of... France upon the ruins of the States of... Poonah and of the Deccan.

ইহার মর্ম্মার্থ—নিজামের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা... সময় তাঁহার অধীন ফরাসীসেনা (ইংরেজ ও মহী... শূরের সহিত সম্ভাবিত যুদ্ধ বাধিলে) টিপু সুলতানে... সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত হইয়া নিজাম রাজ... আক্রমণ করিতে পারে। এরূপে ফরাসীর সহি... টিপুর বহিঃশত্রুকে আক্রমণ ও বহিঃশত্রু হই... সংরক্ষণ উভয় ভাবেই সন্ধি হইবে। * * ... সিন্ধিয়ারও যেরূপ মনোভাব, তাহাতে জনৈক ফরা... সেনানীর (পেরোঁ) নেতৃত্বে তাঁহার যে বিপুল শিক্ষি... বাহিনী আছে, তাহা লইয়া সহজেই ফরাসী ও টিপু... সহিত যোগ দিতে পারেন। এইরূপে নিজাম সিন্ধি... এবং টিপুর অধীন ফরাসী সেনানীবর্গের সেনাদলে... টিপুর সহিত সংযোগে ধ্বংসাবশেষ পুণা ও দাক্ষিণাত্য... সাম্রাজ্যের উপর ফরাসী শক্তি স্থাপিত হইতে পারে।

পাঠক! ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন, ... সময়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের অধীনে ইয়ুরোপীয় ... প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত সৈন্যদল ছিল এবং তা... দিগের প্রাবল্য এরূপ হইয়াছিল যে, ইংরাজকে তজ্জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছিল।

এই সকল সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব, শিক্ষ... কাহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল? কাহাদিগের স... ঐ সকল সৈন্যদলের সৃষ্টি হইয়াছিল? যাঁহা... তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাঁহাদিগের মনে এই প্রশ্ন সহজে... উপস্থিত হইতে পারে। আমরা সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করণাভিপ্রায়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছি। যাঁহাদিগের বুদ্ধিকৌশলে, যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদতায় নিষ্প্রভ দেশীয় রাজন্যবৃন্দ পুনরুজ্জ্বল হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের চেষ্টা ও উদ্যমে ভারতীয় ...ভিন্ন শক্তিনিচয় প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজেরও উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় আলোচনা করা উচিৎ নহে কি? আমরা এতদুদ্দেশ্যে ...তৎসংক্রান্ত ইতিহাসসম্মত বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাশ্চাত্য যুদ্ধ-প্রণালী অনুসারে দেশীয় ভূপতিনিচয়ের অধীনে বহু সৈন্য শিক্ষিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদের নিজামের সাধারণ শিক্ষিত নিয়মিত সৈন্য সংযোগ ব্যতীত শ্বেতাঙ্গ অধিনায়কের অধীনে ১৪ হাজার সৈন্য ও ৩০টী কামান ছিল। টিপুর সৈন্যগণও বড় সামান্য ছিল না! সংখ্যায় উহারা ৭৫ হাজার হইবে। উহার মধ্যে ৫৫০ জন শ্বেতাঙ্গ সেনানায়ক ছিল। সিন্ধিয়া রণক্ষেত্রে ৪০ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য এবং ৩৮০টী কামান উপস্থিত করিতে পারিতেন। বলা বাহুল্য এই সৈন্যদল ফরাসী সেনানায়ক পেরোঁর অধীনে ছিল। পেরোঁর অধীনে তিনশত ইয়ুরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। নিজাম, সিন্ধিয়া ও টিপুর সম্মিলনে যে বিপুল সৈন্যের সমাবেশ হইবার কথা, তাহাতে ইংরেজের হৃদয়ে ভয়োৎপাদন বিস্ময়ের বিষয় নহে। কুট রাজনীতিজ্ঞ মার্কুইস অফ ওয়েলেস্‌লী ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি এই সম্মিলন-আশঙ্কা সমূলে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কালব্যাজ করেন নাই। যদি সে সময়ে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ শাসকের হস্তে ভারতের শাসন-বল্গা না থাকিত, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, ভারতে ইংরেজ অদ্য রাজচক্রবর্ত্তীরূপে বিরাজ করিতে সমর্থ হইতে পারিতেন কিনা! কে বলিতে পারে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা অন্যরূপে লিখিত হইত কি না!

ক্রমশঃ—

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তর চিত্রণ।

(Art of Litho graphy.)

(১৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর।)

প্রস্তরে চিত্র করিবার প্রণালী।

প্রস্তরে একবার চিত্র করিলে তাহা পরিবর্ত্তিত করা সহজসাধ্য নহে। এজন্য চিত্রের রেখাগুলি প্রথম হইতেই বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, প্রস্তরে চিত্রখানি উলটা করিয়া অঙ্কিত করিতে হয় এবং তাহা না করিলে ছাপাচিত্র ঠিক হয় না। যদ্যপি প্রস্তরের উপরে পেন্সিল দ্বারা কোন চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কঠিন পেন্সিল (Hard pencil) ব্যবহার করা আবশ্যক এবং উড পেন্সিল দ্বারা যে সকল রেখা অঙ্কিত করা হইবে, তাহা যেন অতীব সূক্ষ্ম (সরু) হয় এবং চাপ দিয়া অঙ্কিতকরা না হয়। এরূপ না করিয়া কোমল পেন্সিল (soft pencil)

দ্বারা স্থূলরেখা প্রস্তরে টানিলে ঐ রেখা চিত্রের কালি এবং প্রস্তরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কালিকে প্রস্তরে সংলগ্ন হইতে দেয় না এবং ছাপাতে ঐ সকল রেখা উঠে না। এই চিত্রের বিশেষ প্রকরণ নিম্নে বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রথমে চিত্রখানি একখণ্ড ইচ্ছানুরূপ :আকারের কাগজের উপর বিশুদ্ধ ভাবে অঙ্কিত করিবে। পরে একখানি স্বচ্ছ কাগজে (Tracing paper) (চিত্র হইতে কিছু বৃহৎ আকারের) উক্ত চিত্রের উপর স্থাপন করিয়া স্বচ্ছ কাগজের ভিতর দিয়া যেরূপ দৃষ্ট হয় একটী সূক্ষ্ম মুখ কোমল পেন্সিল দ্বারা উক্ত স্বচ্ছ কাগজের উপর চিত্র করিবে। এইরূপ স্বচ্ছ কাগজে চিত্র করার নাম ইংরাজিতে ট্রেস করা (trace) বলে অর্থাৎ উক্ত চিত্রের অনুকরণ বা সদৃশী-করণ। এইরূপ সদৃশীকরণ স্বচ্ছ কাগজের মধ্য-স্থলে করা আবশ্যক এবং ইহার চারি পার্শ্বে কিছু কিছু স্থান বাদ রাখা আবশ্যক

এইরূপে ট্রেসিং কাগজে (Tracing paper) চিত্রকার্য্য সম্পন্ন হইলে এই চিত্র প্রস্তরের উপরে অভীষ্ট স্থানে অঙ্কিত করিতে হইবে। এই কার্য্য অতিশয় সাবধানে করিতে হইবে। অঙ্কিত স্বচ্ছ কাগজ প্রস্তরের উপরে উল্টা করিয়া অভীষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়া ইহার এক পার্শ্বের প্রান্ত গঁদ দ্বারা প্রস্তরে সংলগ্ন করিতে হইবে। এরূপ স্থানে গঁদ মাখাইবে যথায় চিত্রের কোন অংশ না অবস্থান করে। এই স্থানে চিত্র উল্টা করিয়া প্রস্তরে স্থাপন করা একটু বিশদ ভাবে পাঠককে বুঝাইতে হইবে। কারণ উল্টা শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এখানে উল্টা বলিতে স্বচ্ছ কাগজের যে পার্শ্বে পেন্সিল দ্বারা চিত্র করিবে ঐ পার্শ্ব প্রস্তরে স্থাপন করিয়া বিপরীত পার্শ্ব বাহির দিকে স্থাপন করা। কিন্তু চিত্রের নিম্ন নিম্নদেশে এবং উপরিভাগ উচ্চ-দেশে রাখিতে হইবে, কেবল মাত্র বাম পার্শ্ব দক্ষি পার্শ্বে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব বাম পার্শ্বে পরিবর্ত্তিত হইবে। এরূপ না বুঝা হয় যে, চিত্রের নিম্ন উপরে এবং উপ নিম্নে স্থাপন করিতে হইবে।

স্বচ্ছ কাগজ প্রস্তরে সংলগ্ন হইলে আর এ প্রকার পাতলা রং যুক্ত কাগজ (Transfar paper ইহার নিম্নে স্থাপন করিতে হইবে।

স্বচ্ছ কাগজ ও ট্রান্সফার (রংযুক্ত কাগজ কাগজের বিশেষ বর্ণন ও প্রস্তুত প্রণালা এই অধ্যা য়ের শেষে প্রদত্ত হইল।

এই রংযুক্ত কাগজ স্বচ্ছ কাগজের নিম্নে স্থাপ করিবার উদ্দেশ্য—স্বচ্ছ কাগজের চিত্র প্রস্ত স্থানান্তরিত করা। এ কারণ এই রংযুক্ত কাগজে নাম স্থানান্তরিত করিবার কাগজ।

প্রস্তরে চিত্র স্থানান্তরিত করিবার অপর অপ উপায়ও কখন কখন অবলম্বন করা হয়, কিন্তু উপ লিখিত উপায়টী প্রকৃষ্ট বিবেচনায় ইহাই এস্থা অবলম্বন করা হইল।

এইবার স্থানান্তরিত করিবার কাগজ ইহ রংযুক্ত পৃষ্ঠ স্বচ্ছ কাগজের নিম্নে প্রস্তর গাত্রে স্থা করিয়া ঋজুভাবে প্রস্তরের উপরে বিস্তৃত কর। ইহা উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া স্বচ্ছ কাগজ ইহ উপরে বিস্তারিত কর। স্বচ্ছ কাগজ প্রস্তর উপ সংলগ্ন থাকায় ইহার স্থানভ্রষ্ট হইবার সম্ভাব

বে না এবং এই জন্যই ইহাকে প্রস্তরে আটা এক স্থানে নিশ্চল রাখিতে হয়। স্বচ্ছ কাগজ স্থানান্তরিত করিবার কাগজ প্রস্তরে স্থাপন বার সময় উহাদের উপরে হস্তদ্বারা যেন অধিক না দেওয়া হয়, কারণ হস্তচাপ দ্বারা চিত্র নান্তরিত করিবার কালে কাগজের রং প্রস্তরে সংলগ্ন, প্রস্তর ময়লা হয়। প্রস্তর ময়লা হইলে চিত্রের ছাপা ভালরূপ উঠে না। ইহার কারণ পেন্সিল দ্বারা প্রস্তরে চিত্র করিবার সময় বলা হইয়াছে।

এইবার স্বচ্ছ কাগজের চিত্রের রেখা সকলের উপর দিয়া ভোতামুখ সূচের দ্বারা (Blunt etching needle) বা কোন সূক্ষ্মমুখ কাষ্ঠ শলাকা দ্বারা অতি নে রেখা অঙ্কিত কর। এই সময় প্রস্তর উপরিস্থিত স্বচ্ছ ও স্থানান্তরিত করিবার কাগজ-দ্বয়ের যে পার্শ্ব আটা দ্বারা প্রস্তরে সংলগ্ন নহে তাহাকে হস্ত দ্বারা বা কোন ভারি দ্রব্য দ্বারা এরূপ ভাবে স্থির রাখিতে হইবে যাহাতে উক্ত কাগজ-দ্বয়ের কোন অংশ স্থানভ্রষ্ট না হয়। এইরূপে চিত্রের সকল রেখার উপর সূচি পরিচালন দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে, যেন কোন রেখার কোন অংশ বাদ না পড়ে। যদ্যপি কোন রেখা অঙ্কিত না হয়, সাবধানে কাগজের এক পার্শ্ব উঠাইয়া প্রস্তরের যে স্থানে রেখা চিহ্নিত হয় নাই, কাগজ স্থাপনপূর্ব্বক ঐ স্থানের রেখা সকল পুনর্ব্বার নিয়মে অঙ্কিত করিবে। পরে যখন দেখিবে চিত্রের সকল রেখা প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়াছে তখন সাবধানে স্থানান্তরিত করিবার কাগজখানি করিয়া লইবে ও ট্রেসিং কাগজ পূর্ব্ববৎ প্রস্তরে সংলগ্ন রাখিবে। কারণ যদ্যপি প্রস্তরের কোন রেখা মুছিয়া যায় তাহা হইলে পুনর্ব্বার রংযুক্ত কাগজ উহার নিম্নে পূর্ব্ববৎ রাখিয়া উক্ত রেখা অঙ্কিত করিতে পারগ হইবে।

একেবারে প্রস্তরে উল্টা করিয়া যদ্যপি চিত্র করিবার আবশ্যক হয় কিম্বা উপরের নিয়মে চিত্র স্থানান্তরিত করিবার পরে চিত্র বিশুদ্ধ হইতেছে কি না জানিবার জন্য চিত্রযুক্ত কাগজখানি একখানি আর্শির সম্মুখের অধোভাগে ফেলিয়া দেখিতে হইবে।

প্রস্তরে চিত্র স্থাপন করিবার সময় দেখিতে হইবে যে প্রস্তরের চারিপার্শ্বে যেন অন্ততঃ অর্দ্ধ ইঞ্চি স্থান বাদ রাখা হয়। অর্দ্ধ ইঞ্চির অধিক বাদ দিবার সুবিধা থাকিলে তাহাও বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তরের নিম্নে ও উপরে কিছু অধিক স্থান পরিত্যাগ করা আবশ্যক। উক্ত স্থানে চিত্রের নাম প্রভৃতি লিখিবার প্রয়োজন হয়।

প্রস্তরের কোন স্থান যদ্যপি দাগযুক্ত থাকে বা শিরা বা চিড়যুক্ত হয় উক্ত স্থান সকল যথাসাধ্য ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিম্বা চিত্রকে এরূপে স্থাপন করা কর্ত্তব্য যাহাতে উক্ত চিড় বা দাগ দ্বারা চিত্রের কোন অনিষ্ট হইতে না পারে। যখন প্রস্তর অতিশয় দোষ যুক্ত হয় তখন প্রস্তরকে একেবারে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমান চিত্রকরের কর্ত্তব্য।

প্রস্তরে চিত্র চিহ্নিত হইলে কালি (Litho ink) কিম্বা চক্ (Litho cholk) পেন্সিল দ্বারা প্রস্তরে চিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

প্রস্তরে চিত্র প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিবার জন্য এক প্রকার কাগজ সাধারণ চিত্রকরদিগের দ্বারা

ব্যবহৃত হয়। ইহা উত্তম চিত্রকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। চিত্রখানিকে উক্ত কাগজে প্রস্তর চিত্রের কালি দ্বারা অঙ্কিত করিয়া একেবারে প্রস্তর উপরে স্থানান্তরিত করিতে হয়।

শ্রী সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা-রহস্য।

আহারান্তে রামেশ্বর ও মনোরঞ্জন সাহেবের বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন। সাহেব তখন একটী যন্ত্র লইয়া কোনও কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহারা দুইজনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণপরে সাহেব একখণ্ড বরফ, সেই কল হইতে বাহির করিয়া লইলেন। কলটি একটি ছোট বরফের কল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি বল দেখি?

উভয়ের কেহই বরফ দেখে নাই, তথাপি রামেশ্বর বলিলেন "যেন পাথরের মত।"

সাহেব ব'ললেন হাত দিয়া দেখ দেখি?

উভয়ে হাত দিয়া হাত সরাইয়া লইল ব'লিল বড়ই ঠাণ্ডা! যেন শিলাবৃষ্টির শিল।

সাহেব বলিলেন সেও এই রকম বটে। তার পর রামেশ্বরকে বলিলেন রামেশ্বর এই থেকে একটু ভেঙ্গে ফেল দেখি?

রামেশ্বর বলিলেন কি করে ভাঙ্গবো?

সাহেব বলিলেন ঐ বাটালী আর হাতুড়ী দিয়া।

রামেশ্বর একটু ভাঙ্গিলেন, সেটুকু একটা চিনের বাটিতে রাখা হইল। দেখিতে দেখিতে সেটুকু জল হইয়া গেল।

সাহেব বলিলেন "এই যে বড় চাপটি দেখ্‌ছো, ঠিক যেন একটা বড় পাথর। এর নাম বরফ। জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা হলে জমে বরফ হয়। আমাদের দেশ অত্যন্ত ঠাণ্ডা সেই জন্য, সেখানে শীতকালে পুকুর প্রভৃতির জল জমে বরফ হয়ে যায় এদেশেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে শীতকালে জল বরফ হয়। যেখানে বা যে সময়ে বরফ পাওয়া যায় না, সে সময় এই রকম কলে বরফ করা যায়। বরফ যে জলের আর এক অবস্থা তা বোধ হয় বুঝতে পারছ? আচ্ছা বল দেখি রামেশ্বর জল কোন অবস্থায় বরফ হয়?

রামেশ্বর ব'ললেন জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা হলে বরফ হয় তখন তাতে হাত দিতে কষ্ট হয়?

সাহেব বলিলেন কষ্ট কেন হয় মনোরঞ্জন?

মনোরঞ্জন বলিলেন "হাত কন কন করে, তাই কষ্ট হয়।"

সাহেব বলিলেন ঠিক বলেছ, এই দেখ ডিমে যে বরফটুকু রাখা হয়েছিল তা জল হয়ে গেছে এতে হাত দিয়ে দেখ দেখি তেমনি ঠাণ্ডা আছে কি?

মনোরঞ্জন হাত দিয়া বলিলেন না এখন গর হয়েছে। বোধ হয় বরফ গরম হলেই জল হয়?

সাহেব বলিলেন আর জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা হ'লে—

মনোরঞ্জন ব'ললেন "বরফ হয়।"—আচ্ছা দু যদি ঐ রকম ঠাণ্ডা করা যায়, তাহলে জমে যায় কি?

সাহেব ব'ললেন "যায় বই কি?"—"সে আর এক দিন ক'রে দেখাব।"—এখন দেখ আমি যে বরফ তৈয়ার করেছিলাম তা ক্রমে ক্রমে জল হয়ে যাচ্ছে। রামেশ্বর ঐ গামলা খানা আন দেখি ওতে রাখি।

রামেশ্বর গামলা আনিলেন। সাহেব তাহার মধ্যে বরফ রাখিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন। আচ্ছা মনোরঞ্জন বরফ গরম হলেই জল হয় কিন্তু আমরা তো আর বরফ গরম করচি না তবে বরফ জল হয়ে যাচ্ছে কেন? বেশ করে ভেবে দেখ দেখি যদি কারণ বুঝতে পার।" এই বলিয়া সাহেব একটু দূরে গমন পূর্ব্বক একটি ছোট লোহার উনুনে আগুন করিতে লাগিলেন সকলি আয়োজন করা ছিল সুতরাং সহজেই আগুণ হইল। তিনি উনুনটি টেবিলের উপর আনিলেন। আগুনের উত্তাপে বাতাস আরও গরম হইল।

এইবার রামেশ্বর বলিলেন "গরম হাওয়া লেগে বরফের উপর যেমন গরম হচ্ছে অমনি জল হচ্ছে।"

সাহেব ব'ললেন "ঠিক বলেছ।" এই বলিয়া সেই গামলা সমেত বরফ সেই উনুনে বসাইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বরফ জল হইল।

সাহেব ব'ললেন "আচ্ছা, তোমরাও দেখলে জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা হলে বরফ হয় আবার বরফ গরম হলে জল হয়। কিন্তু জল গরম হলে কি হয় জান?

রামেশ্বর বলিলেন "জল ধোঁয়ার মত হয়ে আকাশে উড়ে যায়।"

এমন সময় জল ফুটিয়া বাষ্প উঠিতে লাগিল।

সাহেব বলিলেন "ঐ দেখ আমাদের বরফ গলা জল ধোঁয়ার মত হয়ে উঠচে ও ধোঁয়া নয় ওকে বাষ্প বলে। বাষ্প আকাশে উঠে কি হয়?

রামেশ্বর বলিলেন তা ঠিক বলতে পারিনি বোধ হয় মেঘ হয়।"

সাহেব বলিলেন "এও ঠিক বলেছ" মেঘ হতে আবার বৃষ্টি হয়। এই দেখ এই বাষ্পের উপর এই ডিসখানা ধরিলাম। এতে ঐ বাষ্প জমে কেমন জল হচ্ছে। এই রকম, বাষ্প যখন খুব উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয় তখন আবার জল হয়, সেই জল বৃষ্টি হয়ে মাটীতে পড়ে সুতরাং যেখানকার জল আবার সেই খানেই আসে।" আচ্ছা বল দেখি মনোরঞ্জন আমরা আজ কি শিখিলাম?

মনোরঞ্জন বলিল "বরফ গরম হলে জল হয় জল গরম হলে বাষ্প হয়ে মেঘ হয় মেঘ ঠাণ্ডা হলে জল হয় জল ঠাণ্ডা হলে বরফ হয় আর বরফ ঠাণ্ডা হলে?

সাহেব বলিলেন বরফ যত ঠাণ্ডা হয় ততই বেশী শক্ত হয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

ঐতিহাসিক তকিখাঁ।

চন্দ্রশেখরে অমর বঙ্কিমচন্দ্র তকিখাঁর চরিত্র কৃষ্ণ-বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে বীরচরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "উপন্যাসেও

ঐতিহাসিক চরিত্রের অযথা বিকৃতি মার্জ্জনীয় নহে।” তকিখাঁর চরিত্র প্রকৃতই বীর চরিত্র ছিল। ‘রিটাজ উস্-মালাতিন’ প্রণেতা গোলাম হোসেন তকিখাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, “মহম্মদ তকিখাঁ বহুসংখ্যক সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া গোলার আঘাতে পরলোক গমন করেন।” সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, তকিখাঁ প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রেই অন্তিমশয্যায় শয়ন করেন। বঙ্কিম চন্দ্র কি উদ্দেশ্যে তকিখাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুপত্নীর প্রতি স্পৃহা দোষে দূষিত করিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। সুখের বিষয় শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার যুগান্তকারী মীরকাসিম নাটকে তকিখাঁকে প্রকৃত চিত্রেই চিত্রিত করিয়াছেন। ‘সৈর মুতক্ষরীণ’ প্রণেতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ, তকিখাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা অদ্য ‘মুতক্ষরীন’ হইতে তকিখাঁর বৃত্তান্ত পাঠকগণকে উপহার দিব।

মোহাম্মদ তকিখাঁ পারস্য দেশের অন্তর্গত তাব্রিজ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। মীরকাসিম খাঁ বাঙ্গালার মসনদে আসীন হইয়া প্রথমতঃ রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন এবং তৎপরে সৈন্য বিভাগের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আর্ম্মেনিয়ান গুর্গীণ খাঁকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। গুর্গীণ ব্যতীত আরও কয়েকজনকে অধ্যক্ষ পদে ব্রতী করান। এই শেষোক্ত দিগের মধ্যে তকিখাঁকে শ্রেষ্ঠরত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাসেম আলি খাঁ, তকিখাঁকে বীরভূমের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন এবং একদল কার্য্যদক্ষ সৈন্য গঠনের আদেশ প্রদান করেন। তকিও প্রাণপণে প্রভুর কার্য্যসাধনে তৎপর হয়েন এবং একদল সৈন্য বিশেষ ভাবে গঠন ও শিক্ষাদেন। বস্তুতঃ তকিখাঁ এরূপ প্রভুভক্ত সাহসী বীর ছিলেন যে, ‘মুতক্ষরীণ’ প্রণেতা পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন যে, শেষ যুদ্ধের সময় “কাপড়েওয়ালা” গুর্গীণ খাঁ সেনাপতি না থাকিয়া তকিখাঁ থাকিলে মীর-কাসেম আলিখাঁর সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইত না।

ইংরেজ বণিকদের সহিত তৎকালীন নবাব মীর-কাসেম আলিখাঁর কি কি কারণে যুদ্ধ ঘটে আমি আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। আমাপেক্ষা অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁহাদের গবেষণা-পরিপূর্ণ প্রবন্ধে এবিষয়ের বিচার করিয়াছেন। পলাশীক্ষেত্রে বীরবর তকিখাঁ কি প্রকারে জীবন পরিত্যাগ করেন, আমি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

তখন ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ চলিতে ছিল। মীরকাসেম আলি পূর্ব্বাপর জানিয়াও তকিখাঁকে মুর্শিদাবাদের সহকারী শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মহাম্মদ খাঁর অধীনে পদ প্রদান করেন। তকিখাঁ এ বন্দোবস্তে সুখী হইতে পারেন নাই। সৈয়দ মহাম্মদ খাঁ অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন—পক্ষান্তরে তকিখাঁ উদার ও দয়ালু প্রকৃতির ; সুতরাং উভয়ের মিলন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সৈয়দ মহাম্মদ প্রতিমুহূর্ত্তেই তকিখাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন এবং পদে পদে তকিখাঁর কার্য্যে প্রতিবন্ধক জন্মাইতে ছিলেন। বস্তুতঃ সৈয়দ মহাম্মদের ব্যবহারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে, তকিখাঁ পরাজিত হইলেই তিনি সুখী হন। তকিখাঁর পরাজয়ে কি বিষময় ফল হইবে তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। উভয়েই এক প্রভুর ভৃত্য, একের পতনে যে অপরের [illegible] অবশ্যম্ভাবী, মীরকাসিমের পতনে যে বাঙ্গালার [illegible]গ্য-রবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবে এ কথা নীচ প্রকৃতি সৈয়দ মহাম্মদের অন্তঃকরণে [illegible]রও উদিত হয় নাই।

এই সময়েই তকিখাঁর সাহায্যার্থ মুঙ্গের হইতে [illegible] আসিয়া পৌছিল। সৈয়দ মহাম্মদ এই নূতন [illegible]লের ও তাহাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণের হৃদয়েও বিদ্বেষ-[illegible] প্রজ্বলিত করিতে বিন্দু মাত্রও দ্বিধা বোধ [illegible]লেন না। তকি খাঁ যাহাতে পরাজিত হইয়া [illegible] পান এইরূপ পরামর্শ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। ফল অত্যন্ত বিষময় হইয়া উঠিল। মুঙ্গের [illegible]তে প্রেরিত সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের সৈন্য সহ [illegible]রথীর অপর পারে সৈন্য সমাবেশ করিয়া [illegible]লেন। পরদিন সংবাদ আসিল যে ইংরাজদের [illegible] দল তেলিঙ্গা সৈন্য কোন স্থান হইতে অগ্রসর [illegible]তেছে। এই সংবাদ মুঙ্গের প্রেরিত সৈন্যাধ্যক্ষগণ তেলিঙ্গা সৈন্যকে আক্রমণে ইচ্ছুক হইয়া তকিখাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহাম্মদ তকি [illegible] সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। মুঙ্গের হইতে প্রেরিত সৈন্যগণ তাঁহারই সাহায্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই অধীনে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিল। [illegible] মুর্শিদাবাদের অকর্ম্মণ্য নীচ সহকারী অধ্যক্ষের [illegible]ণায় ও প্ররোচনায়, এই সমস্ত সৈন্যেরা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে নাই। তথাপি একই [illegible] কার্য্য বলিয়া তকি খাঁ নিজের সৈন্য হইতে [illegible] বন্দুকধারী সুশিক্ষিত সৈন্য সাহায্যার্থ প্রেরণ [illegible]তে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিলেন না। এই [illegible] ধারী সৈন্যগণ মহাম্মদ তকির শিক্ষায় বিশেষ [illegible]র্শিতা লাভ করিয়াছিল। তকিখাঁ ইহাদের [illegible]পীয় প্রথামত শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং কার্য্যে [illegible] তৎপর করিবার জন্য তিনি এই সমস্ত সৈন্যদের তল্পি তল্পা বলদ এবং উট ইত্যাদি দ্বারা বহন করাইতেন। সৈন্যদের নিকট কেবল মাত্র তাহাদের যুদ্ধোপকরণ বন্দুক ও আবশ্যকীয় গোলা বারুদ মাত্র থাকিত। এই ৫০০ বন্দুক ধারী সৈন্যের সাহায্য পাইয়া মুঙ্গের প্রেরিত অধ্যক্ষগণ আশাতীত উপকার বোধ করিলেন এবং তেলিঙ্গাগণকে আক্রমণ করিলেন।

তেলিঙ্গাদলের সহিৎ একটী মাত্র কামান ছিল। লেফটেনাণ্ট গ্লেন নামক এক অসম সাহসিক ইংরেজ এই ক্ষুদ্র বাহিনী পরিচালিত করিতেছিলেন। এক-লক্ষ মুদ্রাও ইহাদের সঙ্গে ছিল। মুসলমান সৈন্য তিনবার এই কামান ও টাকা অধিকার করে কিন্তু লেফটেনাণ্ট গ্লেন তিন বারই বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া টাকা ও কামান পুনরুদ্ধার করেন। যাহাহউক, এই প্রকার যুদ্ধ করিতে করিতে মুসলমান সৈন্য তেলিঙ্গাদিগকে হটাইয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে যে স্থান হইতে তেলিঙ্গারা সেদিন প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল, সেই নগরে লইয়া গেল। অনতিবিলম্বে মুসলমান সৈন্য এই নগর অবরোধ করিল।

রাত্রিতে বর্দ্ধমান হইতে আর একদল সৈন্য আসিয়া এই পরাজিত অবরুদ্ধ সৈন্যের সহিৎ যোগদান করিল এবং তৎপরদিবস অবরুদ্ধ ও অপরাধকারীদিগের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মুঙ্গের হইতে প্রেরিত সেবায়াতুল্লা এবং তাঁহার অন্যান্য সহকারিগণ ভালি বুঝিতে পারিলেন যে তকিখাঁর অনুরোধে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা ভাল করেন নাই। একত্র হইয়া যুদ্ধ করাই যে অত্যন্ত সমীচীন ছিল, তাহা তখন বোধ হইতে লাগিল। ইংরাজদিগের ভয়াবহ গুলির আগুণে তকিখাঁর প্রেরিত সৈন্য মাত্রই অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়া শেষশয্যা অধিকার করিলে সেবায়াতুল্লা হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন এবং তকিখাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন।

পাছে এই পলায়িত সৈন্যগণের কু-দৃষ্টান্তে নিজের সৈন্যরাও কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিস্মৃত হয়, এই ভয়ে তকিখাঁ

ঐ সমস্ত সৈন্যদের নিজের শিবিরে আশ্রয় দিলেন না কিম্বা সৈন্যাবাসের মধ্য দিয়াও উহাদের যাতায়াত করিতে দিলেন না। ফলে, উভয় পক্ষে ঈর্ষানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে ইংরেজ সৈন্য একত্র হইল। ১১৭৭ হিজিরার এবং মহরম মাসের ৫ই তারিখে তকিথাঁ এই সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুঃখের বিষয় তিনি সেবায়াতুল্লার সাহায্য চাহিলেন না এবং চাহিলেও পাইতেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, তকিথাঁর সাহায্য প্রর্থনা করা উচিৎ ছিল। তিনিও করিলেন না, সেবায়াতুল্লা ও অন্যান্য অবাধ্য সেনানীগণও তাঁহাদের প্রভুর কার্য্য মনে করিয়া স্বেচ্ছায় তকিথাঁর সহিৎ যোগ দিলেন না।

যুদ্ধের প্রারম্ভে তকিথাঁ উৎসাহ বাক্যে তাঁহার সৈন্যদের প্ররোচিত করিলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল কিন্তু উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের উৎসাহে তকির সৈন্যগণ এরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল যে ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যে বেশ একটু বিশৃঙ্খলা দেখা গেল। ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ না হইলে যুদ্ধের ফল কি হইত বলা যায় না। কিন্তু ঠিক এই সময়েই একটী গোলা আসিয়া তকিথাঁর পায়ে আঘাত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অশ্বও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পরক্ষণেই তকিথাঁ অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। তকিথাঁ এই সময় ইংবাজ সৈন্যের ব্যূহের অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজ সৈন্য বন্দুক ছাড়িতে ছাড়িতে অগ্রসর হইতে লাগিল কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই এক সর্ব্বনাশী গুলি আসিয়া বীরের স্কন্ধদেশে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। আহত হইবামাত্র তিনি "ইয়া আল্যা! ইয়া আল্যা" বলিয়া উঠেন। তাঁহার দেওয়ান আসাআলী তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। "ফিরিয়া কি করিয়া মীরকাসিমকে এই মুখ দেখাইব? তাহা কথনও হইবে না" এই বলিয়া তিনি, অন্যের ভয় নিবারণের জন্য তাঁহার বস্ত্রের ... পার্শ্ব স্কন্ধোপরি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হই... লাগিলেন। ইংবাজ সৈন্য পশ্চাৎপদ হইবার ল... দেথাইতে হাগিল কিন্তু এই সময়ে ছোট নদীর ... লুক্কায়িত ইংবাজ সৈন্য হঠাৎ একসঙ্গে গুলি... করিল। এই আকস্মিক গুলিবৃষ্টিতে তাঁহার অ... সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল এবং তিনি নিজেও পুন... কপালে আহত হইয়া 'ইয়া আল্যা' বলিয়া প... গেলেন। 'যদি অন্য সকলে আমার আদেশ প্র... পালন করিত'—এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া বী... বীরকার্য্য অবসান হইল। তাঁহার সৈন্যেরা নায়ক... হইয়া শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কোম্পা... জয়লাভ হইল।

মুর্শিদাবাদ অধিকার, কি মুঙ্গেরের নৃসংস হ... কাণ্ড বা উদয়নালার যুদ্ধের সহিত এ ক্ষুদ্র প্রব... কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং আমরা এথানেই পা... গণের নিকট বিদায় লইলাম।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার, বি...
এফ্, আর্, হিষ্ট্, এস, (লণ্ড...

সূচী।

বিষয়।	লেখক।	পত্র
কাশীধাম।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	
অঞ্জলি।	শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।	
প্রকৃতি বা মায়া।	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।	
ভাস্কর্য্য।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	
ইতিহাসের এক অধ্যায়।	শ্রীঅনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	
প্রস্তর চিত্রণ।	শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।	
শিক্ষা-রহস্য।	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।	
ঐতিহাসিক তকিথাঁ।	শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।	

শিল্প ও সাহিত্য।

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

[illegible]ম খণ্ড { সন ১৩১৬—অগ্রহায়ণ। { ৩য় সংখ্যা

বর্ণ চিত্রণ।

(১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

নিত্য প্রকৃতির এই সকল রাগরঙ্গের সহিত পরিচিত হইতে হইতে শিল্পী ক্রমে ইহার যথার্থ সৌন্দর্য্যবোধক দৃশ্যাবলী অনুভব করিতে পারিবেন। প্রকৃতির অসীম ও অনন্ত ভাণ্ডারমধ্যে তাহার কত [illegible]-রাজিই যে সঞ্চিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ; যুগ-যুগান্তর ধরিয়া দেখিলেও নিত্য নূতন ভাবই পরিলক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে [illegible] বুঝাইয়া বলিবার কিছুই নাই। তবে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি শিল্পীর সাধারণ [illegible] দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যাহাতে তাহাদের কার্য্য [illegible]য়ার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, তাহাই বলিব।

আমরা আকাশ-পথে নানা বৈচিত্র্যময় মেঘমালায় সহসা অত্যন্ত উজ্জ্বল লোহিত বা পীতবর্ণের সমাবেশ দেখিলে আনন্দে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি, কৌতূহল পরবশ হইয়া অন্যকে তাহা দেখাইয়া থাকি, আবার সেই গভীর ঘন মেঘ-খণ্ডের অসমান সীমা-রেখার পার্শ্ব দিয়া যখন অস্তগামী আদিত্যের সেই অন্তিম রশ্মিটুকু সুবর্ণ-কিরীটসম প্রভা বিস্তার করিয়া আকাশমার্গ উদ্ভাসিত করিয়া তুলে—সহসা দুই একটি রশ্মিরেখা সেই মেঘমালার পার্শ্ব দিয়াই যখন ইতস্ততঃ তীরের ন্যায় ছুটিতে থাকে, তখন তাহার সেই মনোমুগ্ধকর বিদ্যুৎ-প্রভা সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হই! কিন্তু কেন এরূপ বিমুগ্ধ হই—তাহা কে বলিবে ?

প্রকৃতির উর্দ্ধ ও নিম্ন সকল অঙ্গেই যখন এইরূপ নানা ভাবে নানা খেলা করে, তখন কোনটী ফেলিয়া

কোনটী চিত্রগত করি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। শিল্পীর এ বিভ্রম সহজেই উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু সতত স্মরণরাখা আবশ্যক যে, পুরাচিত্র অঙ্কনকালে তাহার পাত্রসমাবেশ বা (Composition) নামক পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে তাহার নায়ক না'য়কা অর্থাৎ প্রধান মূর্ত্তিটির প্রতি যেমন বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়, নিসর্গ-চিত্রমধ্যেও সেইরূপ যথন যে বিষয়টি চিত্রের প্রতিপাদ্য, সেই অংশটীকেই তথন ভাল করিয়া চিত্রিত করিতে হয়; অর্থাৎ যথন সমতল ক্ষেত্রের কোন বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইবার ইচ্ছা, তথন সেইটীই সমগ্র চিত্রের মধ্যে প্রধান বা নায়কাংশ বিবেচনায় সম্পন্ন করিতে হইবে, আবার যথন মেঘমালা-পরিশোভিত আকাশ-পথই প্রধান দৃশ্য-রূপে দেখাইবার ইচ্ছা হইবে, তথন সেই অংশ অন্য সকল হইতে বিশিষ্ট ভাবে দেখাইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং চিত্রক্ষেত্রস্থিত আকাশাংশের চিত্রণকালে মেঘাকাশের সকল প্রকার সৌন্দর্য্যই যে নানা রঙ্গে চিত্রিত করিতে হইবে, তাহা নহে—তাহা হইলে আদৌ ভালই দেখাইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে হয়ত বর্ষার সন্ধ্যা-সমাগমে ঘোর ঘনঘটা-পূর্ণ মেঘাড়ম্বরের এক পার্শ্বে একটী বিদ্যুৎ-রেখা বিকশিত হইয়াছে, সেই আলোকেই তামসাবৃত সমগ্র বিশ্ব যেন সহসা চমকিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে, অথবা পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-পুলকিত নির্ম্মল শান্ত শারদাকাশে কোথা হইতে কয়েক খণ্ড অশান্ত স্বচ্ছ বা অর্দ্ধ-স্বচ্ছ মেঘ বিক্ষিপ্ত ভাবে ইতস্ততঃ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে শারদশশী আংশিক আবৃত, নিম্নে মন্দীভূত কিরণস্পর্শে প্রকৃতিপুঞ্জও [illegible] অপেক্ষাকৃত মলিনাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল [illegible] রক্ষা করিয়াই আকাশ-চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে।

আকাশাংশের বিশেষ চিত্র অঙ্কিত করিতে হই[illegible] প্রাবৃটের আকাশই প্রশস্ত। ঝড় বৃষ্টি কুজ্ঝটিক[illegible] পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে, যথন প্রকৃতিদেবী ভী[illegible] প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছেন বা তাঁ[illegible] সেই প্রচণ্ডতার অবসান হইয়াছে, অথবা হিম-[illegible] সুলভ হিমানীমণ্ডিত প্রাতঃকাল বা তুষারাচ্ছন্ন সন্ধ্[illegible] সমাগম শিল্পীর নিতান্তই আদরের আদর্শ। যেস্[illegible] নানা বর্ণোদ্ভাসিত উজ্জ্বল মেঘাকাশ চিত্রিত হই[illegible] তাহার নিম্নে সিন্ধু বা সরোবরের সচ্ছ সলিলও চি[illegible] হওয়া একান্ত আবশ্যক—তাহা হইলে আকাশের [illegible] তীব্র বর্ণ-জ্যোতিঃ সলিলগর্ভে প্রতিফলিত হইয়া আক[illegible] ও সমতলের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইবে, এবং [illegible] আকাশস্থিত উজ্জ্বল আলোকাংশের সম্মুখে কে[illegible] গভীর কৃষ্ণ মেঘ, পর্ব্বতমালা অথবা পত্র-পল্ল[illegible] ঘনাবিষ্ট বিশাল তরুরাজি রক্ষা করিতে হইবে, তাহা[illegible] সেই আলোকাংশের সুতীব্র পার্থক্য অনুভূত হই[illegible] মোটের উপর মেঘাকাশের মধ্যে কথনই কে[illegible] তীব্রতার ভাব (Stiffness) যেন না আসিয়া পড়ে[illegible] শিল্পীমাত্রেরই তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

এইরূপ দূরের, বহু দূরের মুক্ত বা তুষারমণ্ডি[illegible] তুঙ্গশৃঙ্গ, যাহা আকাশের কোলে মেঘের মত [illegible] মিলাইয়া যাইতেছে, তাহা কথন উজ্জ্বল, কথন বা [illegible] বলিয়া প্রতীত হয়, চিত্রে তাহা অতি ধীর-বিবেচ[illegible] সহকারে অঙ্কিত করিতে হইবে। যথন আকা[illegible] প্রাবৃটের ঘন মেঘে সমাবৃত, তথন সেই সুদূরব[illegible]

পর্ব্বতশ্রেণীও অস্পষ্ট ও কালিমাময়, কিন্তু মেঘমুক্ত [illegible] আকাশতলে অচলমালা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়াই চিত্রিত করিতে হইবে। ফলতঃ দূরবর্ত্তী পর্ব্বত আকাশের অনুরূপেই চিত্রিত হইবে। কখন কখন পর্ব্বত ও আকাশের এতই সম্মিলন ঘটে যে, উভয়ের পার্থক্য অনুভূতই হয় না। বিশেষ হিমগিরিসম সমুচ্চ পর্ব্বতের সম্মুখে ও মধ্যে যথন বিক্ষিপ্ত মেঘরাশি আসিয়া পড়ে, তথন তাহার এতই সমতা পরিলক্ষিত হয় যে, দর্শক তাহার কোন্ অংশটী পর্ব্বত আর কোন্ অংশটী যে মেঘ তাহা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, আবার মেঘাপসারত আলোক-বিভায় অভ্রচূর্ণ-চর্চ্চিতবৎ তুষার-শোভিত তুঙ্গশৃঙ্গও সামান্য নয়নানন্দকর হয় না। শিল্পামোদিগণের পক্ষে ঐ সকল দৃশ্য স্বাভাবিকই অত্যন্ত আদরের বস্তু। প্রতীচ্য-শিল্পীর পারিভাষিক শব্দে শৈলমালার এই অবস্থাকে (Off-skips) বলে। চিত্রে এইগুলি বিন্যস্ত করিতে হইলে, দূরের, ক্রমে বহুদূরের সামগ্রীগুলি ক্রমশঃ নীলাভায় পরি-বর্ত্তিত করিয়া রঞ্জিত করিতে হইবে। কারণ, সকল বর্ণই লীয়মান্‌রেখার যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, আমাদিগের নয়নপটে তাহা ততই নীলবর্ণাভায় প্রতিফলিত হয়। ইতিপূর্ব্বেও সে কথা বলা হইয়াছে। শিক্ষার্থীর এ সকল কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং Offskips হইতে নিকটের দৃশ্যগুলি ক্রমে স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত করিতে হইবে। এই 'অফ্‌স্কিপ্‌স্' ও অন্যান্য পদার্থগুলির সীমারেখাসমূহ আকাশের সহিত বা পরস্পরের মধ্যে যেন সামান্য 'মেলা-মেলা' ভাবে চিত্রিত করা হয়; যে কোনও এক রংএর কাগজ কাঁচি দিয়া কাটিয়া অন্য রংএর কাগজ বা কাপড়ের উপর আটা দিয়া বসাইয়া দিলে তাহাদের সীমারেখা যেমন তীব্র বা 'সার্প্‌' বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে সেরূপ যেন কথনও না হয়।

এতদ্ব্যতীত পর্ব্বতের পাদমূলস্থিত বায়ুস্তর সাধা-রণতঃ বাস্পসিক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত আলোকময় দেখায়, সেই কারণ অনেক সময় পর্ব্বতের চূড়ার বর্ণ হইতে উহার নিম্নের বর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্ট হয় এবং এই হেতুই সময় সময় সূর্য্যালোকের অল্পতা হইলে সমস্ত পর্ব্বতমালাই প্রায় সমবর্ণে প্রতীয়মান হয় ও উহাদের সীমারেখাগুলি 'অন্‌সার্প' বা অস্পষ্ট অনুভূত হয়। আবার সময়ে উদীয়মান বা অস্তগামী সূর্য্যের ক্ষীণ অথচ তীব্র রশ্মিসমূহ, দৃশ্যের যে কোন পার্শ্ব হইতে আসিয়া 'অফ্‌স্কিপ্‌স্' বা দূরস্থিত পর্ব্বতচূড়ায় পতিত হয়, তথন উহাদের ও নিকটস্থিত অন্যান্য বস্তুরও সীমারেখাগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করিয়া চিত্রিত করিতে হইবে।

সম্মুখের সামগ্রীনিচয় হইতে ক্রমে দূরবর্ত্তী দ্রব্যসমূহের আকার; স্বভাবতঃ যেরূপ ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র এবং ক্রমে উহাদের বর্ণ যেরূপ হীন ভাবে অনুভূত হয়, আকস্মিক আলোকপাতন (The accident) সময়েও সে সকলে নিয়মের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না, ইহা শিল্পশিক্ষার্থীর যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। নিসর্গচিত্রের মধ্যে সুকৌশলে এই আক-স্মিক আলোকপাতন দ্বারা প্রকৃতই এক অদ্ভুত ভাবের বিকাশ করিতে পারা যায়।

নিসর্গচিত্র-নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে প্রথম 'আক-স্মিক আলোকপাতন' (Accidents,) দ্বিতীয় 'আকাশ

ও মেঘমালা' (Sky & Clouds) এবং তৃতীয় (Off-skips) 'দূরস্থিত অস্পষ্ট পর্ব্বতচূড়া' চিত্রণ-বিষয়ে এক প্রকার বলা হইল, এক্ষণে এতদ্‌বিষয়ে অন্য যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাতেও শিক্ষার্থীদিগের পূর্ব্বানুরূপ মনোযোগ রাখা আবশ্যক।

পাহাড় (Rocks),—নিসর্গচিত্র-মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত 'অফ্‌স্কিপ্‌স্‌' বা দূরবর্ত্তী বিশাল অচলশ্রেণীর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল ও শিলাখণ্ডগুলির চিত্রণ ইহার চতুর্থ কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাদের আকার, গঠন ও বর্ণাবলীর মধ্যে সর্ব্বদা এতই বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় যে, তাহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত বর্ণনা দ্বারা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করান এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং শিল্পীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কখন এই শৈলাংশ নদীপার্শ্বে যেন শিশুর ন্যায় ক্রীড়াচ্ছলে নিজ পাদমূল জলে নিমজ্জিত করিয়া স্থিরভাবে সেই সলিল-দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখিতেছে—এই ভাবে কোথাও তাহার অঙ্গ সম্মুখের দিকে এমনই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যেন এখনই বুঝি পড়িয়া ডুবিয়া মরিবে, আবার কোথাও বা পিছনের দিকে একের পর একের অঙ্গ ঠেস দিয়া অলস ভাবে যেন সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কোনও স্থলে শিলাংশগুলি খণ্ড খণ্ডরূপে মূল অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, যেন বোধ হইতেছে সমরান্তে বা শ্মশানপ্রান্তে খণ্ড বিখণ্ড দেহ-মুণ্ড ও ছিন্ন-ভিন্ন অস্থি-কঙ্কাল চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাদের উপর জল বায়ুর কত ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। সেই নিষ্ঠুর তাড়না সহ্য করিতে করিতে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, স্তরে স্তরে বাঁধন খুলিয়া যাইতেছে, নানা বৃক্ষ লতাগুল্ম, কৃমি কীট ও পতঙ্গ সেই দীর্ণ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া তথায় চিরস্থায়ী আবাসস্থল করিয়া লইতেছে, আবার কোথাও বা ইষ্টকসম ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, ক্রমে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বালু-কণারূপে তাহারা মৃত্তিকায় অঙ্গ পুষ্ট করিতেছে।

শৈলাংশের বা শিলখণ্ডগুলির এই সকল নিরালম্ব দৃশ্য স্বভাবতঃই যেন অতিশয় ম্লান, নির্জীব ও নির্জ্জনতাব্যঞ্জক, কিন্তু তৃণ গুল্মাদির সহিত সম্মিলিত হইলেই তাহাতে যেন অনেকটা সজনতা ও সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পায়; আবার যখন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্রোতস্বিনী অথবা জলপ্রপাতে প্রতিহত ও অসংখ্য বীচিমালার মৃদু ও তীব্র তাড়ণাসহ তাহারা স্নাত, প্রতিহত ও বিধৌত হইতে থাকে, তখন প্রকৃতই অত্যন্ত নয়ন-মন-তৃপ্তিকর ক্রীড়াকুশল শিশুর ন্যায় তাহারা জীবন্ত বলিয়াই প্রতীত হয়। চিত্রের সময় ও অবস্থা বুঝিয়া শিল্পী যেখানে যেমনটী আবশ্যক তেমনটী করিয়া এই সকল শৈলাংশ বা শিলাখণ্ডগুলি চিত্রিত করিবে।

নিসর্গচিত্র-মধ্যে যথায় শৈলাদির আদৌ সমাবেশ নাই, অথবা শিলাসংখ্যা বিরল, তথায় চিত্রের তলরেখা হইতে স্থানে স্থানে দূর্ব্বা, তৃণ ও গুল্মাদির বিচিত্র হরিদ্বর্ণে চিত্রক্ষেত্র পরিশোভিত হইয়া থাকে। প্রতীচ্য শিল্পীর ভাষায় চিত্রের এই কার্য্যকে (Verdure or Turfing) ভারডিওর বা টার্ফিং বলে। সুবিজ্ঞ শিল্পীর রুচি ও কলা-কৌশল-ফলে কখন কখন ইহার এমনই সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয়, যেন প্রকৃতির নিজ কর-রচিত একখানি সুন্দর সবুজ বর্ণের গালিচা

[illegible] মধ্যে অনুকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। [illegible] বর্ণ ও গঠন প্রায় একরূপ দেখিতে পাওয়া [illegible]না, ঋতু ও মৃত্তিকার বর্ণ ভেদে ইহার বিবিধরূপ [illegible]র্ত্তন হইয়া থাকে। শিল্পী নিজ অভিরুচি ও [illegible]ত্রের প্রতিপাদ্য কাল-বোধক দৃশ্য বিবেচনা করিয়া [illegible] বর্ণের সংমিশ্রণে অতি সুকৌশলে কখন কৃষ্ণাভ, [illegible] পীতাভ, কখন নীলাভ ও কখন বা লোহিতাভা-[illegible] বহুবিধ সবুজবর্ণের বিলেপন দ্বারা চিত্রিত করিয়া [illegible]কেন। শিল্পিগুরু মহাত্মা রুবেন্সের 'ম্যাকলিন চিত্র' (View of Machlin) এই বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

'চিত্রের ভূমি' (Grounds or Lands) নিসর্গ-চিত্রে আর একটী পারিভাষিক শব্দ। এই ভূমির অর্থ [illegible]ক বন ও প্রস্তরাদি পরিশূন্য স্থান বিশেষ। চিত্রের মধ্যে ইহারই প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সামান্য ভূমিখণ্ডই দৃশ্যের দূরত্ব [illegible]পকে প্রধান অবলম্বন। এই ভূমি বা ক্ষেত্রের উপরিস্থিত ছায়ালোকে, বর্ণের পার্থক্য ও ইতস্ততঃ [illegible] সামগ্রীনিচয়ের বিচিত্র সমাবেশেই সেই দূরত্ব-ব্যঞ্জক প্রাকৃতিক অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে।

ভূমির যে অংশটী উহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও একেবারেই নগ্ন বা কদাচ তাহার কোনও স্থানে [illegible] সামান্য তৃণ গুল্মাদিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, [illegible]কেই শিল্পিগণ চিত্রের 'উচ্চ সম্মুখভূমি' বা (Terraces) 'টেরাসেস' বলেন। ইহা চিত্রক্ষেত্রের [illegible]খেই সাধারণতঃ চিত্রিত করিতে হয়। সুবিজ্ঞ [illegible] আবশ্যক ও উপযুক্ত বিবেচনায় চিত্রের [illegible] যথাযথ স্থানে ইহার বিন্যাস করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে কোথাও দুই একটী শিলাখণ্ড কোথাও বা চারিটী তৃণগুচ্ছ অঙ্কিত করিয়া তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়া থাকেন।

'অট্টালিকা' (Buildings)—ইষ্টক বা প্রস্তরাদি নির্ম্মিত যে কোনও গৃহ, মন্দির, প্রাচীর ও প্রাসাদ-চিত্র শিল্পে এই 'অট্টালিকা' শব্দের অন্তর্গত। পল্লীবাসীর অতি সামান্য গৃহ বা কুটীর ঠিক ইহার অন্তর্গত নহে, তাহা পল্লী চিত্রেরই উপাদান ও ভূষণ-স্বরূপ জানিতে হইবে। যাহা কিছু সুন্দর স্থাপত্য-শিল্প সম্ভূত তাহাই 'অট্টালিকা' পদবাচ্য হইয়া বীর-রসাত্মক নিসর্গ-চিত্রের উপাদানান্তর্গত হইবে। বিশেষ যখন কোনও প্রাচীন মন্দির, বিমান বা সৌধরাজি প্রাচীন স্থাপত্যের আদর্শরূপে বিরাজিত, যাহার কোন কোনও অংশ ধ্বংসোন্মুখ বা একেবারেই ধ্বংস হইয়াছে, যাহা দেখিলে দর্শকের হৃদয়ে সত্যই কত অতীত স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে:—কোন্ ঐশ্বর্য্যশালী পরদুঃখকাতর শিল্পানুরাগী মহাত্মা কত অর্থব্যয় করিয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করাইয়া ছিলেন, কত দাস দাসী দীন দরিদ্র, কত অন্ধ খঞ্জ আতুর অভ্যাগত এই প্রাসাদপাদে বা মন্দিরদ্বারে পালিত ও প্রণত হইয়াছে, কত মহাত্মা সাধু সজ্জন, কত সীতা ও সাবিত্রীসমা সাধ্বী পুরলক্ষ্মীগণ কতদিন ধরিয়া ইহার পবিত্র শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন, কতদিন ইহার গৃহ-প্রাঙ্গন সর্ব্বত্রই সূর্য্যালোকসম সমুজ্জ্বল দীপমালায় সর্ব্বদা সুশোভিত ও দীপ্তিশালী থাকিত, অশ্বের হ্রেষা, গাভীর হাম্বারব ও মানবের কলকণ্ঠে সতত‌ই ইহার চারিধার মুখরিত থাকিত, হায়! আজ কালের প্রহারে তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে,

আজ এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় প্রদীপটীমাত্র দিতেও এক ব্যক্তিকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল বন্য পশু পক্ষীর চিরস্থায়ী আবাসস্থল রূপে ইহা এক্ষণে পরিণত হইয়াছে; এইরূপ নানা অতীত স্মৃতির উদ্বোধক ধ্বংসোন্মুখ জীর্ণ গৃহ ও অট্টালিকাই বীর রসাত্মক চিত্রে শিল্পীর অতি আদরের উপাদান ও উদ্ভাবনার সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

নিসর্গ চিত্রের মধ্যে 'জল' (Water) সর্ব্ব প্রধান সজীবতা প্রদায়ক। এই জল চিত্রমধ্যে নানা ভাবে সন্নিবেশিত করিতে হয়, পূর্ব্বে বীর-রসাত্মক বিরাট ও সংকীর্ণ পল্লী-চিত্র মধ্যে তাহার কিয়ৎ পরিমাণ আভাষ দিয়াছি, পাঠক ও শিক্ষার্থিগণ নিশ্চয়ই তাহা হইতে ইহার মর্ম্ম অনেকাংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তথাপি এ স্থলে আরও বিশেষ ভাবে দুই একটী কথা বলিতেছি। নদ নদী প্রস্রবণ, সাগর সরিৎ সরোবর এবং খাল বিল ও পুষ্করিণী প্রভৃতির বিভিন্ন জল চিত্রে অনুকরণ করিবার আবশ্যক হয়। সেই জল কখন মৃদু-মন্দ পবন হিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গে আন্দোলিত, তীরভূমির প্রতিচ্ছায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা ভঙ্গে যেন তাহা নর্ত্তিত, কখন বা সম্পূর্ণ বায়ু-তাড়নাবিহীন ধীর স্থির স্বচ্ছ দর্পণ-সদৃশ, সকল পদার্থের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব সেই নির্ম্মল সলিল-দর্পণে প্রতিভাত হইয়া জল ও স্থলের কি যেন এক অপূর্ব্ব সমতা আনয়ন করিয়াছে, তখন তাহাদের পার্থক্য আদৌ অনুভূতই হয় না, আবার কখন শৈবালাদিসহ ঘনাবিষ্ট ও বিবিধ জলজ লতা-পত্র-পুষ্পে এমনই তাহা সমাচ্ছাদিত যে, তাহাতে প্রকৃতি-সঞ্জাত হরিদ্‌গর্ভ গালিচার বিচিত্র কারু কার্য্য বলিয়া মনে হয়, আবার তাহারই স্থানে স্থানে বা[illegible] সঞ্চালিত হইয়া বিমুক্ত সলিলান্তর হইতে আকা[illegible] ও উদ্ভিদাদির প্রতিবিম্ব, গবাক্ষান্তরালাস্থিতা কু[illegible] বধূর ন্যায় যেন অতি সংগোপনে সেই উন্মু[illegible] আকাশ-প্রাঙ্গনের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। জলের [illegible] সকল ধীর স্নিগ্ধ নির্ম্মল ভাব প্রাবৃটের বাত্যালোড়ি[illegible] সেই ভীষণ উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমল ও উদ্দাম জ[illegible] রাশি অপেক্ষা অধিকতর সজীবতা প্রদায়ক।

যাহা হউক, নিসর্গ চিত্রান্তর্গত সকল দৃশ্যমধ্যে [illegible] জল স্বাভাবিক বা সুবিধাজনক নহে, তবে তাহা[illegible] সমাবেশ দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভালই বোধ হ[illegible] শিল্পী চিত্রের অবস্থা ও আবশ্যক বোধে তাহা[illegible] যথাসম্ভব সমাবেশ করিবেন। কিন্তু যে শিল্পী জ[illegible] প্রতিবিম্বিত ছায়াচিত্রের চিত্রণ-ব্যাপারে বি[illegible] অভিজ্ঞ নহেন, তিনি কেবলমাত্র অত্যন্ত স্বাভাবি[illegible] জল চিত্রিত করিলেও চিত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য্য র[illegible] করিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র অভ্যাস দ্বা[illegible] জলের স্বাভাবিক ভাবচিত্রণ কিয়ৎ পরিমাণে আ[illegible] হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবিম্ব-তত্ত্বে শিল্পীর অভিজ্ঞ[illegible] না থাকিলে তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। এ[illegible] সকল বিষয় পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের (Perspectiv[illegible] অন্তর্গত। সুতরাং তাহা ভাল করিয়া জা[illegible] আবশ্যক। অধিকাংশ চিত্রকর কোনরূপ [illegible] অভ্যাস দ্বারা জল চিত্রিত করেন কিন্তু সম্পূর্ণ স্বা[illegible]বিক করিতে পারেন না, সে কেবল পরিপ্রেক্ষি[illegible] বিজ্ঞান শিক্ষায় অবহেলার ফল। এ দেশে সে[illegible] বিচক্ষণ শিল্প-সমালোচকের এখনও আবির্ভাব হয় না[illegible] কারণ সকল চিত্রই চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কালে [illegible] তাহাদের নামও কেহ মুখে আনিবেন না সে বিষয় [illegible]শ্চিত। জলের প্রতিবিম্বতত্ত্ব বাস্তবিক সেরূপ কঠিন [illegible] নহে, ইচ্ছা করিলে কতক কতক চিত্রিত করিতে [illegible] যায়, সেই কারণেই সামান্য মাত্র পরিশ্রম সহকারে [illegible]ই উহার বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে বিশেষ [illegible] করেন না। যাহা হউক জল, যতই দর্পণসদৃশ [illegible] হউক বা তাহার অন্তর্গত প্রতিবিম্ব যতই তীরস্থিত দ্রব্যের অনুরূপ হউক, কখনই তাহা সম্পূর্ণ [illegible] ও প্রতিবিম্বে একরূপ হইবে না। অতি স্থির জলও মৃদু মন্দ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইবেই, সুতরাং তাহার হৃদয়স্থিত প্রতিবিম্ব তাহাপেক্ষা কম্পিত [illegible]ইবে। এবং সেই কম্পন-ফলে প্রতিবিম্বের রূপ গঠন ও বর্ণাবলীর বহু পার্থক্য প্রতীত হইবে। উহার বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম দর্শণের উপরই উহার অনুকরণ কার্য্য সমস্ত নির্ভর করিতেছে। ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

সূর্য্যমুখী।

ঊষার প্রথম স্নিগ্ধ পূর্ণ জ্যোতিঃ বলে—
ধীরে ধীরে লুপ্ত করে তামসার ঘোর,
দীপ্ত হয়ে দিনমণি নীলাকাশ তলে
প্রকৃতির রূপরাশি করে গো বিভোর।
নিশার শিশিরবিন্দু মুকুতার মত
ভূধর অধরে শোভে তৃণদল পরে,
অমল কমলদল পরিমল কত
সুশোভিত, চারিদিকে সুবাস বিতরে।
প্রভাতী ভৈরবী রাগে সুমধুর স্বরে,
দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়ে বিহগের গান—
রবি-ছবি গগনের প্রান্ত ভাগে ধীরে
দূরে সূর্য্যমুখীসাথে করে আলাপন।
বেড়ে যায় যত বেলা, দৃশ্যপট তত
প্রকৃতি বিভিন্ন ভাবে করে গো রচনা—
গোলাপের দল, আর শেফালিকা যত,
ঝরে পড়ে, শুষ্ক হয় নীহারের কণা।
কোমলতা চলে যায় বিস্মৃতির পথে
বিকশি মধ্যাহ্ন সূর্য্য হই' তেজীয়ান—
কিন্তু ফুল্ল সূর্য্যমুখী ফুল্ল মনোরথে,
আবেশে বিহ্বলা হয়ে সহে সে কিরণ।
প্রেম বিনিময়ে প্রেম করে বিতরণ,
উভয়ে উভয় পানে রহেছে চাহিয়ে—
কর্ত্তব্য করম কিন্তু ভুলেনা তপন
আপন সে প্রিয়তমা রূপেতে মজিয়ে।
দিবা অবসানে যায় রবি অস্তাচলে,
প্রেমময়ী-প্রেমভরে ফিরে ফিরে চায়,—
ডুবে যায় ভানু শেষে গগনের কোলে,
সূর্য্যমুখী-ম্লান মুখে বদন লুকায়।

একদিনের গবর্ণর।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন শুক্রবার, কলিকাতায় যে এক অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল উহা শুধু যে অভূতপূর্ব্ব তাহাও নয়। এ প্রকার ঘটনা ইংরাজের ভারতীয় ইতিহাসে আর কোন দিন ঘটে নাই এবং ঘটিবার সম্ভবনাও নাই। ঐ দিন

কলিকাতায় একই সময়ে দুই ব্যক্তি গবর্ণর জেনারল নাম ধারণ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বিস্তারে চেষ্টিত ছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন জেনার্ল ক্লেভারিং। ক্লেভারিং সাহেব তখন কাউন্সিল হাউসে গবর্ণর জেনারল হইয়া একমাত্র ফিলিপ ফ্রান্সিস্‌কে লইয়া সভাধিবেশন করিতেছিলেন। অন্যত্র, ওয়ারেণ হেষ্টিংস রিচার্ড বারওয়েলকে লইয়া গবর্ণর-জেনারেল স্বরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্লেভারিং হেষ্টিংসের দ্বন্দের কারণ লিপিবদ্ধ করিবার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হেষ্টিংস কর্ণেল ম্যালীন নামক এক ব্যক্তিকে সন্দেশ বাহক স্বরূপ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া ডিরেক্টরগণ ১৭৭৬ সনের অক্টোবর মাসে হুইলার সাহেবকে কাউন্সিলে হেষ্টিংসের স্থলাভিষিক্তের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৭৭৭ সনের ১৯ জুন বৃহস্পতিবার ডিরেক্টর সভার এই আদেশ বিবেচিত হইলে, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধবাদীগণ এই আদেশের অর্থস্বরূপ প্রস্তাব করেন যে, ডিরেক্টরগণ কাউন্সিলে হেষ্টিংসের স্থলে হুইলারকে যখন নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন মান্যবর ডিরেক্টর সভা প্রকৃত প্রস্তাবে হেষ্টিংসকে পদচ্যুতই করিয়াছেন এবং সেই স্থলে অন্য আদেশ পাওয়া পর্য্যন্ত কাউন্সিলের প্রধান সভ্য জেনার্ল ক্লেভারিংই প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সময় হইতে গবর্ণর জেনার্ল নিযুক্ত হইয়াছেন। ২০ জুন শুক্রবারই হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দীগণ এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ঐ দিবস প্রাতঃকালেই কাউন্সিলের সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারী ওরিয়[illegible] সাহেব প্রাতে ৮ঘটিকার সময় ইউরোপের ডাক স[illegible] জেনার্ল ক্লেভারিংয়ের সহিৎ সাক্ষাতের আদেশ প্রা[illegible] হইলেন। বেলা সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ওরিয়ে[illegible] জেনার্ল ক্লেভারিংয়ের নিকট থাকিয়া কাজক[illegible] সমাধা করিলেন। ইতিমধ্যে ক্লেভারিং কাউন্সিলে[illegible] অন্যতম সদস্য বারওয়েল সাহেবকে যাহাতে বারওয়ে[illegible] নূতন গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য গ্রহণের সময় উপাস্থ[illegible] থাকেন, তজ্জন্য এক পত্র প্রেরণ করিলেন। অ[illegible] এক পত্রে ক্লেভারিং, হেষ্টিংস যাহাতে সমস্ত কার্য্যভা[illegible] তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন তজ্জন্য আদেশ প্রের[illegible] করিলেন। হেষ্টিংস এই পত্রে দুর্গের চাবী ও স[illegible] কারী খাজাঞ্চী-খানার চাবী দাখিল করিয়া দিবা[illegible] জন্য আদিষ্ট হইলেন।

হেষ্টিংস এবং বারওয়েল নিম্নলিখিত ভাবে পত্রো[illegible] ত্তর দিলেন। আইন এবং প্রচলিত নিয়মানুযা[illegible] মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারেল এমন কোন বিষ[illegible] অবগত নহেন, যাহাতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে[illegible] হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ক্ষমত[illegible] আপনার হস্তে বর্ত্তিয়াছে এবং হেষ্টিংসের উপর যে[illegible] ভার ন্যাস্ত রহিয়াছে, তাহা আমরা ন্যায়সঙ্গত উপায়ে রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।” এই পত্র-কাটা-কাটি[illegible] পর হইতেই উভয় পক্ষ বল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগ হস্তগত করণা[illegible] লাষে অগ্রসর হইলেন। রেভিনিউ বোর্ডে[illegible] সেক্রেটারী, গবর্ণর জেনারেলরূপে দস্তখিত[illegible] ক্লেভারিংয়ের এক পত্র দাখিল করিয়া বলিলেন যে, উক্ত বোর্ডের এক সভাধিরোহণের জন্য তিনি[illegible] [illegible] হইয়াছেন। অপর ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম [illegible] সেনাপতি কর্ণেল মর্গানকে “মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত [illegible] হেষ্টিংস” হেষ্টিংসের দস্তখত ব্যতীত অন্য কোন [illegible] পত্র যেন তিনি অমান্য করেন তজ্জন্য আদেশ [illegible]রিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বিচারপতি সার [illegible] ইম্পিকে পত্র দেওয়া হইল যে তিনি ও [illegible] বিচারক যেন একত্র হইয়া কর্ণেল মার্গানকে যে এরূপ পত্র দেওয়া হইয়াছে সেই সম্বন্ধে পরামর্শ [illegible]। সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী, বিচারকগণ যাহাতে কাউন্সিল হাউসে উপস্থিত থাকিয়া কয়েকটী বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত হেষ্টিংসকে উপদেশ দেন সেই অনুরোধ পত্র বহন করিয়া সার ইলিজা ইম্পিজর নিকট প্রেরিত হইলেন। এই পত্র পাইয়া প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকবর্গ পূর্ব্বোক্ত স্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করান হইল। ওারয়াল সাহেবের নিকট হইতে পুনর্ব্বার কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠান হইল কিন্তু প্রত্যুত্তরে তিনি জানাইলেন যে ক্লেভারিংয়ের আদেশানুযায়ী তিনি সমস্ত কাগজ পত্রই ক্লেভারিং সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। বারওয়েল নিজে ক্লেভারিংয়ের নিকট যাইয়াও সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে ক্লেভারিং বোর্ডের সেক্রেটারীকে জানাইলেন যে তিনি যেন বিচারক দিগকে জানান যে সমস্ত কাগজ পত্রই গবর্ণর জেনারেল ক্লেভারিং সন্ধ্যার সময় বিচারক দিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। তদুত্তরে তাঁহারা জানাইলেন যে ঐ দিন সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় তাঁহারা প্রধান বিচারপতির বাটীতে একত্র হইয়া ঐ সমস্ত কাগজাদি পাঠ ও বিচার করিবেন।

হেষ্টিংস প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও বারাকপুর, চুনাঘর, বহরমপুর এবং বজবজ দুর্গাদির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তাঁহার আদেশ ব্যতীত অন্য আদেশ যেন প্রতিপালিত না হয়। হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বীগণও সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বেলা একাদশ ঘটিকার সময় ক্লেভারিং ও ফ্রান্সিস্ কাউন্সিলে উপস্থিত হন এবং তথায় ক্লেভারিং নিয়মানুযায়ী শপথ গ্রহণাদি করেন। তৎপরে সেরিফকে ডাকিয়া পাঠান হয়। এবং ঐ দিন বৈকালে সেরিফ যে ঘোষণাপত্র পাঠ করিবেন তাহার খসড়াও করা হয়। এই সময় অনুবাদক সারজন ডয়লি ঐ খসড়া তর্জ্জমা করিতে অস্বীকৃত হন এবং এই সময়ই ক্লেভারিং ও ফ্রান্সিস জানিতে পারেন যে হেষ্টিংস বিচারক দিগের নিকট মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

পূর্ব্ব বন্দোবস্তানুযায়ী ঐ দিন সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকেরা সার ইলিজার বাটীতে সমবেত হন। সাতটার সময় ক্লেভারিং প্রেরিত কাগজ পত্র বিচারকদিগের নিকট পৌঁছে। কিছুক্ষণ পরে, বিচারকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস স্বকীয় পদত্যাগ করেন নাই এবং এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কেহ ঐ পদের দাবী করিলে তাহা বে-আইনী হইবে। বিচারকদিগের এই অভিমত প্রাপ্তি মাত্রই হেষ্টিংস উহা তাঁহার প্রতিদ্বন্দীদিগের নিকট প্রেরণ করেন। সৌভাগ্য বশতঃ, দুর্গাধ্যক্ষগণও হেষ্টিংস ব্যতীত অন্যের আদেশ তাঁহারা মান্য করিবেন না এইরূপ উত্তর প্রদান

করাতে, ক্লেভারিং ও তাঁহার সহযোগীগণ বিচারক-দিগের অভিমতানুযায়ী কার্য্য করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ২২ এবং ২৩ তারিখে রেভিনিউ বোর্ডের সভায় স্থিরীকৃত হইল যে ক্লেভারিং বে-আইনী করিয়া গবর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব ভার নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন। পরিশেষে, ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে ক্লেভারিং তাঁহার কার্য্যকারী কাউন্সিলে নিজ পদত্যাগ করিয়াছেন; তিনি সেনাপতি পদ হইতেও অপসৃত হইলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার কাউন্সিলে আসিবার আর কোনই ক্ষমতাই থাকিলনা।

২৪শে পুনরায় আবার যখন অধিবেশন হইল তখন ফ্রান্সিস ক্লেভারিংয়ের কাউন্সিল হইতে তাড়িত হইবার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে এই প্রস্তাবগুলি রহিৎ হউক। বারওয়েল অবশ্যই ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন। বিচারক দিগের মত লইয়া অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে ক্লেভারিং পুনরায় কাউন্সিলে বসিতে পারিবেন। ক্লেভারিংয়ের গবর্ণর জেনারলত্ব একদিনেই ফুরাইয়া গেল কিন্তু এই বিবাদের ফল স্বরূপ বিলাতের মহাসভায় স্থিরীকৃত হয় যে গবর্ণর জেনারেলের পদত্যাগ পত্র ভবিষ্যতে লিখিত হইতে হইবে নতুবা উহা গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সোমাদ্দার।

সমুদ্র।

প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে সমুদ্র সাতটি, যথা, লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল। এই সাতটি সমুদ্র সপ্তদ্বীপা মেদিনীর এক একটি দ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। দুঃখে[illegible] বিষয় সেই সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে লবণ সাগর ভিন্ন অ[illegible] ছয়টি এ পর্য্যন্ত আধুনিক কোনও মানবের দৃষ্টিপ[illegible] পতিত হয় নাই। তাহা বলিয়া আমরা উল্লিখি[illegible] ছয়টি সমুদ্রের অস্তিত্ব অমূলক বা কবিকপোল[illegible] কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। কার[illegible] অদ্যাপি এই অসীম জগতের অনেক অংশ অনাবিষ্কৃ[illegible] রহিয়াছে। তবে যে সমুদ্রকে লোকে সচরাচ[illegible] দেখিয়াছে এবং যাহার বিষয় যতদূর সম্ভব নির্ণ[illegible] করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারই বিষয় কিঞ্চি[illegible] পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগের ভাষায় সমুদ্রের অনেকগুলি না[illegible] নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে একটি নাম রত্নাকর। ইহা[illegible] কারণ এই যে, ইহার গর্ভে মুক্তা, প্রবাল প্রভৃ[illegible] অনেক মূল্যবান পদার্থ নিহিত আছে এবং লোকে[illegible] সেই সকল রত্নরাজি উত্তোলন করিয়া নানা দে[illegible] নানা প্রকার ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে[illegible] কিন্তু আমাদিগের মতে সাগর শুদ্ধ পার্থিব রত্নে[illegible] আকর না হইয়া গভীর জ্ঞানরত্নেরও ভাণ্ডার। যি[illegible] জীবনে একবার মাত্রও সাগরকূলে দণ্ডায়মান হইয়া[illegible] নিবিষ্টচিত্তে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়াছেন, তিনি[illegible] এই বাক্যের সাফল্য প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়া[illegible] ছেন। সেই অনন্ত বিস্তৃত জলরাশি, সেই অন[illegible] বীচমালার অবিরাম উদ্ভব ও বিলয় এবং সেই অজ[illegible] বিলোড়ন ও সবেগ তটাভিঘাত মনুষ্যকে অনে[illegible] পবিত্র উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে। এই স্থ[illegible] উপনীত হইয়া মানব ক্ষণকালের নিমিত্তও নিজে[illegible] ক্ষুদ্রত্ব এবং বিশ্বনিয়ন্তার অসীমশক্তি উপলব্ধি করি[illegible]

[illegible]ক্ষম হয়। তৎকালে তাহার মন হইতে হিংসা, [illegible]ক্রোধ, দম্ভ, আস্ফালন, গর্ব্ব এবং অভিমান প্রভৃতি [illegible]প্রবৃত্তি সকল অবসর গ্রহণ করিয়া থাকে এবং চিত্ত [illegible]ভক্তিপ্রবণ হয়।

হিন্দুর শাস্ত্রকার বলিতেছেন যে সৃষ্টির প্রথমে [illegible]সর্ব্বত্র জলময় ছিল, পরে ভগবান সেই জল হইতে [illegible] মৃত্তিকা ও অন্যান্য বস্তু সৃজন করিয়াছেন। এই [illegible]জলের নাম কারণ-বারি, অর্থাৎ যাহা সমস্ত বস্তুর মূলস্বরূপ। এ কথাটা ব্যক্তি বিশেষের মনে এক [illegible]প্রকার কল্পিত গল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ফলে ইহা প্রকৃত সত্য। উদাহরণ স্বরূপ কোনও ইংরাজি গ্রন্থ হইতে স্বল্পমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"The ocean has produced solid land. The study of geology, the skilled inspection of various strata of the land—the rocks, sand, clay, chalk, conglomerates-proves that the materials of the continents have been chiefly deposited at the bottom of the sea, and raised to their present position by the chemical or mechanical agencies which are constantly at work in the vast laboratory of nature."*

যাঁহারা ইংরাজি ভূতত্ত্ব (Geology) পাঠ করিয়া-[illegible] তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবেনা যে নদীসমূহ [illegible] ও প্রবাহিত ক্ষেত্র হইতে প্রতিনিয়ত ক্ষালিত প্রস্তরের অণু, বালুকা ও কর্দ্দম রাশি রাশি পরিমাণে সাগর মধ্যে লইয়া যাইতেছে। এই সকল পদার্থ জল অপেক্ষা গুরু বলিয়া সাগরের তল ভাগে সঞ্চিত হয় এবং কালে তাহা হইতে প্রস্তর এবং মৃত্তিকারাশি নির্ম্মিত হইতে থাকে। পরে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি কারণ বশতঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দ্বীপ বা কোনও ভূখণ্ডের অংশরূপে লক্ষিত হয়। আবার সাগরগর্ভস্থ বালুকারাশি সতত উর্ম্মি-সন্তাড়িত হইয়া বেলাভাগে পুঞ্জীকৃত হইতে থাকে পরে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ নীত হইয়া নিকটস্থ ভূভাগের উচ্চতা বৃদ্ধি করে, অতএব জলও ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে থাকে। অন্যদিকে আবার সাগরসন্নিহিত উচ্চ তটভূমি নিয়ত তরঙ্গ প্রহারে ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া জলমগ্ন হয়। এই জন্য সাগরকূলের ভূমির আকার চিরকাল এক ভাবে থাকিতে পারে না। আজি যাহা উপকূল হয়ত কালি তাহা জলপূর্ণ হইয়া উঠিবে, কিম্বা আজি যথায় গভীর জলরাশি বিরাজমান হয়ত কালি তথায় উচ্চ ভূমিখণ্ড পরিলক্ষিত হইবে। ইহাই জগতের নিয়ম। এইরূপ ও অন্যরূপ নৈসর্গিক কারণ বশতঃ পৃথিবীর নানাস্থানে নানারূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আফ্রিকাখণ্ডে সাহারা বলিয়া এক্ষণে যে মরুভূমির নাম শুনিতেছি এক সময়ে ঐস্থানে সাগর বিদ্যমান ছিল। এবং এক্ষণে যাহা আটলাণ্টিক মহাসাগর বলিয়া অভিহিত পূর্ব্বে উহা আটলাণ্টিস্ নামক একটি মহাদেশ বলিয়া বিদিত ছিল। এ সকল কথা বোধ হয় কেহ কেহ পাঠ করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমরা লবণ সমুদ্রের বিষয়ই কিঞ্চিৎ বলিব, অতএব তদ্বিষয়েই এক্ষণে

* The History of the Sea by F. B. Goodrich.

প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই সমুদ্রের জলে অধিক পরিমাণে লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়াই ইহার নাম লবণ সমুদ্র হইয়াছে। এই জল হইতেই লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিলাতে লিবারপুল সহরে ইহার একটি কারখানা আছে। আমাদিগের দেশে ঔদ্ভিদ, সৈন্ধব, সামুদ্র, সৌবর্চ্চল বা সচল এবং বিট এই পাঁচ প্রকার লবণ প্রচলিত আছে। ঔদ্ভিদ লবণ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়ঃ সৈন্ধব লবণ সিন্ধু বা পঞ্চনদ দেশীয় কোন পর্ব্বতের প্রস্তর বিশেষ (Rock Salt); ইহার অপর নাম লবণোত্তমঃ সামুদ্র লবণ যাহা সমুদ্রের জল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকেঃ সৌবর্চ্চল লবণ মহারাষ্ট্র দেশান্তর্গত সুবর্চ্চল প্রদেশের এক প্রকার লবণঃ এবং বিট লবণ ১ বিট নামক কোন পর্ব্বত হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। যদিও এই পাঁচ প্রকার লবণ বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও স্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি এ সমস্তেরই মুল যে সমুদ্রের জল এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হইবে না। যদি সাগরের জলই সমগ্র পৃথবীর মূল উপাদান ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে পার্থিব, খনিজ এবং উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সকল প্রকার লবণেরই মূল সমুদ্রজল বলিতে পারা যায়।

পরীক্ষা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে প্রত্যেক সহস্র ভাগ সাগর জলে অন্যুন ৩৪০৪০ ভাগ লবণ পাওয়া যায়। যদ্যপি কোন উপায়ে সাগরের জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে পারা যায় তাহা হইলে ইহার তলভাগে ২৩০ ফিট পরিমিত উচ্চ একটী লবণের স্তর দৃষ্ট হইবে। এই কারণবশতঃই যে যে দেশে লবণ প্রস্তর (Rock Salt) পাওয়া যায় তথাকার সেই সেই ভূমখণ্ড কোনও এক সময়ে সমুদ্র-গর্ভবর্ত্তী ছিল তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। সিন্ধুদেশ আমাদিগের সৈন্ধব লবণের আকর; অতএব এই স্থান এককালে সমুদ্রের অংশভূত ছিল। মহাকবি কালিদাস কুমার সম্ভবের প্রারম্ভে যে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আধুনিক সিন্ধু বা পঞ্চনদ দেশটি সাগরের তলভাগ হইতে উত্থিত।

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥"

শুনিয়াছি রাজপুতনার অন্তর্গত শাম্ভর হ্রদের তীরেও প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। তাহাকে শাম্ভারলবণ কহে। অতএব এই হ্রদ পর্য্যন্ত যে এক কালে সাগরের জল বিস্তৃত ছিল না কথা কে বলিতে পারে?

সমুদ্র জলের কটু আস্বাদের কারণ এই যে ইহাতে লবণ ভিন্ন নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি পদার্থ মিশ্রিত আছে, যথা, Chlorides of Magnesium and Potassium, sulphates of Magnesia & lime, Carbonate of lime, Sulphuretted Hydrogen, Bromide of magnesia, Hydrochlorate of ammonia, Iodine, লৌহ, তাম্র এবং রৌপ্য। সমস্ত সাগর জলে মোট ২০,০০,০০০ টন রৌপ্য আছে। তবে লবণের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অন্যান্য পদার্থ সকলের সমষ্টির তিনগুণেরও অধিক। লবণের ভাগ জলের সর্ব্বত্র একরূপ নহে; কোথাও অল্প এবং কোথাও অধিক। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকট কিছু বেশী পরিমাণ এবং উপরের জল অপেক্ষা নিম্নভাগের জল অপেক্ষাকৃত অধিক লবণাক্ত। সকলেই অবগত আছেন যে ভূভাগের ন্যায় সাগরগর্ভ অসংখ্য পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। এবং সাগর মধ্যে নদীর অবস্থানও পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী নদী মেক্সিকো উপসাগর হইতে বহির্গত হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলভাগ দিয়া উত্তর সাগরে উপনীত হইয়াছে। ইহার পরিসর একস্থানে ৩৪ মাইল, গভীরতা ২২০০ ফিট এবং গতি ঘণ্টায় ৪॥ মাইল। এই নদীর জল ইহার উপরিস্থিত সমুদ্রজল অপেক্ষা উষ্ণতর। সমুদ্রগর্ভে এই নদীর অবস্থান-নিবন্ধন কলম্বস্ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন নাবিককে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সাগরগর্ভে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ এবং গুল্মাদি জন্মিয়া থাকে।

একদিকে সাগর যেরূপ অসংখ্য রত্নরাজির আধার, অন্যদিকে ইহা নানাবিধ হিংস্র জন্তুগণের আবাসস্থল বলিয়া অতিশয় ভয়াবহ। সেইজন্য কবি ইহাকে 'অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ" বলিয়াছেন। এই সকল যাদঃ বা হিংস্র জল-জন্তুগণের মধ্যে তিমি, জলহস্তী, সিন্ধুঘোটক, হাঙ্গর, কুম্ভীর ও বৃহদাকার সর্পগণই উল্লেখযোগ্য। ফলতঃ সমুদ্র মনুষ্যের পক্ষে যতই কেন আশঙ্কাজনক হউক না, মনুষ্য বুদ্ধিবলে নানারূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইহার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া বিবিধ রত্নরাজি উদ্ধার করিতেছে। এই সকল যন্ত্র Diving-Bell বা Diving apparatus বলিয়া আখ্যাত।

সমুদ্রের জলের উপরিভাগে একপ্রকার অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহাকে বাড়বানল কহে। কোন সময়ে ভৃগুনন্দন ঔর্ব্বের দারুণ ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তিনি সেই অগ্নি বড়বা অর্থাৎ সামুদ্রঘোটকীর মুখে অবস্থাপিত করেন। তদবধি এই অগ্নি সমুদ্রে রহিয়া গিয়াছে। ইয়ুরোপীয় নাবিকগণও জলের উপর এই দহ্যমান পদার্থের দীপ্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা রাত্রিকালে সমুদ্রমধ্যে এই আলোকরাশি প্রথম দর্শন করেন, তখন তাঁহারাও ইহাকে প্রকৃত অগ্নি বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন এবং ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাতে অগ্নির ন্যায় দাহিকাশক্তি নাই তখন তাঁহারা তাহাকে অন্য কোন পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে যে, Phosphorescence নামক খদ্যোতবৎ অসংখ্য পরমাণুরূপী এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ জলের উপরিভাগ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকা বশতঃ অন্ধকারে ইহাদিগের দীপ্তি প্রকাশ পায় এবং অর্ণবপোত সমূহের নিকটে স্রোতের ন্যায় বিচলিত হইতে থাকে।

সাগরের জল স্থান বিশেষে লোহিত বা অন্যরূপ দৃষ্ট হইলেও ইহা সচরাচর নীলাভ। কিন্তু এই নীলাম্বু কোনও পাত্রে লইয়া পরীক্ষা করিলে সাধারণ জলের ন্যায় স্বচ্ছ প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রের যে স্থল অত্যন্ত গভীর নয় তথায় ইহার তলভাগ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গভীর জলে উপর হইতে তলদেশ দৃষ্টিগোচর হয় না। এক স্থানের জল এতদূর গাঢ় নীলাভ যে সাগর যাত্রীরা ইহাকে

"কালাপানি" বলিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব বশতঃই সাগর জলের নীলবর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। একথা সম্ভবপর হইলেও আকাশ যে কারণে নীলবর্ণ লক্ষিত হয় বোধ হয় সাগরাম্বুরও নীলতত্ত্বের কারণ তাহাই হইবে।

আমরা যখন সর্ব্ব প্রথমে সাগর সন্দর্শন করি তখন দূর হইতে ইহার জলরাশিকে একটী অভ্রংলিহ পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, আর ইহার সচল ফেনিল উর্ম্মিমালা ধূনিত তুলারাশির ন্যায় সেই পর্ব্বত পার্শ্ব হইতে সবেগে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইয়া বেলার বালুকাময় ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ধৌত আস্তরণ বিস্তার করিতেছে বোধ হইয়াছিল।

সমুদ্র যতই দুর্গম বা বিভীষিকাপূর্ণ হউক না কেন, ইহাদ্বারা জগতের যে কত শত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা অল্প কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। তন্মধ্যে বাণিজ্য বিস্তারই সর্ব্বপ্রধান বলিতে হইবে। জগতের আদি নিবাসিরা সাগর দর্শন মাত্রেই ভীত ও বিকম্পিত হইতেন। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে যখন সীতা দেবীর অন্বেষণ করা হয় তখন সাগরপার ভয়ে বড় বড় বীরেরও মস্তক অবনত হইয়াছিল। পরে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাপুরে যাইতে হয়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে তৎকালে সাগর গমন জন্য কোনরূপ পোতাদি সৃষ্ট হয় নাই। অর্ণবযান কিরূপে বা কোন দেশে প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। তবে অনুমান দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে বৃক্ষচ্যুত পত্র কিম্বা শুষ্ক কাষ্ঠ ফলকাদির জলোপরি অবস্থান এবং তদবলম্বনে কোন প্রাণীর নদী প্রভৃতির অন্য পারে গমনাগমন দর্শন করিয়াই মানব জলযান নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর কোন জাতি প্রকৃত পক্ষে সমুদ্র যাত্রার প্রথম পথ প্রদর্শক তাহা সবিশেষ জানিতে পারা যায় নাই। ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের মতে ফিনিসিয়বাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে পোতাদি নির্ম্মাণ করিয়া সাগরে গমনাগমন করিত এবং মিসরও আসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য স্থাপন করিয়াছিল। পরে গ্রীসদেশীয়েরা তাহাদিগের নিকট জলযাত্রায় শিক্ষিত হয় এবং ট্রয় যুদ্ধের সময় তাহারা নৌযাত্রা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। এই সময় হইতেই ইউরোপে নৌ বিদ্যার ক্রমশঃ অনুশীলন হইতে থাকে। যখন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণের সহিত তুরস্কের মুসলমানদিগের বহুকালব্যাপী ধর্ম্ম যুদ্ধ প্রজ্জ্বলিত হয় তখনই ইউরোপে বহুতর অর্ণবযান গঠিত হয় এবং সেই সূত্রে ইউরোপের সহিত আসিয়ার বাণিজ্যের দ্বারও উদ্‌ঘাটিত হয়। কালক্রমে ইউরোপীয় জাতিরা অর্ণবযাত্রায় এতদূর কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন যে নৌ বিদ্যায় তাঁহারা পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এই উৎকর্ষতার প্রভাবেই কলম্বস্ মার্কিন দেশ আবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন, ভেস্কোডেগামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তৎপরে ম্যাগিলেন, ড্রেক ও কুক প্রভৃতি নাবিকেরা পৃথিবীর সমস্ত সাগর পরিভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষে ভূগোল শাস্ত্র পরিপুষ্টি লাভ করিতে আরম্ভ করে।

যখন ইউরোপীয় নাবিকেরা প্রথমতঃ সাগরযাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েন তখন দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের বিষয় তাঁহারা

অবগত ছিলেন না। তাঁহারা নভোমণ্ডলস্থ কতিপয় ধ্রুব নক্ষত্রের স্থিতি অনুসারে দিঙ্‌নির্ণয় করিতেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহারা বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কারণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে তাঁহাদিগের দিগ্‌ভ্রম ঘটিত এবং তদবস্থায় তাঁহাদিগকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হইত। পরে ইংরাজি ত্রয়োদশ শতাব্দিতে এই যন্ত্রের ব্যবহার তাঁহারা অবগত হয়েন এবং দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজি গ্রন্থকারগণের বিশ্বাস যে চীন দেশীয়গণই এই যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারক কারণ চীন ভাষার অভিধানে ১২১ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং চীনবাসীরা ইউরোপীয় নাবিকগণের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই যন্ত্র সাহায্যে দক্ষিণ সাগরে বাণিজ্য হেতু গমনাগমন করিত। চীনগণ এই যন্ত্রের ব্যবহার অবগত হইলেও ইহার শঙ্কু উত্তরদিক নির্দ্দেশক না বলিয়া দক্ষিণদিক নির্দ্দেশক মনে করিত। চীনবাসিরা দক্ষিণ সমুদ্র ব্যতীত ভারতবর্ষ ও আরব প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। বোধ হয় আরবেরা চীনদিগের নিকট হইতে এই যন্ত্রের উপকারিতা উপলব্ধি করে এবং আরব দেশ হইতে ইউরোপে ইহার প্রচলন হয়।

যখন সর্ব্বপ্রথমে জলযান নির্ম্মিত হয় তখন বোধ হয় কোন বৃহদাকার বৃক্ষের স্কন্ধ দেশকে ডোঙ্গার ন্যায় শূন্য গর্ভ করিয়া ব্যবহৃত হইত। পরে যখন বৃহদাকারের জলযান প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা হয় তখন কাষ্ঠের ফলক দ্বারা তাহা গঠিত হইতে লাগিল। তাহার পর ঐ সকল পোতের তলদেশ স্থায়ী এবং দৃঢ়তর করিবার মানসে তাম্রের চাদর দ্বারা বহির্ভাগ আবরিত হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে লৌহ এবং ইস্পাতের চাদর দ্বারা অর্ণবযান সকল নির্ম্মিত হইতেছে।

প্রথমতঃ জলযান সকল স্রোতোবেগেই নীত হইত। স্রোতের প্রতিকূল গমন জন্য কর্ণও বহিত্রাদি সৃষ্ট হয়। অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইলে জলযান পালি দ্বারাও চালিত হইত। কিরূপে পালির ব্যবহার আবিষ্কৃত হয় ইংরাজি গ্রন্থে তাহার একটী গল্প আছে। কোন সময়ে এক ধীবর তাহার প্রণয়িণীকে লইয়া নৌকাযোগে একটী দ্বীপোদ্দেশে পলায়ন করে। পথি মধ্যে প্রবল বৃষ্টি ও বাত্যা উপস্থিত হইয়া তাহার নৌকার কর্ণ স্খলিত হইয়া জলমগ্ন হইলে, তরঙ্গ প্রভাবে নৌকা ইতস্ততঃ নীত হইতে থাকে। এ দিকে ধীবর বারিধারায় অভিষিক্ত হইয়া অতিশয় বিপন্ন ও ভীত চিত্ত হইলে তাহার প্রণয়িনী প্রিয়তমের রক্ষার্থ আপন পরিধেয় বস্ত্র ধীবরের মস্তোকপরি ধারণ করে। তখন বায়ুপ্রভাবে বস্ত্র সফীত হইয়া নৌকা তীরাভিমুখে চালিত হইয়া তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করে। এই ঘটনার পর হইতেই পালির সৃষ্টি হয়।

এইরূপে বহুকাল অর্ণবপোত সকল চালিত হইয়া আসিতেছিল, পরে মার্কিণ দেশান্তর্গত পেনিসিলবেনিয়া নিবাসী রবার্ট ফুলটন্ নামা জনৈক চিত্রকর ইংরাজি ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে কল্পনা বলে স্থির করে যে বাষ্পযন্ত্র দ্বারা জলযান চালিত হওয়া সম্ভবপর এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। ফুলটন্ সাহেব নানা কারণে বিতথ প্রযত্ন হইয়াও ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে একখানি বাষ্পীয় জলযান নির্ম্মাণ করাইয়া নিউইয়র্ক হইতে জার্শিতীর পর্য্যন্ত

চালিত করেন। তাহার পর হইতেই বহুলপ্রকার বাষ্পীয় অর্ণবযান ও রণতরী গঠিত হইয়াছে এবং বাষ্পীয় অর্ণবযান সৃজন হেতু দেশান্তর গমনের জলপথ সুগম ও অল্প সময়ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে ফিনিসিয়-বাসীরাই সর্ব্ব প্রথমে জলযাত্রার পথ প্রদর্শক। ইহা ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের প্রচারিত মত। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে নৌবিদ্যার প্রথম সূত্রপাত ভারতবর্ষ হইতেই হইয়াছিল। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে যখন সভ্যতার আলোক ইউরোপে আদৌ প্রবেশ করে নাই, তখন ভারত সর্ব্ব বিষয়েই সমুন্নত ছিল। আজি কালি যে এরোপ্লেন যন্ত্রের আবিষ্কার লইয়া ইয়ুরোপে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে তদপেক্ষা সুচারু বিয়দ্গামী যন্ত্র এদেশে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যিনি রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে কুবেরের বিমান যাহা দশানন লঙ্কায় আনয়ণ করিয়াছিলেন এবং যদ্দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র সীতাসমভিব্যাহারে অযোধ্যায় আগমন করেন, তাহা ইয়ুরোপীয় এরোপ্লেন যন্ত্রাপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ছিল। আর ভারতবাসীরা ইয়ুরোপীয় জাতিগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে ভারত সাগরস্থ দ্বীপ পুঞ্জে বানিজ্য ব্যবসায় করিত তাহা অনেকেরই বিদিত এবং খ্রীষ্ট শতাব্দির বহু পূর্ব্বে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা জাপান দ্বীপ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় অল্প কথায় লিখিয়া শেষ করা সকলের তৃপ্তিজনক হইবে না বিধায় আমরা এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করিব।

সাগর বিষয়ক সমস্ত কথা বলিতে গেলে, জলস্তম্ভ, জোয়ার, ভাটা, স্রোতঃ, বানিজ্য বায়ু প্রভৃতি অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু এই সকল বিষয় প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠিরা বিশেষ অবগত আছেন বলিয়া তাহার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি। তবে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলভাগ দিয়া তাড়িৎ বার্ত্তাবহ কিরূপে সংযোজিত হইয়াছে কেবলমাত্র তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ইংরাজি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন দেশস্থ ষ্টকব্রিজ নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীবাসী সাইরাস এচ ফিল্ড নামক এক ব্যক্তি মনে মনে ভাবিয়া স্থির করেন যে তাড়িত বার্ত্তাবহের তার সমুদ্র জলের ভিতর দিয়াও চালিত করিতে পারা যায়। তিনি সাধারণ সমক্ষে এই কথা ব্যক্ত করিলে সকলেই তাঁহার মতের পোষকতা করিল। পরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলভাগের অবস্থা নির্ণীত হইতে আরম্ভ হইল। বারম্বার পরীক্ষাদ্বারা অবধারিত হইল যে এই মহাসাগরের গভীরতা দুই হইতে আড়াই মাইলের অধিক নহে এবং ইহার তলভাগ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে আয়রল্যাণ্ড পর্য্যন্ত প্রায়ই সমতল ও এক প্রকার কোমল শৈবালবৎ কোন প্রকার পদার্থ দ্বারা আবৃত। এই কোমলতার কারণ পরিশেষে নির্ণীত হইল যে এই স্থল উজ-জাতির (Ooze) পরমাণুবৎ কোন ক্ষুদ্র জীবের মৃত দেহের দ্বারা সমাকীর্ণ। এই সকল ব্যাপার স্থিরীকৃত হইলে আটলাণ্টিক টেলিগ্রাফিক কোম্পানী

(Atlantic Telegraphic Company) বলিয়া একটী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গঠিত হইয়া এই কার্য্যে নিয়োজিত হয়। তাঁহারা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্য্য শেষ করেন। এই বার্ত্তাবহ তারের একভাগ আমেরিকা হইতে এবং অন্যভাগ ইংলণ্ড হইতে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে মধ্যস্থলে সংযোজিত করা হয়। যে দুইটী বৃহদাকারের অর্ণব পোত দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল তাহার একটীর নাম এগামাম্‌নান্ ও অপরটীর নাম নাইয়েগ্রা। এই বার্ত্তাবহ তারের গঠন এইরূপ।

১। সাতটী তাম্র তার একত্র দৃঢ়ভাবে জড়িত।

২। তদুপরি গটাপার্চ্চার তিন স্তর।

৩। তাহার উপরিভাগে ছয় প্রস্থ শণ বা কার্পাশ নির্ম্মিত আবরণ।

৪। সর্ব্বোপরি অষ্টাদশটী তারের রজ্জু দ্বারা জড়িত। এই রজ্জুর প্রত্যেকটী সাতটী করিয়া তারের দ্বারা নির্ম্মিত।

শ্রীউমাচরণ মিত্র।

অনুরোধ।

আমি বেসেছি বেসেছি ভালো !
সোণার ঊষার সুষমা উদার
তরুণ অরুণ আলো !
আমি গো সূর্য্যমুখী
তাহারে নিরখি' সুখী,—
দেব !
তুমি তপন মাঝার করুণা তোমার
আমারি মাথায় ঢালো !
আমি তারে যে বেসেছি ভালো
আমি সঁপেছি সঁপেছি মন !
রূপসী নিশার রতন হিয়ার
সুধাকরে বিমোহন !
ক্ষুদ্র চকোর আমি
পীযূষকণিকা-কামী,—
নাথ !
তুমি চাঁদিমা মাঝার আশীষ তোমার
কর মোরে বিতরণ !
আমি তারে যে সঁপেছি মন !
আমি দিয়েছি দিয়েছি প্রাণ !
অসীম অপার গীতি-অমরার
পারাবারে সুমহান্ !
আমি যে গো গিরি-বালা
ছুটিনু জুড়াতে জ্বালা,—
প্রভো !
তুমি জলধি মাঝার সোহাগ তোমার
করহে আমারে দান !
আমি তারে যে দিয়েছি প্রাণ !
আমি নিয়েছি নিয়েছি বুকে !
বিশ্ব-জীবন দীপ্ত শোভন
পবিত্র পাবকে সুখে !
পতঙ্গ আমি হীন
কামনা হইতে লীন,—

বিভো !

তুমি অনল মাঝার প্রণয় তোমার
রাখ মোর অভিমুখে।
আমি তারে যে নিয়েছি বুকে !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

চিদম্বরম্।

সন ১৩১৪ সাল ৩রা চৈত্র ইংরাজি ১৯০৮ খৃঃ ১৬ই মার্চ্চ প্রথমবার রামেশ্বর যাত্রাকালে চিদম্বরম্ দর্শনাশা পরিপূর্ণ হয় নাই। সেই অতৃপ্ত আশা চরিতার্থ করিবার জন্যই এবার মাদ্রাজ পার হইয়াই অগ্রে চিদম্বরম্ দর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছি। মাদ্রাজ হইতে দুরত্ব ১৫১ মাইল তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৸৹ টাকা। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে (S. I. Ry.) মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী নাই। বিগত সন্ধ্যা ৫টা ১৭ মিঃ সময়ে Tuticorin Boat Mail নামক ডাক গাড়ীতে মাদ্রাজবীচ ষ্টেষণে আরোহণ করিলাম।

মাদ্রাজবীচ ষ্টেষণ ছাড়াইয়া কোট, পার্ক ও এগামার প্রভৃতি খাশ মাদ্রাজ সহরের ষ্টেষণ কয়েকটী ছাড়াইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া দিনমণি পশ্চিম গগণে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তৎ সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব গগণে শুক্ল শরীরে স্নিগ্ধ চন্দ্রমা উদিত হইয়া নৈশ তিমিররাশি বিনাশ করতঃ বাসন্তিক মলয়-মারুত-হিল্লোলসহ জগদ্বাসির প্রাণে স্বর্গীয় সুধারাশি ঢালিয়া দিতে লাগিল। তীব্রবেগ-গামী বাষ্পীয়যানমধ্য হইতে শুভ্র জ্যোৎস্না-বিমণ্ডিত প্রকৃতির সহাস্য বদন সন্দর্শন করিতে করিতে আমরা আনন্দে বিভোর ও ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল; প্রকৃতির সহাস্য বদন মলিন হইল; আমাদের হৃদয়ের আনন্দ-প্রবাহের স্রোত ফিরিয়া গেল; হরিষে বিষাদ হইল। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে জলদরাশি আসিয়া আকাশমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল; যাহা দেখিতে ছিলাম তাহা দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইল। ক্রমে ক্রমে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। আমাদের হৃদয়রাজ্য হইতে আনন্দ দুরে পলাইল, বিপদ আসিয়া সেই রাজ্য অধিকার করিল। আমরা বিষাদকে বক্ষে ধারণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যে এই বিষাদের রাজত্ব বুঝি চিরকালই থাকিবে; কিছুকাল এখন বুঝি এই বিষাদকেই হৃদয়ে বহন করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম তাহা নহে, দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ ইহা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। ইহা প্রত্যেক মানবজীবনেই অনুভূত হইয়া থাকে। তবে যে, কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবনে একটানা সুখের ও সৌভাগ্যের স্রোত বহিতে দেখা যায় সে কেবল তাহার জন্মান্তরীণ সুকৃতি ও তপস্যার ফল। সেই সুখস্রোতে যিনি সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানকে ভুলিলেন, কুপথ গামী হইয়া জগতের অমঙ্গলকর কার্য্য করিতে লাগিলেন, তিনিই আপনার ভবিষ্যৎ জীবন গরলময় ও কণ্টকময় করিলেন। সুদীর্ঘ সুখের পর সুদীর্ঘ দুঃখ তাঁহার অবশ্যম্ভাবী; সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

(Atlantic Telegraphic Company) বলিয়া একটী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গঠিত হইয়া এই কার্য্যে নিয়োজিত হয়। তাঁহারা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্য্য শেষ করেন। এই বার্ত্তাবহ তারের একভাগ আমেরিকা হইতে এবং অন্যভাগ ইংলণ্ড হইতে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে মধ্যস্থলে সংযোজিত করা হয়। যে দুইটী বৃহদাকারের অর্ণব পোত দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল তাহার একটীর নাম এগামামনান্ ও অপরটীর নাম নাইয়েগ্রা। এই বার্ত্তাবহ তারের গঠন এইরূপ।

১। সাতটী তাম্র তার একত্র দৃঢ়ভাবে জড়িত।

২। তদুপরি গটাপার্চ্চার তিন স্তর।

৩। তাহার উপরিভাগে ছয় প্রস্থ শণ বা কার্পাশ নির্ম্মিত আবরণ।

৪। সর্ব্বোপরি অষ্টাদশটী তারের রজ্জু দ্বারা জড়িত। এই রজ্জুর প্রত্যেকটী সাতটী করিয়া তার দ্বারা নির্ম্মিত।

শ্রীউমাচরণ মিত্র।

অনুরোধ।

আমি বেসেছি বেসেছি ভালো !
সোণার উষার সুষমা উদার
তরুণ অরুণ আলো !
আমি গো সূর্য্যমুখী
তাহারে নিরখি’ সুখী,—
দেব !
তুমি তপন মাঝার করুণা তোমার
আমারি মাথায় ঢালো !
আমি তারে যে বেসেছি ভালো
আমি সঁপেছি সঁপেছি মন !
রূপসী নিশার রতন হিয়ার
সুধাকরে বিমোহন !
ক্ষুদ্র চকোর আমি
পীযুষকণিকা-কামী,—
নাথ !
তুমি চাঁদিমা মাঝার আশীষ তোমার
কর মোরে বিতরণ !
আমি তারে যে সঁপেছি মন !
আমি দিয়েছি দিয়েছি প্রাণ !
অসীম অপার গীতি-অমরার
পারাবারে সুমহান্ !
আমি যে গো গিরি-বালা
ছুটিনু জুড়াতে জ্বালা,—
প্রভো !
তুমি জলধি মাঝার সোহাগ তোমার
করহে আমারে দান !
আমি তারে যে দিয়েছি প্রাণ !
আমি নিয়েছি নিয়েছি বুকে !
বিশ্ব-জীবন দীপ্ত শোভন
পবিত্র পাবকে সুখে !
পতঙ্গ আমি হীন
কামনা হইতে লীন,—

বিভো !

তুমি অনল মাঝার প্রণয় তোমার
রাখ মোর অভিমুখে।
আমি তারে যে নিয়েছি বুকে !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

চিদম্বরম্।

সন ১৩১৪ সাল ৩রা চৈত্র ইংরাজি ১৯০৮ খৃঃ ১৬ই মার্চ্চ প্রথমবার রামেশ্বর যাত্রাকালে চিদম্বরম্ দর্শনাশা পরিপূর্ণ হয় নাই। সেই অতৃপ্ত আশা চরিতার্থ করিবার জন্যই এবার মাদ্রাজ পার হইয়াই অগ্রে চিদম্বরম্ দর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছি। মাদ্রাজ হইতে দূরত্ব ১৫১ মাইল তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৸০ টাকা। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে (S. I. Ry.) মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী নাই। বিগত সন্ধ্যা ৫টা ১৭ মিঃ সময়ে Tuticorin Boat Mail নামক ডাক গাড়ীতে মাদ্রাজবিচ ষ্টেষণে আরোহণ করিলাম।

মাদ্রাজবীচ ষ্টেষণ ছাড়াইয়া কোট, পার্ক ও এগামার প্রভৃতি খাশ মাদ্রাজ সহরের ষ্টেষণ কয়েকটী ছাড়াইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া দিনমণি পশ্চিম গগণে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তৎ সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব গগণে শুক্ল শরীরে স্নিগ্ধ চন্দ্রমা উদিত হইয়া নৈশ তিমিররাশি বিনাশ করতঃ বাসন্তিক মলয়-মারুত-হিল্লোলসহ জগদ্বাসির প্রাণে স্বর্গীয় সুধারাশি ঢালিয়া দিতে লাগিল। তীব্রবেগ-গামী বাষ্পীয়যানমধ্য হইতে শুভ্র জ্যোৎস্না-বিমণ্ডিত প্রকৃতির সহাস্য বদন সন্দর্শন করিতে করিতে আমরা আনন্দে বিভোর ও ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল; প্রকৃতির সহাস্য বদন মলিন হইল; আমাদের হৃদয়ের আনন্দ-প্রবাহের স্রোত ফিরিয়া গেল; হরিষে বিষাদ হইল। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে জলদরাশি আসিয়া আকাশমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল; যাহা দেখিতে ছিলাম তাহা দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইল। ক্রমে ক্রমে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। আমাদের হৃদয়রাজ্য হইতে আনন্দ দূরে পলাইল, বিপদ আসিয়া সেই রাজ্য অধিকার করিল। আমরা বিষাদকে বক্ষে ধারণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যে এই বিষাদের রাজত্ব বুঝি চিরকালই থাকিবে; কিছুকাল এখন বুঝি এই বিষাদকেই হৃদয়ে বহন করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম তাহা নহে, দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ ইহা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। ইহা প্রত্যেক মানবজীবনেই অনুভূত হইয়া থাকে। তবে যে, কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবনে একটানা সুখের ও সৌভাগ্যের স্রোত বহিতে দেখা যায় সে কেবল তাহার জন্মান্তারিণ সুকৃতি ও তপস্যার ফল। সেই সুখস্রোতে যিনি সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানকে ভুলিলেন, কুপথ গামী হইয়া জগতের অমঙ্গলকর কার্য্য করিতে লাগিলেন, তিনিই আপনার ভবিষ্যৎ জীবন গরলময় ও কণ্টকময় করিলেন। সুদীর্ঘ সুখের পর সুদীর্ঘ দুঃখ তাঁহার অবশ্যম্ভাবী; সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রায় দুই তিন ঘণ্টাকাল পরে করুণাময়ের ইচ্ছায় প্রকৃতিদেবীর শান্ত প্রেমানুরঞ্জিত মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল; সমীরণ বিতাড়িত হইয়া কাদম্বিনী সকল গগণমণ্ডল ত্যাগ করিয়া কোন অজানিত দেশে পলায়ন করিল। আকাশ নির্ম্মল হইল; সুধাকর পূর্ব্বের ন্যায় আবার সুধারাশি প্রকৃতিদেবীর মস্তকে ঢালিতে লাগিল! অস্ফুটজ্যোতিঃ তারকারাজি ফুটিয়া উঠিল। জগতবাসী আবার আমোদে মাতোয়ারা হইল। আমাদের হৃদয়েও আবার প্রেম-চন্দ্রের উদয় হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ সহকারে চলিলাম।

রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় আমরা চিদম্বরম্ ষ্টেষণে পৌঁছিলাম। ষ্টেষণে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গাড়ী হইতে শ্রীমন্দিরের উচ্চ গোপুর সকল জ্যোৎস্না প্রতিভাত হইয়া আমাদের নয়ন পথে পতিত হইল সন্দর্শনে আমাদের মনে কতদূর আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

আমরা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া ষ্টেষণ মাষ্টার ও অপর একটী ভদ্র ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা যত্ন সহকারে আমাদের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কহিলেন এবং আমাদিগকে গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। পরে কথোপকথন কালে প্রকাশ পাইল যে দ্বিতীয় ব্যক্তিটী Plague officer অর্থাৎ প্লেগ ডাক্তার। পূর্ব্বে স্কুল মাষ্টার ছিলেন, ব্যবহার অতি ভদ্র। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকায় তিনি পরদিন চলিত নিয়মানুসারে তাঁহার আফিসে না যাইতে বলিয়া স্বয়ং আমাদের বাসায় আসিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যাহা হউক উক্ত ভদ্র মহোদয়দ্বয়ের সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মন্দিরাভিমুখে গোযান যোগে চলিলাম। এ প্রকার গরুর গাড়ীতে ৪৫ জন লোক সচ্ছন্দে যাইতে পারে। ষ্টেষণ হইতে মন্দিরটী প্রায় দেড় মাইল। দুই দিকে বিটপী-শ্রেণী পরিশোভিত প্রশস্ত রাজপথ। উপরিস্থিত বৃক্ষ কুঞ্জের মধ্য দিয়া বিক্ষিপ্ত চন্দ্রালোক দ্বারা আলোকিত পথ অতিক্রম করিতে করিতে শুক্ল চতুর্দ্দশীর শুভ্র জ্যোৎস্না-বিমণ্ডিত স্থানীয় প্রাকৃতিক মাধুরী দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণকাল স্থায়ী, যদি পথ দীর্ঘ হইত তাহা হইলে এ আনন্দ আমরা অনেকক্ষণ উপভোগ করিতে পারিতাম।

কতকক্ষণ পরেই গাড়ী একটী পল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়োয়ান পাণ্ডাকে ডাকিতে লাগিল, দুই চারি ডাকের পরই পাণ্ডা মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন। রাস্তার সংলগ্ন একটী যাত্রী-নিবাস আছে, পাণ্ডা গাড়োয়ানকে তথায় আমাদের 'সমন' (দ্রব্যাদি) নামাইতে বলিলেন এবং আমাদিগকে সেই রাত্রির জন্য তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইতিপুর্ব্বে আমরা অবগত হইয়াছি যে, শ্রীমন্দির-দ্বার সন্নিকটে যে চৌল্ট্রি বা ছত্রম আছে তাহাতে অবস্থিতি করা সুবিধা। পাণ্ডা কহিলেন যে "ছত্রম যাত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে থাকিবার সুবিধা হইবে না। কেবলমাত্র একটী হল পড়িয়া আছে"। কিন্তু তথায় থাকিয়া দেবদর্শনাদি বিশেষ সুবিধা হইবে বুঝিয়া আমরা তথয়া

প্রায় দুই তিন ঘণ্টাকাল পরে করুণাময়ের ইচ্ছায় প্রকৃতিদেবীর শান্ত প্রেমানুরঞ্জিত মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল; সমীরণ বিতাড়িত হইয়া কাদম্বিনী সকল গগণমণ্ডল ত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞানিত দেশে পলায়ন করিল। আকাশ নির্ম্মল হইল; সুধাকর পূর্ব্বের ন্যায় আবার সুধারাশি প্রকৃতিদেবীর মস্তকে ঢালিতে লাগিল। অস্ফুটজ্যোতিঃ তারকারাজি ফুটিয়া উঠিল। জগতবাসী আবার আমোদে মাতোয়ারা হইল। আমাদের হৃদয়েও আবার প্রেম-চন্দ্রের উদয় হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ সহকারে চলিলাম।

রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় আমরা চিদম্বরম্ ষ্টেষণে পৌছিলাম। ষ্টেষণে পৌছিবার পূর্ব্বেই গাড়ী হইতে শ্রীমন্দিরের উচ্চ গোপুর সকল জ্যোৎস্না প্রতিভাত হইয়া আমাদের নয়ন পথে পতিত হইল তদ্দর্শনে আমাদের মনে কতদূর আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

আমরা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া ষ্টেষণ মাষ্টার ও অপর একটী ভদ্র ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা যত্ন সহকারে আমাদের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কহিলেন এবং আমাদিগকে গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। পরে কথোপকথন কালে প্রকাশ পাইল যে দ্বিতীয় ব্যক্তিটী Plague officer অর্থাৎ প্লেগ ডাক্তার। পূর্ব্বে স্কুল মাষ্টার ছিলেন, ব্যবহার অতি ভদ্র। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকায় তিনি পরদিন চলিত নিয়মানুসারে তাঁহার আফিসে না যাইতে বলিয়া স্বয়ং আমাদের বাসায় আসিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যাহা হউক উক্ত ভদ্র মহোদয়দ্বয়ের সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মন্দিরাভিমুখে গোযান যোগে চলিলাম। এ প্রকার গরুর গাড়ীতে ৪ ৫ জন লোক সচ্ছন্দে যাইতে পারে। ষ্টেষণ হইতে মন্দিরটী প্রায় দেড় মাইল। দুই দিকে বিটপী-শ্রেণী পরিশোভিত প্রশস্ত রাজপথ। উপরিস্থিত বৃক্ষ কুঞ্জের মধ্য দিয়া বিক্ষিপ্ত চন্দ্রালোক দ্বারা আলোকিত পথ অতিক্রম করিতে করিতে শুক্ল চতুর্দ্দশীর শুভ্র জ্যোৎস্না-বিমণ্ডিত স্থানীয় প্রাকৃতিক মাধুরী দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণকাল স্থায়ী, যদি পথ দীর্ঘ হইত তাহা হইলে এ আনন্দ আমরা অনেকক্ষণ উপভোগ করিতে পারিতাম।

কতকক্ষণ পরেই গাড়ী একটী পল্লীতে আসিয়া পৌছিল। গাড়োয়ান পাণ্ডাকে ডাকিতে লাগিল, দুই চারি ডাকের পরই পাণ্ডা মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন। রাস্তার সংলগ্ন একটী যাত্রী-নিবাস আছে, পাণ্ডা গাড়োয়ানকে তথায় আমাদের 'সমন' (দ্রব্যাদি) নামাইতে বলিলেন এবং আমাদিগকে সেই রাত্রির জন্য তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইতিপুর্ব্বে আমরা অবগত হইয়াছি যে, শ্রীমন্দির-দ্বার সন্নিকটে যে চৌল্টি বা ছত্রম আছে তাহাতে অবস্থিতি করা সুবিধা। পাণ্ডা কহিলেন যে "ছত্রম যাত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে থাকিবার সুবিধা হইবে না। কেবলমাত্র একটী হল পড়িয়া আছে"। কিন্তু তথায় থাকিয়া দেবদর্শনাদি বিশেষ সুবিধা হইবে বুঝিয়া আমরা তথায় যাইতে একান্ত ইচ্ছুক হইলে পাণ্ডামহাশয় অবশেষে তথায় লইয়া গিয়া আমাদের থাকিবার এক প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাটী চলিয়া আসিলেন।

শয়ন করিবার পূর্ব্বেই আমি একবার চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত সুবৃহৎ গোপুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুবিশাল বহিপ্রাঙ্গনাস্থিত কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ চতুর্দ্দিকে চাঁদনিযুক্ত শিবগঙ্গা নামক সরোবর ও তৎপার্শ্বস্থিত সহস্রস্তম্ভহল দর্শনে মনের আগ্রহাতিশয্য কতক পরিমাণে নিবারণ করিয়া ছত্রে আসিলাম। ছত্রে আসিয়াই শয়ন করিলাম; তখন প্রায় রাত্রি সার্দ্ধ তিন ঘটিকা।

শয্যাগত হইবার অব্যবহিত পরেই নিদ্রাদেবী মন্থর গমনে আগমন পূর্ব্বক চক্ষু দ্বার দিয়া দেহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অমনি নেত্রদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। মৃত্যু সহোদরা নিদ্রাকে দর্শন করিবা মাত্র মন্দিরসহ সংজ্ঞা দেবী ভীতা চকিতা ও মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। যে শক্তি প্রভাবে জীবের পঞ্চভূতাত্মক দেহ চলিয়া, ঘুরিয়া, ফিরিয়া বেড়ায়, যে শক্তি প্রভাবে মানবের "আমি" "তুমি" জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে এবং স্ব স্ব স্বার্থ চরিতার্থ জন্য সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে সেই শক্তি লোপ হওয়ায় আমার পাঞ্চভৌতিক উপকরণে নির্ম্মিত দেহ যষ্টি স্পন্দহীন হইয়া পতিত রহিল।

রজনী প্রভাত হইলে প্রভাকরের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইলে, ছত্রস্থ যাত্রীগণ জাগরিত হইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল এবং পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডা মহাশয় আসিয়া মঙ্গল আরত্রিক দর্শনে যাইবার নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করিলে নিদ্রাদেবী অলক্ষ্যে নেত্রদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পলায়ন করিলে সংজ্ঞাদেবী চৈতন্য লাভ করিলেন। অচেতন জড় দেহে শক্তির সঞ্চার হইল, আমিও উঠিয়া বসিলাম। মঙ্গল আরত্রিকেরবাদ্য শুনিয়া চক্ষে জল দিয়াই পাণ্ডাসহ তদ্দর্শনে চলিলাম।

ছত্রের সম্মুখেই প্রশস্ত রাজবর্ত্ম—পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা, ঐ রাজপথের পশ্চিম প্রান্তে মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের সু-উচ্চ গগনস্পর্শাকাঙ্খী গোপুর বা প্রবেশ দ্বার বিরাজিত। পশ্চিমমুখীন হইয়া এ গোপুর অতিক্রম করতঃ সুবিশাল বহিপ্রাঙ্গনে উপনীত হইলাম। মন্দিরের বহিপ্রাকারের চারিদিকেই প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ ফল ফুলে সুশোভিত রহিয়াছে। অন্যান্য বৃক্ষও আছে তবে নারিকেল বৃক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। মন্দিরের প্রশস্ত বহিপ্রাচীর প্রস্তর নির্ম্মিত; উচ্চ বিংশতি হস্ত। মধ্য প্রাচীর ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত, উচ্চ অষ্টাদশ হস্ত। চারিদিকে চারিটী গোপুর বা প্রবেশ দ্বার। এ প্রদেশে মন্দির অপেক্ষা গোপুর সকল অধিক উচ্চ। স্তরে স্তরে কোথায় ৮ তালা কোথায় ১০ তালা অট্টালিকার মত উচ্চ, দুই পার্শ্বে সিঁড়ি আছে তদ্বারা উপরে উঠা যায়। ইহা আবার নানাবিধ ভাস্কর কার্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে পরিপূর্ণ। ক্রমশঃ সরু হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। দূর হইতে অজানিত ব্যক্তির পক্ষে ইহাই মন্দির বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

বহিপ্রাকার এবং মধ্যপ্রাকারের মধ্যবর্ত্তী যে প্রাঙ্গণ তাহার মধ্যস্থলে কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ (আটচালার খুঁটির ন্যায়) দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যাত্রা ও উৎসব কালে ইহার উপর আচ্ছাদন দিয়া উৎসবক্রিয়া ও নৃত্য-গীতাদি সমাধা হয়।

যাইতে একান্ত ইচ্ছুক হইলে পাণ্ডামহাশয় অবশেষে তথায় লইয়া গিয়া আমাদের থাকিবার এক প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাটী চলিয়া আসিলেন।

শয়ন করিবার পূর্ব্বেই আমি একবার চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত সুবৃহৎ গোপুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুবিশাল বহিঃপ্রাঙ্গনাস্থিত কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ চতুর্দ্দিকে চাঁদনিযুক্ত শিবগঙ্গা নামক সরোবর ও তৎপার্শ্বস্থিত সহস্রস্তম্ভহল দর্শনে মনের আগ্রহাতিশয্য কতক পরিমাণে নিবারণ করিয়া ছত্রে আসিলাম। ছত্রে আসিয়াই শয়ন করিলাম; তখন প্রায় রাত্রি সার্দ্ধ তিন ঘটিকা।

শয্যাগত হইবার অব্যবহিত পরেই নিদ্রাদেবী মন্থর গমনে আগমন পূর্ব্বক চক্ষু দ্বার দিয়া দেহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অমনি নেত্রদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। মৃত্যু সহোদরা নিদ্রাকে দর্শন করিবা মাত্র মন্দিরসহ সংজ্ঞা দেবী ভীতা চকিতা ও মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। যে শক্তি প্রভাবে জীবের পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহ চলিয়া, ঘুরিয়া, ফিরিয়া বেড়ায়, যে শক্তি প্রভাবে মানবের "আমি" "তুমি" জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে এবং স্ব স্ব স্বার্থ চরিতার্থ জন্য সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে সেই শক্তি লোপ হওয়ায় আমার পাঞ্চভৌতিক উপকরণে নির্ম্মিত দেহ যষ্টি স্পন্দহীন হইয়া পতিত রহিল।

রজনী প্রভাত হইলে প্রভাকরের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইলে, ছত্রস্থ যাত্রীগণ জাগরিত হইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল এবং পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডা মহাশয় আসিয়া মঙ্গল আরত্রিক দর্শনে যাইবার নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করিলে নিদ্রাদেবী অলক্ষ্যে নেত্রদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পলায়ন করিলে সংজ্ঞাদেবী চৈতন্য লাভ করিলেন। অচেতন জড় দেহে শক্তির সঞ্চার হইল, আমিও উঠিয়া বসিলাম। মঙ্গল আরত্রিকেরবাদ্য শুনিয়া চক্ষে জল দিয়াই পাণ্ডাসহ তদ্দর্শনে চলিলাম।

ছত্রের সম্মুখেই প্রশস্ত রাজবর্ত্ম—পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা, ঐ রাজপথের পশ্চিম প্রান্তে মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের সু-উচ্চ গগনস্পর্শাকাঙ্খী গোপুর বা প্রবেশ দ্বার বিরাজিত। পশ্চিমমুখীন হইয়া এ গোপুর অতিক্রম করতঃ সুবিশাল বহিঃপ্রাঙ্গনে উপনীত হইলাম। মন্দিরের বহিঃপ্রাকারের চারিদিকেই প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ ফল ফুলে সুশোভিত রহিয়াছে। অন্যান্য বৃক্ষও আছে তবে নারিকেল বৃক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। মন্দিরের প্রশস্ত বহিঃপ্রাচীর প্রস্তর নির্ম্মিত; উচ্চ বিংশতি হস্ত। মধ্য প্রাচীর ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত, উচ্চ অষ্টাদশ হস্ত। চারিদিকে চারিটী গোপুর বা প্রবেশ দ্বার। এ প্রদেশে মন্দির অপেক্ষা গোপুর সকল অধিক উচ্চ। স্তরে স্তরে কোথায় ৮ তালা কোথায় ১০ তালা অট্টালিকার মত উচ্চ, দুই পার্শ্বে সিঁড়ি আছে তদ্দারা উপরে উঠা যায়। ইহা আবার নানাবিধ ভাস্কর কার্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে পরিপূর্ণ। ক্রমশঃ সরু হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। দূর হইতে অজানিত ব্যক্তির পক্ষে ইহাই মন্দির বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

বহিঃপ্রাকার এবং মধ্যপ্রাকারের মধ্যবর্ত্তী যে প্রাঙ্গণ, তাহার মধ্যস্থলে কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ (আটচালার খুঁটির ন্যায়) দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যাত্রা ও উৎসব কালে ইহার উপর আচ্ছাদন দিয়া উৎসবক্রিয়া ও নৃত্য-গীতাদি সমাধা হয়।

এই প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে সহস্র স্তম্ভ 'হল' এবং ঐ 'হলের' পশ্চিম পার্শ্বে শিবগঙ্গা নামক সরোবর। সরোবরের চারিদিকেই বেড়াইবার নিমিত্ত প্রশস্ত পথ। চারি কোণে চারিটী ও উত্তর দিকের চাঁদনি, বাঁধা ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্রাকারের সুন্দর মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে গণেশ ও শিব প্রভৃতির মূর্ত্তি বিরাজিত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের কোণে ২টী ও উত্তর দিকের মধ্যস্থানে একটী সরোবরে অবতরণ করিবার চাঁদনিযুক্ত ঘাট আছে। এই তিনটী ঘাট দিয়া অবতরণ করিয়া চারিদিকেই স্বচ্ছন্দে বেড়াইবার সোপানাবলী এবং চারিদিকেই চকমিলান অট্টালিকা বাটীর চকদালানের ন্যায় চারিদিকে ছাদযুক্ত দালান বর্ত্তমান। বর্ষার সময় তন্মধ্যে বৃষ্টি হইতে রক্ষা হওয়া যায় এবং গ্রীষ্মকালে দিবাতে বা রাত্রিতে তাহার মধ্যে সুখে অবস্থান বা শয়ন করিয়া থাকা যায়। সরোবরের চারিদিকই প্রস্তরে গ্রথিত এবং আকারে বৃহৎ না হইলেও অতি মনোহর এবং স্বাদুবারি, বিষ্ণুকাঞ্চির ও রামেশ্বরের মন্দির-মধ্যস্থ সরোবর অপেক্ষাও অধিক সৌন্দর্য্যশালী।

সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপ একটী বৃহৎ ব্যাপার; এ দেশের প্রধান প্রধান মন্দিরে এরূপ ধরণের একটী করিয়া মণ্ডপ আছে। তবে অনেকস্থলে সহস্র-স্তম্ভের পরিবর্ত্তে স্তম্ভসংখ্যা কম আছে। এ হল ঘ মণ্ডপের ব্যাপার বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। এই মন্দিরের উত্তর দিকে একটী দেব সভার স্থান। তাহার সম্মুখে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ কতকটা প্রশস্ত ফাঁকা স্থান আছে, বাকী দুই পার্শ্বস্তম্ভে পরিপূর্ণ। প্রস্তর যেমন প্রচুর, কারু-কার্য্যও সেইরূপ নানাবিধ। পূর্ব্বোক্ত সরোবরের পশ্চিম পার্শ্বে দেবীর মন্দির। এই মন্দির এক্ষণে সংস্কার হইতেছে। সরোবরের দক্ষিণ দিকে দেবের অর্থাৎ চিদম্বরম দেবের মন্দির। দেবের মন্দিরেরও স্থানে স্থানে সংস্কার হইতেছে। দেবালয়টী দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা অতি প্রাচীন কালের মন্দির এবং সমস্ত মন্দিরগুলি এক সময়ের নহে। কোন সময়ে কোন্ মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মেকেঞ্জি সাহেবের মতে ইংরাজি দশম শতাব্দিতে বিজয়রাজ-আদিত্যবর্ম্মা নামে কোন রাজা চিদম্বরের কালী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মধুরাওয়ের খ্যাতনামা বিশ্বনাথ নায়কের পৌত্র পেরিয়-বিরপ্পা ইংরাজি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাহিরের প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রায় একশত পঞ্চ বিংশতি বর্ষ হইল (১৭৮৫ খৃঃ) কোন ধন কুবেরের দানশীলা বিধবা রমণী দুইলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া উক্ত বহিঃপ্রাকার সংস্কার ও চারিটী গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

মধ্য প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী চিদম্বর দেবের দেবালয়ে বড় বড় চারিটী মণ্ডপ আছে;—১ম চিৎসভা; ২য় কনকসভা; ৩য় দেবসভা ও ৪র্থ নিবর্ত্ম সভা। ইহা ব্যতীত নটেশ্বর বা নটরাজ মহাদেবের একটী বৃহৎ মন্দির আছে; এই মন্দিরটীর উপানগুলি কৃষ্ণ প্রস্তরে গ্রথিত এবং ছোট ছোট কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত। এই মন্দিরের শিখরদেশ সুবর্ণ স্তবক দ্বারা আবৃত ও সুবর্ণ চূড়া দ্বারা পরিশোভিত। ইহার সম্মুখস্থ মণ্ডপটী রৌপ্য-

স্তবক দ্বারা আবৃত। এই মন্দিরটী দক্ষিণ দ্বারী সুতরাং ইহার সম্মুখেই দক্ষিণ দিকের গোপুর অবস্থিত। এই মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের পশ্চিম ভাগে অনন্তশয্যাশায়ী ভগবান বিষ্ণুর মন্দির। এই মূর্ত্তিটী শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর সদৃশ। অতি সৌম্য মূর্ত্তি ; দেখিলে প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়।

এই দেবালয়ে যত দেবতা আছেন তন্মধ্যে নটেশ্বর বা নটরাজ মহাদেবের পূজার আয়োজন, আড়ম্বর ও জাঁকজমক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই দেবের মূর্ত্তি মনুষ্যাকৃতি। এক পদের উপর দণ্ডায়মান, এক পদ শূন্যে উঠাইয়া রাখিয়াছেন।

স্থল পুরাণে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। এক সময়ে মহাদেব দেবীর সহিত নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং এক পদে নৃত্য করিয়া দেবীকে পরাজয় করেন। সেই হেতু তখন হইতে মহাদেব নটরাজ নামে অভিহিত হইয়া এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কে? বা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত? প্রভৃতি বহু প্রাচীন কালের তামসাচ্ছন্ন বিষয়গুলি সঠিক নির্ণয় করা অতীব কঠিন তবে মধুরাপুরীর স্থলপুরাণ হইতে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে মধুরাপুরী স্থাপয়িতা কুশলশেখর পাণ্ড্যার পৌত্রীর বিবাহ সভায় চিদম্বর হইতে ব্যাঘ্রপদ মুনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত মুনিবর প্রত্যহ নটরাজের নৃত্য দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। বিবাহান্তে অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ভোজনার্থে গমন করিলে উক্ত দ্বিজবর তাহাতে অসম্মত হন, সুন্দর লিঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া তত্রস্থ রৌপ্য মণ্ডপে নৃত্য দর্শন করাইলে তিনি ভোজন করিয়াছিলেন। স্থলপুরাণের মতে ইহা ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে কুশলশেখর রাজার পৌত্রীর বিবাহ ৫০০ শত খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীতে সম্পন্ন হয়। হিন্দুগণের প্রাচীন ঘটনাবলীর সময় নির্ণয় সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই এইরূপ গোলযোগ দেখা যায়। শেষোক্ত ঐতিহাসিক মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে এই মন্দির সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

এই নটেশ্বর মন্দিরের মণ্ডপে দুইটী বৃহদাকারের ঘণ্টা আছে। তাহা পূজা, আরত্রিক ও উপাসনা সময়ে কাপকলে করিয়া দুইজন লোকে বাজাইয়া থাকে। নটেশ্বর মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে অপর একটী মন্দিরে চিদম্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন। মাদ্রাজ প্রদেশে পঞ্চস্থানে মহাদেবের ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্ব্যোমাত্মক পঞ্চমূর্ত্তি বিশিষ্ট যে পঞ্চ বিখ্যাত শিবালয় আছে ইহা তাহার অন্যতম। এখানে শিবের চিদম্বর রূপ অর্থাৎ চিৎ বা জ্ঞান এবং অম্বর বা আকাশরূপী মহাদেব। এই মন্দির মধ্যে কোন বিগ্রহ নাই। তবে মধ্যস্থলে ডেক ঢাকা কি যেন আছে বলিয়া বোধ হইল। ২।৩টী দীপ জ্বলিতেছে। অম্বররূপী মহাদেব মানবের চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর। সাধারণ জনগণ এ মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। এই চিদম্বর মহাদেবের নাম হইতেই এই সহরের নাম চিদম্বর হইয়াছে।

এই মন্দিরের পশ্চিম দিকের গোপুর দিয়া বাহির হইয়া সম্মুখেই বিপণি শ্রেণী, হাট বাজার ও সহর, সহরকে এ দেশে পেট্টা কহে।

আমি পাণ্ডার অনুগমন করতঃ নটরাজ মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অর্চ্চক প্রাতঃকালীন আরত্রিক করিতেছেন। বাদ্যকরগণ মাঙ্গলিক বাদ্য-ধ্বনিতে ও পূর্ব্বোক্ত ঘণ্টা-ধ্বনিতে দেবালয় ও দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। দর্শকগণ কেহ মণ্ডপে কেহ প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিগদগদ নেত্রে ভগবানের প্রাতরারত্রিক ও প্রাতরুপাসনা দর্শন করিতেছেন। আমিও গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া আরত্রিক দর্শন করিতে লাগিলাম—আমার নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ; আমি ভাবিতে লাগিলাম ;—হে সচ্চিদানন্দ দেবাদিদেব মহাদেব, নিখিল চরাচর বিশ্ব সংসারের একমাত্র অধীশ্বর! তুমি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ, এমন কোন স্থান নাই যেখানে তোমার সত্বা নাই। সর্ব্বত্রই তোমার উপাসনা ও তোমার পূজা হইতেছে। আমরা সংসার-বদ্ধ জীব, সংসারের মোহ জালে এরূপ আবদ্ধ যে সংসারে থাকিয়া, স্বীয় নশ্বর বাসভবনে থাকিয়া তোমার পূজা, ধ্যান, ধারণা ও তোমার অতুল মহিমা উপলব্ধি করিতে সর্ব্বদা অক্ষম হইয়া থাকি। সেই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ তীর্থ-দর্শন ও তীর্থ-পর্য্যটন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তুমি স্বয়ম্ভু, একমাত্র স্বাধীন ও সর্ব্বময় কর্ত্তা, অন্যের আশ্রয় ব্যতীত নিজেই নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত ; তুমিই মঙ্গলময় বিধাতা এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র মূলীভূত কারণ। তোমাকে চিনিতে হইলে, তোমার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ও মহিমা জানিতে হইলে তোমারই উপাসনা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায়ে তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। উপাসনাই মানবাত্মার উন্নতির সোপান। তোমার উপাসনাই মানবকে দেবকল্প করিয়া থাকে। বিষয়মদে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি তোমাকে ভুলিল, তোমার উপাসনা, তোমার পূজা করিতে অবহেলা করিল, তাহার জীবন, ধন সম্পদ সকলই বৃথা ও অকিঞ্চিৎকর হইল। তাহার জীবন ও পশু-জীবনে কোন পার্থক্য নাই। যে মহাত্মা অতুল বিভবশালী হইয়া তোমার সেবার জন্য, তোমার পূজার জন্য তাঁহার অগাধ সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার অর্থলাভও সার্থক হইয়াছে। তোমার মৃণ্ময়, প্রস্তরময়, ধাতুময় বা মণিময় মূর্ত্তি ভক্তিসহকারে পূজা করিতে করিতে তোমার করুণাকণা লাভ করিতে পারিলে তোমার সাকার ও নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম রূপ, তোমার পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চমূর্ত্তি তোমার অষ্টমূর্ত্তি সমস্ত হৃদয় মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া প্রাণে অপার আনন্দ জাগিয়া উঠে। তখন তাহার আর কোন অভাব থাকে না। তখন সেই মহাত্মা আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন তখন সেই মহানুভব ব্যক্তি তোমার অপার জ্ঞান কৌশল, তোমার অসীম বুদ্ধিচাতুর্য্য, তোমার সৃষ্টিনৈপুণ্য ও তোমার অপূর্ব্ব লীলা-রহস্য দিব্যচক্ষে সন্দর্শন করিতে থাকেন। সহস্র বৎসর পুস্তকাদি পাঠ ও শাস্ত্র অধ্যয়নে যে জ্ঞান লাভ করিতে না পারা যায়, তোমার করুণা-কণা লাভ করিতে পারিলে, হে প্রসন্ন! হে আশুতোষ! তোমায় প্রসন্ন করিতে পারিলে, তোমায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, হে জ্ঞানাঞ্জন নিমেষমধ্যে সেই পবিত্রাত্মা মানব সেই দিব্য অপরিমেয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে। দর্শন-শাস্ত্রের বিনা

আলোচনায় তিনি তোমায় অধ্যাত্ম-রাজ্যে তোমার অলৌকিক ক্রীড়া দর্শনে বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়া পড়েন। তোমার প্রকৃতি-দেবীর সুরময়ী, ভাবময়ী অনন্ত প্রকাশ সন্দর্শনে মাতোয়ারা হইয়া আনন্দ হিল্লোলে নিমগ্ন হন।

তাই বলিতেছি তোমার মহিমা অপার, অনন্ত ও অপরিচ্ছেদ্য, তথাচ যে সকল প্রত্যক্ষ গোচরীভূত মহিমা আমাদের চর্ম্মচক্ষু সম্মুখে সতত বিরাজমান তাহা কয়জন ভাবিয়া থাকেন, কয়জন তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হন।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কথা দূরে থাকুক,—সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, সসাগরা পৃথিবী, অকুল জলনিধি, উত্তুঙ্গশৈলমালা, নদ, নদী, প্রস্রবণ, উপত্যকা এবং তরু, লতা, গুল্ম প্রভৃতির বিষয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন করিলে কি সেই জীবন্ত চৈতন্যময়ের সুমধুর প্রকাশ দর্শন হয় না? ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান দর্শন করিতে ইচ্ছা হইলে আর কোথাও যাইতে হইবে না, আত্মার অন্তরতম স্থানে এবং প্রকৃতিসাগরে নিমগ্ন হও তাহা হইলেই সেই সুর নরের আরাধ্য দেবদুর্লভ চিন্ময় শান্ত ও প্রেমানুরঞ্জিত মূর্ত্তি দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইবে। আবার তাঁহার প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাট মূর্ত্তিও তোমার নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে।

শুকদেব যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারিলেন না, বশিষ্ঠ ঋষি যাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সমাধা করিতে অপারগ হইলেন; বেদব্যাস যাঁহার চরিত্র-কাহিনী লিখিয়া শেষ করিতে পারিলেন না; নারদ ঋষি যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সমাপ্ত করিতে পারিলেন না; আরও কত শত মুনিঋষিগণ যুগযুগান্ত তাঁহার ধ্যান করিয়া ধ্যানের পিপাসা মিটাইতে পারিলেন না, এই কীটানুকীট বালুকণা সদৃশ এই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীবের দুর্ব্বল লেখনী হইতে এবং ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে সেই মহিমাময়ের মহিমা-বর্ণন বামনের সুধাকর ধারণের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কালের অধিক ব্যাপিয়া আরত্রিক হইল। এ প্রদেশে সমস্ত দেবমন্দিরে অন্যান্য প্রকারের আরত্রিকসহ কর্পূরারত্রিক হইয়া থাকে। আরত্রিক সমাধা হইলে সকলেই দেব সন্নিধানে প্রণাম পূর্ব্বক যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। আমরাও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতার্থ মনোরথ হইয়া ছত্রে আসিলাম।

ক্রমশঃ—

আগামী বারে সমাপ্য।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

সূচী।

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
বর্ণ চিত্রণ।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	৪৭
সূর্য্যমুখী।	শ্রী—	৫৩
একদিনের গবর্ণর।	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সোমাদ্দার।	৫৩
সমুদ্র।	শ্রীউমাচরণ মিত্র।	৫৬
অনুরোধ।	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।	৬৩
চিদম্বরম্।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।	৬৩

কণারকের অন্তর্গত অশ্বদ্বার

The Indian Art School, Bowbazar, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৯ম খণ্ড ❴ সন ১৩১৬—পৌষ। ❴৪র্থ সংখ্যা

বৃষভাষ্টকং।

মাতা যস্য শুভঙ্করী ভগবতী নাম্নাচলক্ষ্মীঃস্বয়ম্,
[illegible]গোবিন্দ ইতি স্বনাম বিদিতস্তাতঃ স্বয়ং মাধবঃ।
[illegible] বৃষভঃ কুকর্ম্ম নিরতোনাম্নাশুতোষশ্চয়ঃ,
[illegible]গ্যোবত রোরবীতি সততং সোহয়ং স্বয়ং সম্ভবঃ॥

(১)

বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠ বীর্য্যামিত করুণরস প্রত্নসর্ব্বাত্মবাস,
[illegible]নন্দাদ্বৈতভেজো হ[illegible]জিত সকল সুহৃৎস্বোদরস্থপ্রপঞ্চ।
[illegible]পৈকমূর্ত্তে হসিততনু পরমব্যোমরূপামিতাত্মন্,
[illegible]ভিরীশাগতিগতিদভবে তে নমোহস্তঙ্গনিত্যম্।

(২)

সো[illegible]হং মানস মানসেরসসরঃ সংসার সারঃ সতাম্,
[illegible]ষাং সরসার্থ সার্থশরণং [illegible]বস্তারসাস্বাদকঃ।
হংসোব্রহ্মশিবেন্দ্রবিষ্ণুবরুণাদিত্য প্রমুখৈ্যঃসুরৈঃ।
সংসেব্যোহপি সিতাসিতৈঃ স্বানয়তৈঃ ক্ষেত্রেহ-
ম্মিবদ্ধঃফলৈঃ।

(৩)

যাদেবী চিৎস্বরূপা কলয়তি সকলা দিঙ্‌মতৈ
দোর্ভিরাশা,
আত্মাশক্তিঃ সশক্তির্দময়তি দনুজং কামরূপং স্বশক্ত্যা।
যোগক্ষেমৌচ যানো ঘটয়তি বিধিবৎ স্বর্চ্চিতা সর্ব্বদাত্রী,
বন্দেতাং স্থিরভক্তিযোগসুলভাং কামদামাত্মমায়াম্॥

(৪)

ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং বহুগুণজননং ন স্মরামি প্রমত্তো,
বিত্তার্থংচেষ্টমানোহনুদিনমতিশয়ং ক্লেশভাগ্‌ব্যর্থকৃত্যঃ।
তেনাহংত্বাপরাধস্তবপদযুগলে প্রার্থয়াম্যল্প বুদ্ধিঃ,
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধোহর ভবদুরিতং কামরূপং গুরোমে॥

(৫)

শ্রীমন্নিত্যমনোরমং স্ব-বিরমং রামং মহো নিষ্কলম্,
বিদ্যাবুদ্ধিকরং স্বতোরসপরং সারং বরং নিশ্চলম্।
প্রাগ্ জন্মার্জ্জিত ধর্ম্ম্য কর্ম্ম সুলভং পাদং
গুরোর্নির্ম্মলম্,
বন্দেহহং সততং ভবাব্ধিতরণং মৃত্যুঞ্জয়ং কেবলম্॥

(৬)

সাধ্যং ব্রহ্মপরং ত্রিলোচনধরং বিশ্বেশ্বরং শঙ্করম্,
ধ্যানাতীতগতং স্বভাবনিয়তং বাচাতিগং নিশ্চিতম্।
বিদ্যাগম্যমগম্যমব্যয়পদং শ্রীমদ্গুরোঃসর্ব্বদম্,
বন্দেহহং সততং ভবাব্ধিতরণং মৃত্যুঞ্জয়ং কেবলম্॥

(৭)

ধ্যেয়ন্নিত্যমখণ্ডপূর্ণ সততানন্দপ্রদং শর্ম্মদম্,
ভাবাতীতমতংসতামবিমতং সারস্বতং শাশ্বতম্,
সংসারাব্ধিগতৈঃ সদামলমতৈর্যৎসাধকৈ র্মৃগ্যতে,
বন্দেহহং স্থিরভক্তিযোগসুলভং পাদং গুরোঃ কেবলম্॥

(৮)

ধ্যেয়ন্নিত্যমখণ্ডমণ্ডলযুতং জ্যোতিঃপরং শাশ্বতম্,
কূটস্থং দ্বিদলাব্জকোষবিলসদ্ব্যোমস্বতঃ সম্ভবম্।
নাসাগ্রস্থিতয়াবিলোক্যসুচিরং দৃষ্ট্যাচযৎকোবিদৈঃ,
বন্দে হহং স্থিরভক্তিযোগসুলভং পাদং গুরোঃ
কেবলম্॥

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

ভাস্কর্য্য।

(৩৬ পৃষ্ঠার পর)

বহুদিন হইতে আমি এই নীরস প্রাচীন ভাস্কর্য্য বিষয়ে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। পাঠকগণ হয়ত ইহা পাঠে ক্রমশই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন, এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়াই যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহা সম্পন্ন করিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু বিষয় এতই গুরুতর ও বিস্তৃত যে, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও সত্বর শেষ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক পাঠকগণের নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারা আর সামান্য ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তভাবেই ধ্বজ, পতাকা, যান ও বাহনাদি সম্বন্ধে আর কয়েকটী বিষয় যাহা বলিবার আছে তাহা বলিয়াই এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পতাকা।

ধ্বজ পতাকা সম্বন্ধে প্রাচীন ভাস্কর্য্যের অন্তর্গত যেমন বহু আদর্শ প্রত্যহ প্রত্যক্ষীভূত হয়, প্রাচীন শাস্ত্রমধ্যেও সেইরূপ তাহার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম মন্দির প্রাসাদ রণ ও রাজনীতি প্রভৃতি প্রায় সকল কার্য্যের মধ্যেই অতি প্রাচীন সময় হইতে ধ্বজ পতাকার ব্যবহার প্রচলিত আছে। ধ্বজ, পতাকা ও কেতনাদি বহু শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যমধ্যে প্রচলিত আছে, এগুলি নিশ্চয়ই একার্থ বাচক শব্দ নহে। আমরা উহার অনুষ্ঠান ও ব্যবহার অভাবে উহাদের পরস্পর স্বাতন্ত্র্যতা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতীচ্য প্রদেশ মধ্যে Flag ও Banner প্রভৃতির যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের দেশে ইহার যতটুকু প্রচলন আছে তাহাতে মনে হয় মন্দির ও প্রাসাদাদির উচ্চ চূড়ার উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা আকারেও বৃহৎ তাহাই ধ্বজ নামে অভিহিত এবং যে গুলি আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বাহক হস্তে বাহিত হয়, তাহাই পতাকা নামে পরিচিত। এসম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ মধ্যে কিঞ্চিৎ আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্বজারোহণ অধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে প্রাসাদাদি প্রতিষ্ঠার পর ধ্বজারোহণ কার্য্য সমাধা করিবে। অনন্তর ইহার প্রক্রিয়া ও পরিমাণাদি বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসাদস্য প্রতিষ্ঠান্তু ধ্বজরূপেণ মে শৃণু।
ধ্বজং কৃত্বা সুরৈর্দৈত্যা জিতাঃ শস্ত্রাদিচিহ্নিতম্॥
অণ্ডোহর্দ্ধং কলসং ন্যস্য তদূর্দ্ধং বিন্যসেদ্ধ্বজম্।
বিম্বার্দ্ধমানং দণ্ডস্য ত্রিভাগেনাথ কারয়েৎ॥
অষ্টারং দ্বাদশারং বা মধ্যে মূর্ত্তিমতান্বিতম্।
নারসিংহেন তার্ক্ষ্যেণ ধ্বজদণ্ডস্য নিব্রণঃ॥
প্রসাদস্য তু বিস্তারো মানং দণ্ডস্য কীর্ত্তিতম্।
শিখরার্দ্ধেন বা কুর্য্যাৎ তৃতীয়ার্দ্ধেন বা পুনঃ॥
দ্বারস্য দৈর্ঘ্যার্দ্বিগুণং দণ্ডং বা পরিকল্পয়েৎ।
ধ্বজযষ্টি দেবগৃহে ঐশান্যাং বায়বেহথবা॥
ক্ষৌমাদ্যৈশ্চ ধ্বজং কুর্য্যাৎ দ্বিচিত্রং বৈকবর্ণকম্।
ঘণ্টা চামর-কিঙ্কিণ্যা ভূষিতম্ পাপনাশনম্।
দণ্ডাগ্রাদ্ধরণীং যাবদ্ধস্তৈকং বিস্তরেণ তু।
মহাধ্বজঃ সর্ব্বদা স্যাৎ তুর্য্যাংশার্দ্ধীনতোহর্চ্চিতঃ॥
ধ্বজ শ্চার্দ্ধেন বিজ্ঞেয়ো পতাকা মানবর্জ্জিতা।
বিস্তারেণ ধ্বজঃ কার্য্যো বিংশত্যঙ্গুলিসম্মিতঃ॥ ৩৫

অগ্নিপুরাণ ধ্বজারোহণ অধ্যায় ২৮ হইতে ৩৫ শ্লোক।

আমার নিকট হইতে ধ্বজরূপে প্রসাদ প্রতিষ্ঠা শ্রবণ কর। সুরগণ শাস্ত্রাদিচিহ্নিত ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়া দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়াছিল। অণ্ডের উর্দ্ধে কলস ও কলসের উর্দ্ধে ধ্বজ স্থাপিত করিবে। দণ্ডের ধ্বজ প্রতিবিম্বের অর্দ্ধ পরিমাণ অথবা ত্রিভাগ পরিমাণ ধ্বজের মধ্যে মন্ত্রাত্মক মূর্ত্তিমান নরসিংহ বা গরুড় যুক্ত অষ্টদল অথবা দ্বাদশদল চক্র নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রকার করিলে দোষশূন্য ধ্বজদণ্ড নির্ম্মিত হয়। প্রাসাদের বিস্তার অনুসারে, দণ্ডের পরিমাণ হয়। শিখরের অর্দ্ধ পরিমাণ বা তৃতীয়ার্দ্ধ পরিমাণ অথবা দ্বারদেশের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ পরিমাণে দণ্ড কল্পনা করিবে। দেবগৃহের ঈশান কোণে বা বায়ু কোণে ধ্বজ যষ্টিরক্ষা করিবে। কৌষেয় বস্ত্র দ্বারা বিচিত্র বা একবর্ণ ধ্বজ নির্ম্মাণ করিবে। ধ্বজ ঘণ্টা, চামর ও কিঙ্কিনী (ছোটঘণ্টা) দ্বারা ভূষিত হইলে, পাপ নাশক হয়। দণ্ডাগ্র হইতে ধরণী পর্য্যন্ত এক হস্ত বিস্তৃত মহাধ্বজ সর্ব্বকামপ্রদ। ন্যূনপক্ষে চতুর্থাংশের অর্দ্ধভাগ পরিমিত ধ্বজ অর্চ্চনার যোগ্য। পতাকার কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ নাই। ধ্বজ বিংশতি অঙ্গুলি বিস্তৃত হইবে।

মন্দির ও প্রাসাদ শীর্ষের অনুরূপ দেবতা ও বিশিষ্ট রথাদিগের রথের উপরেও ধ্বজ সান্নবেশিত হইত। যে কোনও প্রাচীন গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। বৃষধ্বজ বা বৃষকেতন, গরুড়ধ্বজ বা গরুড়কেতন, কপিধ্বজ ও সীতাধ্বজ প্রভৃতি শব্দের প্রচলনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সকল পতাকার আকার ও গঠন সম্বন্ধে ভাস্কর্য্যমধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। এ দেশে চিরদিনই কোণমুখী বা ত্রিকোণাকার পতাকার প্রচলন রহিয়াছে। ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মন্দিরগাত্রেও ঐরূপ খোদিত রহিয়াছে—তাহা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এখনও ভারতে হিন্দু বা মোসলমানের যে কোনও ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে যে সকল শোভা-যাত্রা বহির্গত হয়, তাহাতে ত্রিকোণাকার পতাকাই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। তবে প্রাচীন সময়ে ভারতে বৃটীশ পতাকার ন্যায় চতুষ্কোণ পতাকা যে ছিল না তাহাও একবারে বলিতে পারা যায় না। সুপ্রাচীন শাঁচীর ভাস্কর্য্যমধ্যে একটী চতুষ্কোণ পতাকার আদর্শ দেখা গিয়াছে। কানিংহাম সাহেবের ভিলসাস্তূপের (Cunning ham's Bhilsa Topes) মধ্য হইতে দুইটী বিচিত্র চতুষ্কোণ পতাকার আদর্শ পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে এস্থলে প্রদত্ত হইল।—

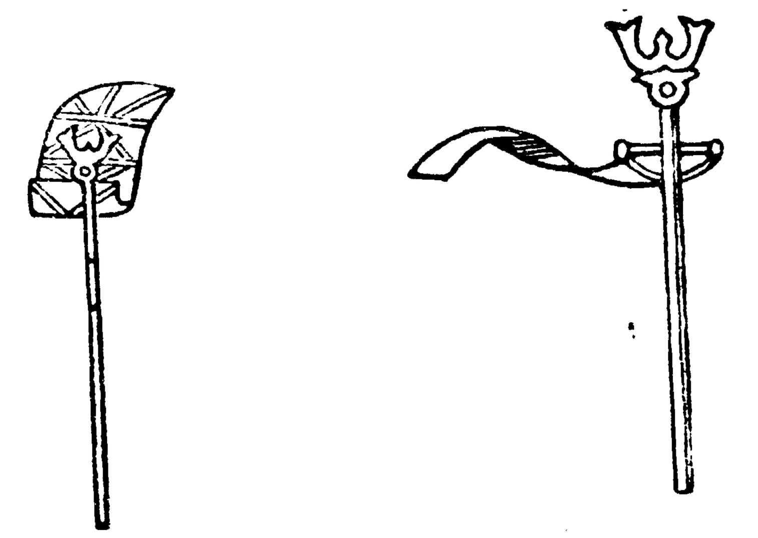

এই চিত্রস্থিত পতাকা শীর্ষে যে ত্রিশূলাকার চিহ্ন দেখা যাইতেছে তাহা দ্বারা ভারতীয় পতাকাবলীর আর একটী বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে, বৃষকেতন, কপিধ্বজ আদি শব্দের উল্লেখ করিয়াছি তাহার অর্থ আর কিছুই নহে—সাধারণ ত্রিকোণাকারবিশিষ্ট কেতনাদির উপর বা শীর্ষে এই চিত্রাঙ্কিত ত্রিশূলের ন্যায় বৃষ, কপি ও সর্প আদির মূর্ত্তি চিহ্ন (Crescents) চূড়রূপে রক্ষিত হইত। মহাভারতাদি পাঠে তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। অর্জ্জুনের রথোপরিস্থিত ধ্বজশীর্ষে হনুমান মূর্ত্তি, দুর্য্যোধনের সর্প মূর্ত্তি, কৃপের বৃষ মূর্ত্তি চিহ্নিত ছিল। এতদ্ব্যতীত হরিবংশ ও রামায়ণ পাঠে জানিতে পারা যায়, পতাকার বস্ত্রখণ্ড মধ্যে পক্ষী আদি নানা জীব জন্তুর চিত্রও অঙ্কিত থাকিত। রাজর্ষি জনকের পতাকার বস্ত্রখণ্ড মধ্যে সীতা বা কর্ষণযন্ত্র অর্থাৎ লাঙ্গলের চিত্র অঙ্কিত থাকিত, সেই কারণ তিনি সীতাধ্বজ নামে অভিহিত ছিলেন। পতাকার বস্ত্র সম্বন্ধেও অগ্নি পুরাণাদিশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য তাঁহাদের পতাকার বর্ণও পৃথক হইত এবং সাধারণতঃ কার্পাস বস্ত্র ইহাতে ব্যবহৃত হইলেও অনেক সময় রেশমের কাপড়েরও প্রচুর ব্যবহার ছিল। কুমার সম্ভবের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, গিরিরাজ হিমালয়, দুহিতার বিবাহ উপলক্ষে নিজ প্রাসাদোপরি যে পতাকা শোভিত করিয়াছিলেন তাহার বস্ত্র খণ্ড চীন দেশ হইতে আনিত এবং তাহা রেশম সূত্রেই প্রস্তুত।

প্রতীচ্য প্রদেশপরিচিত (Banners) ব্যানারের অনুরূপ আমাদিগের জয়পতাকা বিজয়কেতন প্রভৃতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল।

অগ্নিপুরাণ মধ্যে শিব শক্তি ও বিষ্ণুমন্দিরের

ধ্বজাদি সম্বন্ধে বিবিধ বিধান ও উহার পরিমাণ অনুসারে তাহার স্বতন্ত্র নামেরও উল্লেখ আছে।

তড়াগার্দ্ধ প্রবেশাদ্বাযদ্বা সর্ব্বার্দ্ধবেশনাৎ।
ঐষ্টকে দারুজঃ শূলঃ শৈলজেধাম্নি শৈলজঃ॥
বৈষ্ণবাদৌ চ চক্রাঢ্যঃ কুম্ভঃ স্যান্মূর্ত্তিমানতঃ।
স চ ত্রিশূল যুক্তস্তু অগ্রচূলাভিধো মতঃ॥
ঈশঃশূলঃ সমাখ্যাতো মূর্দ্ধ্নি লিঙ্গসমন্বিতঃ।
বীজপূরকযুক্তো বা শিবশাস্ত্রেষুতদ্বিধঃ॥
চিত্রো ধ্বজশ্চ জঙ্ঘাতো যথা জঙ্ঘর্দ্ধতো ভবেৎ।
ভবেদ্বা দণ্ডমানস্তু যদি বা তদ্ যদৃচ্ছয়া॥
মহাধ্বজঃ সমাখ্যাতো যস্তু পীঠস্য বেষ্টকঃ।
শক্রৈগ্র্হৈ রসৈর্ব্বাপি হস্তদণ্ডস্তু সম্মিতঃ॥
উত্তমাদি ক্রমেণৈব বিজ্ঞেয়ঃ সূরিভিস্ততঃ।
বংশজঃ শালজাদির্ব্বা স-দণ্ডঃসর্ব্বকামদঃ॥
অয়মারোপ্যমানস্তু ভঙ্গমায়াতি বৈ যদি।
রাজ্ঞোঽনিষ্টং বিজানীয়াদ্‌যজমানস্য বা তথা।
মন্ত্রেণ বহুরূপেণ পূর্ব্ববচ্ছান্তি মাচরেৎ॥

তড়াগার্দ্ধপ্রবিষ্ট অথবা সর্ব্বার্দ্ধ প্রবিষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত দেবগৃহে (শিবগৃহে) দারুময় শূল ও প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবগৃহে প্রস্তর নির্ম্মিত শূল দেওয়া কর্ত্তব্য। বিষ্ণুমন্দিরের চূড়া মূর্ত্তিপ্রমাণ কুম্ভচক্র দ্বারা শোভিত করিবে। সেই ত্রিশূলযুক্ত মন্দির অগ্রচূড় নামে খ্যাত। শিবশাস্ত্রে উক্ত আছে—যে মস্তকে লিঙ্গযুক্ত বা বীজপূরক যুক্ত ঈশ, শূল নামে সমাখ্যাত। চিত্রধ্বজ জঙ্ঘাপরিমিত বা জঙ্ঘার্দ্ধ পরিমিত অথবা দণ্ডপ্রমাণ কিংবা স্বেচ্ছামত করিবে। যে ধ্বজা দ্বারা পীঠবেষ্টন করা যাইতে পারে, যাহার দণ্ড উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপে চতুর্দ্দশ, নবম এবং ষড়হস্ত পরিমিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে মহাধ্বজ বলিয়া থাকেন। বংশনির্ম্মিত বা শালকাষ্ঠজাত ধ্বজদণ্ড সর্ব্বফলপ্রদ। ঐ দণ্ড স্থাপন কালে যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহা হইলে রাজার ও যজমানের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বের ন্যায় বিবিধ প্রকার মন্ত্রের দ্বারা শান্তি করিবে।

যান ও বাহন।

ভারতের প্রাচীন যান ও বাহন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় অশ্ব, গজ, রথ, ও নৌ আদিই সে কালে বিশেষ প্রচলিত ও সম্মানার্হ যান বলিয়া পরিচিত ছিল। এই সকল যানের মধ্যে অশ্বই আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রথম যান বা বাহন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেই বৃদ্ধ বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অশ্বযানের সমান আদর চলিয়া আসিতেছে। আর্য্যদিগের আদিম স্থান যদ্যপি মধ্য এসিয়া বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় (ইহা পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকদিগেরই অভিমত, আমার ধারণা অন্যরূপ, তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে যত্ন করিব) তাহা হইলে তাঁহারা ভারতে প্রথমে আসিবার সময় অশ্বারোহণেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অশ্বও সে সময় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল। অনেকে অনুমান করেন বর্ত্তমান সময়ের আরবদেশীয় বিশ্ববিশ্রুত অশ্বসকল আর্য্যদিগের দ্বারা আনীত বিশ্বশ্রবাসম সেই প্রাচীন অশ্বজাতীরই বংশধর। যাহা হউক পূজনীয় আর্য্যগণ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হস্তিগুলিকেও শ্রেষ্ঠ যানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের

ঐরাবত্ত প্রভৃতিই তাহার পরিচয়-স্থল। কিন্তু অচির-কাল মধ্যে রথের আবিষ্কার হইলে অশ্ব ও হস্তির মর্য্যাদা যেন কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তবে মহাভারতের সময় রথের ন্যায় গজেরও যথেষ্ট সম্মান বর্ত্তমান ছিল, কুরুক্ষেত্র সমরে মহাবীর ভগদত্ত, মহারাজ দুর্য্যোধন প্রভৃতি স্ব স্ব গজপৃষ্টে আরূঢ় হইয়াই সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, মহাভারতের সেই সুপরিচিত বর্ণনা হইতেও তহো স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক অশ্ব ও গজ সম্বন্ধে আর্য্যদিগের অভিজ্ঞতাও যে যথেষ্ট ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুদূর অতীতযুগে অশ্বই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান যান বলিয়া আর্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল; তাহা পবিত্র ও প্রাচীন ঋগ্বেদের মধ্যেও নানাস্থানে নানাভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা অশ্বপালন এবং পরিচালন বিষয়েও যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের নানা গ্রন্থে আনুসঙ্গিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিতেও তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই।

অসুরাচার্য্য উশনা তাঁহার 'শুক্রনীতি' গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

অশ্বানাং হৃদয়ং বেত্তি জাতিবর্ণভ্রমৈর্গুণান।
গতিং শিক্ষাং চিকিৎসাঞ্চ সত্বং সারং রুজং তথা॥
হিতাহিতং পোষণঞ্চ মানং যানং দতোবয়ঃ।
শূরশ্চব্যূহবিৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যোশ্বাধিপতিশ্চ সঃ॥
এভির্গুণৈশ্চ সংযুক্তোধুর্য্যান্ যুগ্যাংশ্চ বেত্তিযঃ।
রথস্ত সারং গমনং ভ্রমণং পরিবর্ত্তনম্॥
সমাপৎসু শস্ত্রাস্ত্রলক্ষ্য সন্ধান নাশকঃ।
রথগত্যা সরথপোহয়সংযোগগুপ্তিবৎ॥
সাদিনশ্চ তথাকার্য্যাঃ শূরাব্যূহবিশারদাঃ।
বাজিগতিবিদঃ প্রাজ্ঞা শস্ত্রাস্ত্রৈর্যুদ্ধকোবিদাঃ।
চক্রিতং রেচিতং বলগিতকং ধৌরিত মাপ্লুতম্।
তুরং মন্দঞ্চকুটিলং সর্পণং:পরিবর্ত্তনম্॥
একাদশাস্কন্দিতঞ্চ গতীরথস্ত বেত্তিযঃ।
যথাবলং যথার্থঞ্চ শিক্ষয়েৎসচশিক্ষকঃ॥
বাজিসেবাসুকুশলঃ পল্যাণাদিনিয়োবিৎ।
দৃঢ়াঙ্গশ্চতথাশূরঃ সকার্য্যোবাজিসেবকঃ॥"

শুক্রনীতি দ্বিতীয় অধ্যায়
১২৯—১৩৬ শ্লোক।

"অর্থাৎ যিনি অশ্বগণের মন, জাতি, বর্ণ ও ভ্রমণের দ্বারা গুণাগুণ, গতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, বল, ক্ষমতা, রোগ, হিতাহিত, পোষণ, পরিমাণ, বাহন, দন্ত, এবং বয়ঃক্রম পরিজ্ঞানশীল হইয়া বলবান সৈন্য বিন্যাসে পারদর্শী এবং বুদ্ধিমান্ তিনিই অশ্বাধিপতির কার্য্যে উপযুক্ত। নৃপতিগণ এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে অশ্বাধিপতি নিযুক্ত করিবেন। যে সকল ব্যক্তি অশ্বের পূর্ব্বোক্ত মনোভাবাদি পরিজ্ঞাত থাকিয়া তাহাদের ভার বহন শক্তি; রথের দৃঢ়তা, গতি, ভ্রমণ ও পরিবর্ত্তন পরিজ্ঞানশীল এবং রথের গতিদ্বারা সমাগত অস্ত্রশস্ত্রের লক্ষ্য ও সন্ধানকে নিস্ফল করিয়া প্রতিবলের মিলিত অশ্ব হইতে স্বপক্ষের অশ্ব রক্ষা করিতে সমর্থ তাঁহাদিগকে সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। যাঁহারা বলবান্, ব্যূহবিদ্যায় বিশারদ, অশ্বগণের চক্রিত বা ঘুরাইয়া লওয়া, রেচিত বা পশ্চাদ্গতি পিছাইয়া লওয়া, বল্গিত বা উল্লম্ফন, ধৌরিত অগ্রাতি ও আপ্লুত বা লম্ফন, শীঘ্র ওধীর গমন, বক্র ও গতিপ্রভেদ, পারিবর্ত্তন এবং আস্কন্দন অর্থাৎ শত্রুর প্রতি আক্রমন এই একাদশ প্রকার গতিতে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, অস্ত্রশস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী তাহাদিগকে অশ্বারোহী কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। যে ব্যক্তি অশ্বের চক্রিত, আদি পূর্ব্বোক্ত একাদশ গতিতে পরিজ্ঞানশীল হইয়া অশ্বকে ঐ সকল গতিতে শিক্ষিত করিতে সমর্থ তিনিই অশ্বশিক্ষক হইবার উপযুক্ত। যে সকল ব্যক্তি অশ্বপরিচর্য্যায় ও অশ্বসজ্জায় সুনিপুণ, কঠিন দেহ ও বলবান তাহাদিগকে অশ্বসেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।"

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সে কালে অশ্ব সম্বন্ধে কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল। তখন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ গো, অশ্ব, হস্তী ও রথাদি নিজ নিজ সম্পত্তির ধনরত্নাদির ন্যায় মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন।

উৎকৃষ্ট অশ্বের বর্ণ-সম্বন্ধে অনেক স্থানে অনেক কথা লিখিত আছে কিন্তু বৈদিক যুগে সূর্য্যের অরুণ বর্ণসম (Chestnut) বাদামী বর্ণের অশ্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিল। আরব দেশীয় অশ্ব সম্বন্ধেও এই বিশ্বাস এখনও বদ্ধমূল আছে। "পক্ষীরাজ ঘোঁড়া" বলিয়া আমাদের দেশে যে কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ প্রমাণ কোথাও দেখা যায় না। হইতে পারে কোন সময়ে সেরূপ কোন জীব জগতীতলে বাস করিত, কারণ বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বরাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই! কত জীব পূর্ব্বে ছিল এখন তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই, আবার হয়ত কত নূতন জীবের আবির্ভাব হইবে যাহা পরবর্ত্তী যুগের মানব সমাজ দেখিয়া কোনরূপ আশ্চর্য্যই অনুভব করিবে না। যাহা হউক পক্ষীরাজ অশ্ব সম্বন্ধে আমার যতদূর ধারণা হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী অশ্বকেই ঐরূপ আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষ পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণ অরুণবর্ণের অশ্বই প্রকৃত পক্ষীরাজের উপযুক্ত। কারণ আরব দেশের মধ্যে এখনও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে,—যদি কেহ বলে "আকাশে পাখীর ন্যায় একটী ঘোঁড়াকে উড়িতে দেখিলাম" এবং সেই ঘোঁড়ার বর্ণ কি এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে যদি 'অরুণ বর্ণ' বলিয়া উত্তর দেয়, তাহা হইলে তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে আরব দেশেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বের গুণবর্ণনায় পক্ষীর অনুরূপ দ্রুতগামী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে ঠিক সেইরূপ অরুণ বর্ণের অশ্ব দেখাযায় কি না বলিতে পারি না। অশ্ববিদ্‌গণ তাহার উত্তর দিতে পারেন।

কোন কোনও প্রাচীন গ্রন্থে অরুণ বর্ণ ব্যতীত দুগ্ধফেন সদৃশ শুভ্র বর্ণ অশ্বেরও শ্রেষ্ঠত্বসম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের মধ্যে শুলদার অশ্বের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। 'ললিত বিস্তার' গ্রন্থে কৃষ্ণধূসর (Iron grey) বর্ণের অশ্বের আরোহী সর্ব্বত্র বিজয়ী বলিয়া বর্ণিত আছে। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ সবিতা দেবতা শুভ্রোজ্জ্বল সৌররথে পরিভ্রমণ করেন, সেই রথের সারথী স্বয়ং অরুণ দেব এবং সপ্তবর্ণের সাতটী অশ্ব তাহাতে নিয়োজিত থাকে। এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং প্রাচীন ভাস্কর্য্য মধ্যে এই সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিলেই সে কালের অশ্বের গঠন, তাহার জীন (Saddle) ও সাজ (Harness) প্রভৃতি অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে। উৎকল

প্রদেশান্তর্গত পঞ্চতীর্থ মধ্যে অর্ক তীর্থ বা 'কোণার্ক' সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকের জানা নাই, এইটীই ভারতের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র সূর্য্যতীর্থ। প্রসঙ্গক্রমে পাঠকগণকে তাহার দুই একটী কথা এস্থলে বলিতে ইচ্ছা করি। ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী

চিদম্বরম্।

(৭০ পৃষ্ঠার পর)

বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুক্ষণ পরেই আমাদের পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন যে, দেবতার হীরকময় ও মণিময় মূর্ত্তির পূজা, অভিষেক ও ভোগ দর্শন করিতে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে ন্যূনকল্পে দ্বাদশমুদ্রা লাগিবে। সকলে ইহা করে না এবং সকলকে উক্ত মূর্ত্তির অভিষেকাদি দর্শন করিতে দেওয়া হয় না। যাহা হউক আমরা সংখ্যায় অনেকগুলি ছিলাম, সকলে মিলিয়াই পাণ্ডার কথিত মুদ্রা দিতে সম্মত হইলে, তিনি তাহার আয়োজন জন্য চলিয়া গেলেন। আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনে উদ্যোগী হইলাম। তৎসমাপনান্তে আমরা ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত শিবগঙ্গায় স্নানার্থে গমন করিলাম।

শিবগঙ্গার অপর নাম হেমতীর্থ, ইহা একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে উক্ত। সকল যাত্রীই ইহাতে স্নান করিয়া থাকেন। জলের বর্ণ সবুজ; এ প্রদেশে প্রধান প্রধান মন্দির সংলগ্ন যে সকল সরোবর আছে প্রায় সকল গুলিরই জলের বর্ণ সবুজ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানা বা শৈবাল জন্মিলে যেরূপ হইয়া থাকে ইহা সেইরূপ। কেবলমাত্র তঞ্জাবুরের মন্দির সংলগ্ন শিবগঙ্গার জল বর্ষাকালীন গঙ্গাবারি সদৃশ ও অতি সুমিষ্ট। এই হেতু সেই জল সহরের অধিকাংশ লোকই পানার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই মন্দির মধ্যে আর চারিটী কূপ আছে, তাহার জল পানার্থে ব্যবহৃত হয়।

আমরা স্নান করিয়া সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ ও অপরাপর কতিপয় দেবমন্দির দর্শন করিয়া ছত্রে আসিলাম। তৎপরে পাণ্ডাঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদিগকে অভিষেক দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। এক্ষণে পাণ্ডা সম্বন্ধে পাঠকগণকে কিছু বলা আবশ্যক। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের তীর্থস্থানের ন্যায় এখানে পাণ্ডার তদ্রূপ প্রাদুর্ভাব বা হুড়াহুড়ী পেড়াপীড়ি নাই। সংখ্যাতেও কম। এখানকার ব্রাহ্মণগণের উপাধি দীক্ষিত। আমাদের এই পাণ্ডার নাম শ্রীশৈলগণপতি দীক্ষিত। ইহারা তিন সহোদর, ইনি জ্যেষ্ঠ; মধ্যম ও কনিষ্ঠের নাম যথাক্রমে শ্রীসুন্দর তাণ্ডব দীক্ষিত ও শ্রীকৈলাশ দীক্ষিত। প্রথম যাত্রিগণের তত্ত্বাবধারণ প্রভৃতি বাহিরের কার্য্য করিয়া থাকেন। শেষোক্ত ভ্রাতৃদ্বয় দেবালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এখানকার প্রচলিত ভাষা অবিমিশ্র তামিল। বাহরমপুর গঞ্জাম হইতে মাদ্রাজ সহর পর্য্যন্ত টেলেগু (Telegu) ভাষার প্রচলন আছে। মাদ্রাজ সহরে টেলেগু ও তামিল ভাষা সমভাবে প্রচলিত আছে। মাদ্রাজ পার হইয়াই অবিমিশ্র তামিল ভাষার প্রচলন। কয়েক

বার ওয়ালটেয়ার ও বিশাখপত্তন আগমনে টেলেগু ভাষার কতক কতক বুলি শিক্ষা করায় এবং ঐ ভাষার স্বর কর্ণে একপ্রকার অভ্যস্থ হইয়াছিল। এক্ষণে একটী স্বতন্ত্র নূতন অবোধগম্য ভাষা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে আমাদের পাণ্ডা কিঞ্চিৎ হিন্দিভাষা জানায় কথোপকথনে আমাদের অসুবিধা ঘটে নাই।

দক্ষিণ ভারতে চারিটী প্রধান ভাষা প্রচলিত— টেলেগু, তামিল, মালওয়ারি ও ক্যানারি। ঐ সকল ভাষার মধ্যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য অতি অল্প। একটী ভাষা জানিলে বা শিক্ষা করিলে অপরটী সহজে বুঝা কঠিন। নিম্নোক্ত দুই চারিটী বাক্যের দ্বারা তাহা সহজে প্রতীয়মান হইবে। টেলিগু ভাষায় তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করিতে হইলে বলিতে হইবে— "নি পেরু এমি" কিন্তু ডাকিলে বলিতে হইবে— "উণ্ পের এন্না"। টেলিগু নিলু অর্থে জল, তামিল তন্নি অর্থে জল।

এদেশের কুলি, গাড়োয়ান প্রভৃতি লোকেরা কিছু ইংরাজী ও হিন্দি বুলি জানায় যাত্রিগণের কতকটা "বাঁচোয়া"। এখানকার অনেকেই ইংরাজী জানেন, ইংরাজী ভাবাভিজ্ঞ লোকের পক্ষে কোন কষ্ট হয় না।

বেলা প্রায় দশঘটিকার সময় আমরা পাণ্ডাসহ অভিষেক দর্শনার্থে গমন করিলাম। যখন আমরা অভিষেক দর্শনে যাইতেছি তখন দেবতার ভোগমূর্ত্তি বা উৎসবমূর্ত্তি বাজনা বাদ্যসহ একটী সুসজ্জীকৃত মাতঙ্গপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া বাহিরে যাইতেছেন। পশ্চাতে দুইটী সুসজ্জীকৃত উষ্ট্রও আছে। অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় দেবতার হস্তী, উষ্ট্র, গাভী, নর্ত্তকী প্রভৃতি দেব-সেবার জন্য নিযুক্ত আছে।

আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে তখন আবার নটরাজ মন্দিরে আরত্রিক হইতেছে; মন্দিরের পার্শ্বদিয়া যে সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। আরত্রিক সমাপন হইলে মন্দিরের সম্মুখস্থ মণ্ডপে অভিষেকের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। অভিষেকের জন্য শিবগঙ্গা হইতে একটী পিত্তলের বড় কুণ্ডা করিয়া এক কুণ্ডা জল একটী বড় কুণ্ডা করিয়া এক মণ দুগ্ধ এবং অন্যান্য পাত্রে দধি মধু ইত্যাদি অভিষেকের জন্য আসিতে লাগিল। দেবতার বসিবার জন্য রৌপ্যাসন এবং অর্চ্চক বা পূজারির জন্য কারপেটাসনাদিও কাষ্ঠাসন আসিল। তৎপরে একটী রৌপ্য বাক্স আসিল তন্মধ্যে হিরকনির্ম্মিত মহাদেব (বাণলিঙ্গ) অবস্থিত। বহু মূল্য মণিমানিক্য খচিত সুবর্ণ বলয়, অনন্ত ও হার আদি অলঙ্কার দ্বারা পরিশোভিত শিখাধারী মুণ্ডিত মস্তক শশ্রুবিহীন অর্চ্চক মহারাজ আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আটজন স্তুতি গায়ক বা বেদ পাঠক আসিয়া চারি দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। অর্চ্চক হীরক-শিবলিঙ্গ পূর্ব্বোক্ত বাক্স হইতে বাহির করিয়া রৌপ্যাসনে স্থাপন করাইয়া যথাক্রমে জল দুগ্ধ, জল মধু, জল দধি, জল ঘৃত জল ইত্যাদিদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অভিষেক করিতে লাগিলেন, এক জন অর্চ্চকের সহকারী সমস্ত বস্তু তাঁহার হাতে দিতে লাগিলেন। আর পূর্ব্বোক্ত আট জন স্তুতিপাঠক বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভোগের নিমিত্ত দ্রব্যাদি আসিতে লাগিল। অভিষেক শেষ হইলে দর্শকদিগকে বাহিরে যাইতে

বলিলেন, তাহারা বাহিরে যাইলে দার বন্ধ হইয়া ভোগ হইতে লাগিল। সেই সময়ে মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। ভোগ শেষ হইয়া গেলে পুনরায় দর্শক দিগকে ভিতরে যাইতে আহ্বান করা হইল। পুনরায় গিয়া দেখি যে রৌপ্যাসনে মণিময় মূর্ত্তি বিরাজিত। হীরক মূর্ত্তি বাক্সর মধ্যে স্থাপিত।

এই মণিময়মূর্ত্তি অদ্ভূত রচনাকৌশলে শিল্প-নৈপুণ্যে নির্ম্মিত। ইহা ভিন্ন বর্ণের মণিমানিক্য দ্বারা সংগটিত। ইহার সম্মুখ দিয়া দেখিলে মহাদেবের জটাধারী মূর্ত্তি দেখা যায়। পাণ্ডা আমাদিগকে বিগ্রহের নিকটে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া সমস্ত দেখাইলেন। তদ্দর্শনে আমরা বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তদনন্তর দেবের পূজা ভোগ সমাপন পূর্ব্বক মন্দিরমধ্যে পুনরায় আরত্রিক হইল। তদনন্তর দেবালয় ছত্রে আসিলাম। অপরাপর দেবতাদি দর্শন-যোগ্য যাহা যাহা ছিল তাহা দর্শন করিলাম। ছত্রে আসিবার কতকক্ষণ পরে পাণ্ডা মহাশয় প্রসাদ আনিলেন। প্রসাদ যাহা আনিলেন তাহাতে আমা-দের দশ বার জনের উদরপূর্ত্তি ও আপ্যায়ন লাভ হইল। ইহা বলা আবশ্যক যে পূর্ব্ব বারে আমরা রামেশ্বরে ও শ্রীরঙ্গমে যে রূপ প্রসাদ পাইয়া ছিলাম, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন দধি প্রভৃতি-ছিল। আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হইল তপনদেবও মধ্যাকাশ অতিক্রম করিলেন। আহারান্তে আমরা বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় পাণ্ডা মহাশয় একখানি খাতা, মস্যাধার ও লেখনী হস্তে জনৈক গোমস্তা সহ আমাদের নিকট আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক তীর্থস্থানের নিয়মানুসারে আমাদের প্রত্যেকের নাম ধামাদি নিজভাষায় লিখিয়া লইলেন। এবং আমাদিগের দ্বারাও লেখাইয়া লইয়া সহিকরাইয়া লইলেন। পাণ্ডার খাতা খানি দেখিয়া বোধ হইল যে এপ্রথা পূর্ব্বে এখানে ছিলনা, অধুনা অন্যান্য তীর্থের অনুকরণে প্রচলিত হইতেছে।

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের ও নগরীর ন্যায় এখানেও অনেকগুলিছত্র আছে। তন্মধ্যে নটাকাটা সেটিদের একটী সুপ্রসিদ্ধ ছত্র আছে। তথায় ব্রাহ্মণগণকে নিত্য আহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। এবং মাদ্রাজ প্রদেশের ন্যায় ষ্টেসনে বিপণিতে বাজারে প্রচুর ফল মূল শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে নানাবিধ কদলিফল যথেষ্ঠ পরিমাণে বিরাজ করিতেছে। এরূপ সুমিষ্ট ও সস্তা সুপক্ক কদলিফল আর কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না।

চিদম্বরম তালুকের অন্তর্গত আরও দুইটী স্থানে দুইটী দর্শনযোগ্য প্রাচীন পবিত্র ও সুপ্রসিদ্ধ দেবালয় আছে। একটী বৃদ্ধাবলম নামক স্থানে মণিমুথা নদীর তীরে শিবমন্দির। অপরটী রেলষ্টেসন হইতে ২৪ মাইল দূরে শ্রীমূষম নামক স্থানে বিষ্ণুমন্দির দেবতার নাম শ্রীভূবরঙ্গ স্বামী। ষ্টেষণ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত হেতু ও আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির অসুস্থতা নিবন্ধন উক্ত মন্দিরদ্বয় দর্শন ঘটে নাই।

আর দুই চারি কথা বলিয়াই আমার এই প্রবন্ধের শেষ করিব। এই চিদম্বরম্ মন্দিরের সহিত যে ঐতি-হাসিক সম্বন্ধ বা সংস্রব ঘটিয়াছিল তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ দেবালয়ের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের দেবালয়গুলিও দুর্গ বা সেনা-নিবাসের উপযুক্ত স্থান হেতু যুদ্ধ বিগ্রহ সময়ে অনেক বার এই দেবালয়ে শত্রু ও ম্লেচ্ছ সৈণ্যগণ এই মন্দির অধিকার করিয়া ইহা তাহাদের সেনা-নিবাসে পরিণত করিয়াছিল। বিখ্যাত কর্ণাটিক যুদ্ধকালে কখন ইংরাজগণ কখন ফরাসিগণ এই দেবালয়ের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সৈন্য-গণের জন্য ছাউনি প্রস্তুত করিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিত। ইংরাজি ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিরা এই দেবালয় অধিকার করে। এবং ১৮৬০ খৃ ইংরাজেরা ইহা অধিকার করেন। আবার ১৭৮০ খ্রীঃ হাইদার আলি উহা ইংরাজগণের নিকট হইতে দখল করিয়া লয়।

কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় এ প্রদেশের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি এই প্রকার সেনানিবাসে পরিণত হইয়া দেব সেবার ও পূজাদির সম্পুর্ণ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া-ছিল। ১৭৯৩ খ্রীঃ টিপু সুলতানের সহিত সন্ধি হইলে পর ঐ সকল উৎপাত দূরীভূত হয়। তদবধি নির্ব্বিঘ্নে দেবালয়ের কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে

মথুরার সুন্দরেশ্বরের ও শ্রীরঙ্গনের মন্দিরের ন্যায় এ মন্দিরের তত্ত্বাবধারণের ভার গবর্ণমেন্টের হস্তে ন্যস্ত নহে ইহা ক্ষণানীর দীক্ষীত ব্রাহ্মণগণের কমিটির তত্ত্বাবধানে আছে

অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় এই দেবালয়েরও মাসে মাসে নানা উৎসব হয়। কিন্তু পৌষ মাসের শুক্লপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একাদশ দিন ব্যাপী ইহার প্রধান উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে এই সময় দাক্ষিণাত্যের নানাদেশদেশান্তর হইতে ৩০। ৪০ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

আমাদের ইচ্ছা ছিল অদ্য এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া অপরাহ্নে সহরের অন্যান্য স্থান দর্শন করিব। কিন্তু রামেশ্বরের পাণ্ডার গোমস্তা আমাদিগকে বলিতে লাগিল যে আগামী কল্য রামেশ্বরে দোল উপলক্ষে বিশেষ যাত্রা ও উৎসব হইবে। কল্য সেখানে পৌছান আবশ্যক এই বলিয়া গাড়ি ডাকা হইল, তাহার কুহকে অনেকেই মোহিত হইয়া অদ্যই রহণা হইবেন। আমরা বেলা তিন ঘটিকার সময় চিদম্বর দেবকে প্রণাম পূর্ব্বক যাত্রা করিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

ইতিহাসের এক অধ্যায়।

(২)

ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেনারেল পেরোঁর প্রকৃত নাম পিরি কুইলিয়ার (Pierre cuillier)। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সার্দে প্রদেশান্তর্গত সেটো ডুলয়ে নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পেরোঁর পিতা বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। জেনারেল পেরোঁ যখন বাল্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেই সময়ে দৈবদুর্ব্বিপাকে তদীয় জনকের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে, বস্ত্র-ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাহা উঠিয়া যায়। কাজেই বাল্যকালেই তাঁহাকে দারি-দ্র্যের ভীষণ কবলে পতিত হইতে হয়। পেরোঁ

সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জনৈক ধনবান আত্মীয়ের সাহায্যপ্রার্থী হন। ধনবান্ কবে দরিদ্র আত্মীয়ের সাহাযার্থ হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকে। এজগতে যদি সহৃদয়তা, সমবেদনা সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইত, যদি দরিদ্রের দুঃখবিমোচনে, আর্ত্তের অশ্রু-অপনোদনে মনুষ্যমাত্রেই হস্তপ্রসারণে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইত। কিন্তু হায়! তাহা হয় না। বরং আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি কুটুম্ব দুঃখদারিদ্র্যে নিপতিত হইলে অধিকাংশ লোকের মনে আনন্দের উদয় হয়।

পেরোঁ আত্মীয়ের নিকট সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়া উদ্যমবিহীন হইল না। সে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রুমালের ব্যবসায় আরম্ভ করিল। রুমাল প্রস্তুত করিয়া নান্‌টে নামক নগরে বিক্রয়ার্থ গমন করে। পেরোঁর যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, এই ব্যবসারে তাহা ব্যয়িত হইল। দুঃখ কখন একাকী আইসে না। একটী যাইতে না যাইতে অপরটী সমাগত হয়। পেরোঁরও ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইহার বৈলক্ষণ্য ঘটিল না।

ইহাতেও পেরোঁ দমিত হইলেন না। তিনি নান্‌টেস নগরে কামান নির্ম্মাণাগারে সামান্য কর্ম্মকারের কার্য্যশিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ করিলেন। এই খানে কামান প্রস্তুত প্রণালী তিনি শিক্ষা করেন। নান্‌টেস পরিত্যাগ করিয়া তিনি আইলস্ অফ ফ্রান্সে (Isles of France) স্বেচ্ছাসৈনিকের দলে প্রবেশ করেন। ইহার পর তিনি নৌ-বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ভারতবর্ষে প্রথমে আগমন করেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী নৌসেনাপতি এডমিরাল সাফ্রেঁর অধীনে ফরাসী রণতরি সার্দাইনে সামান্য নৌসৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, তিনি সামান্য নাবিকের (Sailor) পদগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতে প্রাধান্য স্থাপনার্থ ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। পেরোঁ ভাগ্য পরীক্ষার এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অথবা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করিয়া তাঁহার উন্নতি বহুকাল সাপেক্ষ। অথচ সম্মুখে ভাগ্য পরীক্ষার প্রশস্ত পথ পড়িয়া রহিয়াছে। কাজেই শোযোক্ত লোভ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দায় হইয়া পড়িল। তিনি আর দুইজন স্বশ্রেণীর ফরাসী যুবকের সহিত মালাবর রণস্থলে জাহাজ হইতে পলায়ন করিলেন। পাছে ধরা পড়েন, এই আশঙ্কায় এবং উত্তর ভারতে, দিল্লীসন্নিধানে, উপস্থিত হইয়া পতনোন্মুখ মোগলসাম্রাজ্য হইতে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা দেখিয়া তিনি গোহাড়রাজ্যে উপস্থিত হন। গোহাড়ের রাজার অধীনে স্যাঙ্গষ্টার নামক জনৈক স্কটল্যাণ্ড দেশবাসী পাশ্চাত্য রণপ্রণালী অনুসারে সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। এই দলে টম লগি এবং মাইকেল ফ্লিনোস নামক আর দুই জন শ্বেতাঙ্গ স্যাঙ্গষ্টারের অধীনে কার্য্য করিতেন। ১৭৮১ সালে পেরোঁও এই সৈন্যদলে চাকুরী গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পেরোঁর প্রকৃত নাম পিয়ার কুইলিয়ার। পাছে এই নাম রাখিলে ভবিষ্যতকালে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হস্তে সহজে ধরা পড়িতে হয়,

এই আশঙ্কায় তিনি স্বীয় নাম সঙ্ক্ষেপ করিয়া পেরোঁ করিলেন। তিনি যেভাবে জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, যদি ধরা পড়িতেন, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। পেরোঁ সাহেব পাশ্চাত্য ভাষানভিজ্ঞ এদেশবাসীর নিকট পিরু সাহেব বলিয়া আখ্যাত হইলেন। সাহেবদিগের নামের এইরূপ সম্ভাষণ এদেশে এখনও ঘটিয়া থাকে। এখনও শুনিতে পাওয়া যায়, যদি কোন সাহেবের নাম জর্জ টমাস, রবার্ট সদারল্যাণ্ড বা জেমস ব্রাউনিস থাকে, তাহা হইলে ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ ভারতবাসীর উচ্চারণ প্রভাবে জর্জকে 'জাহাজী' সাদারল্যাণ্ডকে 'সৎলোজ' ব্রাউনিসকে 'বরাণ্ডী' প্রভৃতিতে পরিণত হইতে হয়।

স্যাঙ্গষ্টার সাহেবের অধীনে পেরোঁ প্রথমে কামানের কারখানায় ওভারসিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তিনি দুই বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে শ্রীমতী ভেরিডেলের সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীমতীর পিতা পূর্ণমাত্রায় ফরাসী ছিলেন না—শ্বেতকৃষ্ণ সংমিশ্রণে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাণ্ডিয়ারীতে তিনিও ভবঘুরের ন্যায় ভাগ্যোদয়ে ব্যাপৃত ছিলেন।

গোহাড়ে পেরোঁকে অধিককাল থাকিতে হইল না। আমরা যে সময়ের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতেছি, সে সময়ে ভারতবর্ষে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। মোগল সম্রাট এখন আর বিক্রমশালী ছিলেন না। কাজেই সুযোগ বুঝিয়া অধীন সামন্তরাজগণ স্বস্ব প্রাধান্য স্থাপনার্থ পরস্পরে যুদ্ধরত হইয়াছিলেন। গোহাড়ের রাজাও যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হন নাই তাহা নহে। তিনিও ইয়ুরোপীয়ান প্রণালীমত শিক্ষিত সৈন্যদল গঠন করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্য 'ভবঘুরেদের' সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই ভবঘুরেরা প্রায়শঃ দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিত। কারণ তাহা না হইলে তাহাদিগের অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হইত না। গোহাড়ের রাজা এইরূপে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পরাজিত হন। কাজেই পেরোঁর চাকুরি নষ্ট হয়।

ভরতপুরের রাজার অধীনে লেষ্টিনিউ নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ সেনানায়ক ছিল পেরোঁ ইহারই অধীনে কোয়াটার মাষ্টার সার্জ্জনের পদে মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়। সম্ভবতঃ ১৭৮৪ সালে তাঁহার এই পদলাভ হয়। সেই সময়ে সিন্ধিয়ারাজ মাধোজির প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। সিন্ধিয়া ও হোলকার উভয়েই মহারাষ্ট্রীয় নৃপতি কিন্তু উভয়েই প্রভুত্ব বিস্তারে ব্যগ্র। দেশের মুখ না চাহিয়া, স্বদেশের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভারতীয় নরপতিগণ আত্মকলহে মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। মাধোজি তখন ভারতে একছত্রী নরপতি হইতে সমুৎসুক। যাঁহার অধীনে যত পাশ্চাত্যরণবিদ্যাবিশারদ সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল, শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর সংখ্যাধিক্য ছিল, তাঁহারই বল বীর্য্য সে সময়ে প্রভূত বলিয়া গণ্য হইত। সিন্ধিয়ার এইরূপ সৈন্য ও সেনাপতি সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া হোলকার তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা ঈর্ষান্বিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন।

ভরতপুরের রাজা রাজপুত জাঠ। তিনি সিন্ধিয়ার অধীনে মিত্ররাজরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। চাক্-

সান্না এবং আগ্রার যুদ্ধে সিন্ধিয়াকে সাহায্য করণার্থ ভরতপুর রাজ ধনজন দিয়া সিন্ধিয়াকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৮৯ সালে যখন সিন্ধিয়া দিল্লিনগরী অবরোধ করেন, সে সময়েও ভরতপুররাজ সিন্ধিয়াকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল রণ ক্ষেত্রে পেরোঁকেও উপস্থিত হইতে হইয়াছিল।

বৃদ্ধ সাহ আলম সে সময়ে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাকে করতলগত করিতে পারিলেই ভারতসাম্রাজ্য সহজে হস্তগত হইবে, এই আশায় অনেকেই দিল্লি অধিকারে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। গোলাম কাদের ইহাদিগের অন্যতম। সিন্ধিয়ার নিকট পরাজিত হইয়া গোলাম কাদের যখন মিরাট অভিমুখে পলায়ন করেন, জেনারেল লেষ্টিনিউ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, গোলাম কাদেরকে বন্দী করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হইবেন। কারণ, সে সময়ে দিল্লি হইতে যে কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি পলায়ন করিবেন, তিনি কিছু না কিছু রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া যাইতেন। সেই সকল ধনরত্ন তাঁহাদিগের সহিত থাকিত। সুতরাং তাঁহারা পথিমধ্যে কাহারও হস্তে বন্দী হইলে বন্দীকারীর বিশেষ লাভ হইত। লেষ্টিনিউ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মন্‌সিয়র জে পিলেট নামক জনৈক ফরাসী অধিনায়কের হস্তে সেনানায়কের কর্ত্তৃত্বের ভারার্পণ করিয়া লেষ্টিনিউ সাহেব গোলাম কাদেরকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হইল না। গোলাম কাদেরের ধনাদি তাঁহার হস্তগত হইল। লেষ্টিনিউ আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তিনি সেই সকল অর্থাদি লইয়া পলায়ন করিলেন।

এদিকে লেষ্টিনিউর অধীন সৈন্যদলের বেতনাদি অনেক বাকী পড়িয়াছিল। ইহাদিগের প্রাপ্য বেতনের অর্থও লেষ্টিনিউ গ্রাস করিয়াছিলেন। লেষ্টিনিউর পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অধীন সৈন্য সমূহ বিদ্রোহী হইল। পিলেট তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেন না। কাজেই ভরতপুরের রাজাকে ঐ সৈন্যদল ত্যাগ করিতে হইল।

পেরোঁ আবার পদচ্যুত হইলেন। তিনি সিন্ধিয়ার অধীনে রাণা খাঁ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ সেনাপতির অধীনে কর্ম্মপ্রার্থী হন। একটী সৈন্যদলের অধিনায়কত্বও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সৈন্যদলকে পদচ্যুত করায় তাঁহার চাকুরী আবার নষ্ট হইল। আবার তিনি 'বেকার' হইলেন।

মণ্টিনি নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বেগম সমরুর অধীনে চাকুরী করিয়া দিবার নিমিত্ত যত্নবান হন। তিনি ইহার নিমিত্ত বেগম সোমরুর নিকট অনুরোধ পত্রও প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ ফল লাভ হইল না। কারণ বেগম সোমরুর অধীন সৈন্যদলের অনেক দিনের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। ইহাদিগেরও বেতন দিতে পারিতেছিলেন না, ইহার উপর আবার নূতন লোক নিযুক্ত করা তিনি উচিত বিবেচনা করিলেন না।

ইহার পর হইতেই পেরোঁর দুঃখের অবসান হইল। জেনারেল ডি বইনি (General De Boigne) নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী যোদ্ধা এই সময়ে সিন্ধিয়ার অধীনে নিযুক্ত হইয়া প্রথম সৈন্যদল গঠিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সেনাপতি বইনি তখন উপযুক্ত সেনানায়কের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি পেরোঁকে পাইয়া সাদরে সৈন্যদলভুক্ত করেন। পেরোঁ কাপ্তেন লেফটেন্যাণ্টের পদলাভ করিয়া বরহনপুরের সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

জেনারেল ডি বইনি বিশেষ কার্য্যপটু, রণদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। এমন কি, ফরাসী সেনাপতি বুসি, লালী এবং ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের পরবর্ত্তী পদবীতে তাঁহাকে ঐতিহাসিকেরা আসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পেরোঁর কার্য্যনৈপুণ্য, সৎসাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া সেনাপতি বইনি তাঁহাকে বিশেষ প্রিয়পাত্র করিয়াছিলেন।

১৭৯০ সালে জয়পুর ও যোধপুরের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়া সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। পত্তন এবং মার্ত্তার সমরে রাজপুত অতুলনীয় শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শিত হইল, কিন্তু সিন্ধিয়ার নিকট রাজপুত বাহিনী পরাভূত হইল। পেরোঁ এই দুই যুদ্ধেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রণজয়ের পর সেনাপতি বাইনি যখন স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন নবার্জ্জিত আজমীরের সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার ভার তিনি পেরোঁর উপর প্রদান করেন। পেরোঁ এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কোনান্দের নবাব মহারাষ্ট্রীয় শক্তির বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। সিন্ধিয়ার আদেশে সেনাপতি বইনি জেনারেল পেরোঁকে চারিদল সৈন্য লইয়া কোনান্দ অধিকার করিতে প্রেরণ করেন।

রেওয়ারি প্রদেশে কোনান্দ সুদৃঢ় দুর্গ অবস্থিত। ইহা পাতসাহ সাহা আলামের প্রধান অমাত্য নজাফ খাঁর অধীনে ছিল। নজাফ খাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার বিধবা ভার্য্যা দুর্গাধিকারিণী হন। নজাফ খাঁ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন, দূরদর্শী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পত্নীকে সেনাপতি বইনির সহিত বিরোধ করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। নজাফ খাঁর সহধর্ম্মিণীকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য যখন বলিয়া পাঠান হইল, তখন স্বামীবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তিনি তাহাতে সম্মতা হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, কিন্তু এই সময়ে ঘটনাচক্র পরিবর্ত্তিত হইল।

মার্ত্তার যুদ্ধের পর পরাজিত ইস্মাইল বেগ দিল্লির পাতসাহের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সিন্ধিয়া সকাশে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ইস্মাইল বেগ বীরাগ্রগণ্য স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের তথা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুত্থান এবং স্বধর্ম্মী মুসলমান পাতসাহ প্রভৃতির অবনতি দেখিয়া সততই মর্ম্মক্লিষ্ট হইতেন। সুতরাং সিন্ধিয়ার অধীনে পদগ্রহণ করিয়াও তিনি নাজাফ খাঁর বিধবা স্ত্রীর পক্ষাবলম্বনে বিরত হইতে পারিলেন না। সিন্ধিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হোলকার ইহা অবগত ছিলেন। তিনি ইস্মাইল বেগকে সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। হোলকারের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল। এই স্বজাতিদ্রোহিতাই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

হোলকারের ষড়যন্ত্রে ইস্মাইল বেগ নাজাফ খাঁর বেগমের সহিত স্বসৈন্যে যোগদান করিবার প্রস্তাব

করিলেন। বেগম এই আকস্মিক সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় সিন্ধিয়ার নিকট বশ্যতা স্বীকারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইস্মাইল বেগ্ম বিংশতি সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য এবং ৩০ টী কামান লইয়া নাজাফ খাঁর বেগমের সহিত যোগদান করিলেন। হোলকার ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে সিন্ধিয়ার বলক্ষয় জনিত তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হইবে। কিন্তু হায়! পাপের জয় কোন কালে হয় কি?

ডি বইনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসঘাতক ইস্মাইল বেগকে সমুচিত শাস্তি প্রদানার্থ কৃত সঙ্কল্প হইলেন। তিনি ইস্মাইল বেগকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করণার্থ পেরোঁকে সসৈন্যে যাত্রা করিতে আদেশ করেন। পেরোঁ সেনাপতির আদেশানুসারে সত্বর যুদ্ধযাত্রা করেন। কোনান্দের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি দেখিলেন, শত্রুপক্ষ দুর্গসন্নিধ্যে শিবির সন্নিবেশনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। পেরোঁ আর কালবিলম্ব করিলেন না, শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। কাহারও অধীন না হইয়া, স্বয়ং অধিনায়ক হইয়া সমরাঙ্গনে সৈন্য-চালনা পেরোঁর এই প্রথম। দুই ঘণ্টার মধ্যে পেরোঁ ইস্মাইল বেগকে পরাস্ত করিয়া তাহার কামান প্রভৃতি অধিকার করিলেন এই যুদ্ধে ইস্মাইল-বেগের দুইসহস্র যোদ্ধা রণস্থলে প্রাণবিসর্জ্জন দেয়। ইস্মাইলবেগ সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

তখন দুর্গাবরোধ আরম্ভ হইল। ইস্মাইল বেগ প্রথম সময়ে পর্য্যুদস্ত হইলেও দুর্গ রক্ষা করিতে বিশেষ বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চারিমাস কাল সেনাপতি পেরোঁ দুর্গাবরোধ করিয়া রাখেন, কিন্তু দুর্গাধিকারে সমর্থ হন নাই। কোনান্দ দুর্গের সুদৃঢ় মৃত্তিকাপ্রাচীর সেনাপতি পেরোঁর কামানের গোলা কিছুতেই ভগ্ন করিতে পারিল না। পেরোঁর সৈন্যবলও এত অধিক ছিল না যে, তিনি সবলে দুর্গ অধিকার করিতে পারেন। দুর্গাধিকার সহজে হইবে না বলিয়া পেরোঁর পক্ষের সকল লোকই একরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যখন প্রসন্না হন, তখন অঘটন সংঘটন হইয়া থাকে। একদিবস বেগম তাঁহার জনৈক খোজার সহিত সতরঞ্চ ক্রীড়া করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটা গুলি আসিয়া তাঁহাকে লাগিল, তাহাতেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই আকস্মিক বিপদে দুর্গবাসী সকলেই নিতান্ত শোকমগ্ন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। শুদ্ধ ইহাই নহে, ইস্মাইল বেগের প্ররোচনায় বেগম যে বিপন্না হইয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন, ইহা সকলের বিশ্বাস হইল। কাজেই দুর্গস্থিত সৈন্যেরা ইস্মাইলবেগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া স্থির করিল যে, ইস্মাইলবেগকে শিরুসাহেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে।

যথাসময়ে এই সংবাদ ইস্মাইলবেগের কর্ণগোচর হইল, তিনি আশুবিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার মানসে স্বয়ং সেনাপতি পেরোঁর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পেরোঁ স্বীকার করিলেন, যাহাতে ইস্মাইলবেগের প্রাণরক্ষা হয়, তিনি সাধ্যমতে তৎপক্ষে যত্নবান হইবেন। বলা বাহুল্য, জেনারেল পেরোঁ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইস্মাইল

বেগ যখন মাধোজী সিন্ধিয়ার পদানত হইল, তখন তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহিতার জন্য মাধোজী সিন্ধিয়া সমুচিত শাস্তি প্রদানার্থে উদ্যত হন, কিন্তু জেনারেল পেরোঁ তাঁহাকে রক্ষা করেন।

কোনান্দের অবরোধকালে যেমন নাজফ খাঁর বিধবা পত্নীর প্রাণবিয়োগ হয়, তদ্রূপ পেরোঁরও একটী হস্ত নষ্ট হয়। দুর্গাবরোধ কালে তিনি স্বহস্তে গোলা পরীক্ষা করিতেছিলেন। উহা ফাটিয়া যাওয়ায় তাঁহার একটী বাহু উড়িয়া যায়। অবশেষে সেই ক্ষত বিক্ষত হস্তটিকে চিকিৎসকের দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে হয়। তদবধি তাঁহাকে 'একহস্ত' বা 'একবাহু' বলিত।

কোনান্দ জয়ে জেনারেল ডি বইনি পেরোঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পেরোঁকে পুরস্কৃত করিতে বিরত হন নাই। পেরোঁকে "মেজরের" পদে উন্নীত করা হয় এবং দ্বিতীয় বাহিনী (Second Brigade) গঠিত হইলে জেনারেল ডি বইনি পেরোঁকে তাহার অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। সিন্ধিয়ার সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে পেরোঁ বিভাগীয় সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে এক্ষণে আট হাজার পদাতিক আট শত খাদি এবং চল্লিশটী কামান রহিল। তাঁহার বেতনও এক্ষণে মাসিক প্রায় দুই সহস্র টাকা হইয়াছিল। যে ব্যক্তি মাসিক ষাইট টাকা বেতনের চাকুরী যাওয়ায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ পদলাভ ও অর্থলাভ সামান্য সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গণিতের এক পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষ গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি প্রভৃতির জন্মস্থান। এই কথা জগতবাসী কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অতি প্রাচীন-কালে লিখিবার বা গণনা করিবার কোন প্রকার আবশ্যক হইত না। তখন ভারতের লোকে সকল কথাই স্মরণ করিয়া রাখিত। কোন দ্রব্য গণনা করিবার আবশ্যক হইলে কোন দ্রব্যে দাগ কাটিয়া রাখা হইত। বর্ত্তমান সময়ে সুদূর পল্লীতে গোয়ালা ও কলুগণ দুগ্ধ ও তৈলাদি গ্রামবাসীদিগকে প্রাত্যহিক প্রদান করিতে হইলে স্থূলকঞ্চি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গাঁইটগুলি মসৃণ করতঃ ছুরীকাদ্বারা চিহ্ন প্রদান করে। এক একটি চিহ্ন প্রদান করিলে বুঝিতে হইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে একদিন দুগ্ধ বা তৈল প্রদান করা হইল। যেদিন উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে কোন দ্রব্যই প্রদান করা হইল না, তখন গোয়ালা অথবা কলু উক্ত চটিকায় কোন চিহ্নই প্রদান করিল না। তাহাদের স্মরণ শক্তিও তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। কোন বাড়ীতে কিপ্রকার দ্রব্য কত পরিমিত জোগান দেওয়া হইতেছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই প্রকারে তখন কার্য্য চলিত কিন্তু ক্রমশঃ যখন বহু-দ্রব্যের প্রচলন হইতে আরম্ভ হইল তখন আর অঙ্গুলী গণনা করিয়া হিসাব স্থির করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তদবধি নববিধানের আবিষ্কার করণে মনিষীগণের মস্তিষ্ক পরিচালনার আবশ্যক

হইয়া উঠিল। এইরূপে ক্রমশঃ গণিতের প্রথম সূত্রপাত হইল।

প্লেটো প্রাকৃতিক দৃশ্য লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি গণিত সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি প্রকৃতি প্রত্যয়ের সঙ্গে যৌগিক শব্দের পার্থক্য সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধিকরণে সমর্থ হয়েন নাই। কারণ তিনি সর্ব্বপ্রথমে ভাষার বন্ধন দৃঢ় করিয়া গণিতে মনোনিবেশ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যটি যে অন্যায় হইয়াছে একথা কেহই বলিতে পারেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে ভাষার দিকেই মনোনিবেশ করিতে হইবে। যাহা হউক, ভাষার দৃঢ়ীকরণ সম্পন্ন হইয়া গেলে বিবিধ শাস্ত্রের উপর মনুষ্যের দৃষ্টি পড়িল। তন্মধ্যে গণিতের উপর দৃষ্টিই অধিক আবশ্যক বলিয়া অনুমিত হইল। একদিকে হিন্দুগণের যাগযজ্ঞাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অপরদিকে তেমনি তাহা সম্পাদনের প্রক্রিয়া ও সময় গণনার অভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ হইল। অভাব মনুষ্যকে কার্য্যতৎপর করিয়া তুলে এবং তজ্জনিত অভাবে নব নব বিষয়ের আবিষ্কারকার্য্য সম্পাদিত হয়। হিন্দুগণের তাহাই হইয়া উঠিল। তাঁহারা একটি যজ্ঞ সম্পাদনে ত্রিকোণ বেদী প্রস্তুত করিয়াছিলেন এক্ষণে আবার অপর আর একটি যজ্ঞ করণে তৎপরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা ষট্‌কোণ বেদিকার আবশ্যক হইল, সুতরাং তৎক্ষণাৎ মনীষিগণের মস্তক পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল। অচিরকালমধ্যে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি শাস্ত্রের আবির্ভাব হইল সংসারে প্রতি পদবিক্ষেপে গণনার ও হিসাবাদির আবশ্যক হইয়া উঠিল। কি যাজ্ঞিক কার্য্যে কি সাংসারিক কার্য্যে সকল বিষয়েই গণিতের অভাব অনুভূত হইয়া উঠিল। যজ্ঞাদির কাল নির্দ্দেশ করিতে হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা গণনা করিতে হইবে। এই সমুদায় গণিতের অঙ্গ বিশেষ সুতরাং পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি উপবিভাগ গুলি অচিরকাল মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিল। এই রূপে গণিত শাস্ত্র সৃষ্ট হইয়া জগতবাসীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিল। মানব-গণের জ্ঞান পূর্ব্বাবধিই ছিল তাহাই ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত হইয়া কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের নিয়মরূপে জনসমাজে প্রযুক্ত হইল মাত্র। সেই পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে মধ্যযুগ হইতে গণনা-প্রথা চলিতেছে। আমাদের দেশে সর্ব্ব প্রথমে অঙ্গুলী গণনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, পরে শনৈঃ শনৈঃ গণিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিভিন্ন মহাদেশে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। তবে রোমানদিগের ব্যাবকলনে (Subtraction) কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। "It was to the Hiudus that Europe owed the use of the present notation; * * * and from them it passed to the Arabs." বর্ত্তমান সময়ে যে গণিতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ইউরোপখণ্ডে দৃষ্ট হয় তাহা হিন্দুগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে হিন্দুগণ সর্ব্ব প্রথমে উহা আবিষ্কার করেন। অবশেষে আরববাসীগণ তাহা শিক্ষা করিয়া সুদূর পশ্চাতে

লইয়া যান। রোমানেরা ১, ২, ৩, ৪, এই চিহ্নগুলি না লিখিয়া I, II, III, IIII অথবা IV প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন। ইতালীর শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ হিন্দুগণপ্রবর্ত্তিত চিহ্ন (Hindu numerals) গুলি ব্যবহার করেন না বটে কিন্তু তথাকার বণিক সম্প্রদায় বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক সাগ্রহে উহা ব্যবহার করেন। কারণ হিসাব পত্রাদিতে তাঁহাদের দেশীয় প্রবর্ত্তিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। অবশেষে ১২৯৯ খ্রীঃ ফুলনগরবাসীগণকে বাধ্য করিয়া উক্ত কার্য্য হইতে নিষ্কাষিত করা হয়। তাহাদিগকে I, II, এই প্রকার চিহ্নদ্বারা হিসাব লিখিতে হইবে অথবা তাহাতে অসুবিধা বোধ করিলে কথাদ্বারা (একসেণ্টমাত্র) হিসাব লিখিয়া রাখিতে হইবে এইরূপে স্থিরীকৃত হইল। জার্ম্মণী, ফরাসী ও ইংলণ্ড-বাসীগণ পূর্ব্বে অত্যধিক পরিমাণে হিন্দুসাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিত না কিন্তু পঞ্চদশ খ্রীঃ হইতে ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিগণ প্রবর্ত্তিত গণিতের চিহ্ন সমুদায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এক সময়ে সারাসনবাসীগণ গ্রীকজাতি প্রবর্ত্তিত চিহ্নাদিও ইউরোপে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাহার স্থায়িত্ব অধিক দিন বিদ্যমান ছিল না। মিসরবাসীগণের জ্যামিতি ৬০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে প্রচলিত ছিল তাহাও স্থানে স্থানে অবিশুদ্ধতা দোষে দূষিত। পাদরিগণ যে কতিপয় নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই গণ্ডি মধ্যে অবস্থিতি করিতে পছন্দ করিতেন; কিন্তু গ্রীকদেশীয় জ্যামিতির নিয়ম তাঁহারা ও রোমানেরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। তবে ইঁহারা জ্যামিতি কাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিলেন, এই প্রশ্ন হৃদয়ে সহসা উদিত হইতে পারে। ইহা হওয়াও সম্ভব। ইহাঁরা মিসরদেশবাসীগণের নিকট হইতে জ্যামিতি শিক্ষা করিরাছিলেন। তাঁহারা আরববাসীগণের নিকট হইতে এবং আরবীয়েরা হিন্দুগণের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গ্রীকগণের অত্যাবশ্যকীয় গণিতপুস্তক সমূহ আরবী ভাষা হইতে লাতিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের পুস্তক দৃষ্টে তাঁহাদের গণিতের জ্ঞান কি পরিমিত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে লক্ষিত হইয়া থাকে। যে গণিত শাস্ত্র অতি নীরস বলিয়া জগতবাসী ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা হিন্দুগণ সুরস করিয়া লইয়াছিলেন। এমত না হইলে হিন্দু-গণের মধ্যে গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিনী বিদুষী ললনাগণ স্থান পাইতেন না। লীলাবতী প্রভৃতি ভারতললনা এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। উহা নীরস হইলে স্ত্রীলোকের কোমল মস্তিষ্কে ক্রিয়া করিতে পারিত না।

শ্রীগণপতি রায়।

সমালোচনা।

ধর্ম্মপ্রচারক। ফাল্গুন ১৩১৫ হইতে ১৩১৬ ভাদ্র পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারকের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ দেখিয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি। ইহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়, লেখকেরা জ্ঞানের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকের জন্য বিবিধ রত্নরাজি সংগ্রহ করিতেছেন।

গৃহস্থ। আশ্বিন কার্ত্তিক প্রথম বর্ষ। নবসহযোগী যেরূপ ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা আশাপ্রদ। এই দুই মাসের পত্রিকায় যে কয়টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সবগুলিই সুপাঠ্য ও যুক্তিসর্ভ। তন্মধ্যে সম্পাদক "মুষ্টিযোগের" আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইহাতে "শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণ" সুললিত পদ্যানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রানুরাগি সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ইহা যে অতীব আগ্রহের জিনিস হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

মায়াবাদ।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ বিবৃত। তর্কভূষণ মহাশয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সাংখ্য ও বেদান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে কার্য্যকারণতত্ত্ব বিষয়ক তিনটী বক্তৃতা মায়াবাদ নামে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মায়াবাদ বুঝাইবার জন্য প্রথমে, প্রচলিত দার্শনিক মতসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। তন্মধ্যে শেষোক্ত বিবর্ত্তবাদই মায়াবাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। মায়াবাদ বুঝাইবার জন্য আরম্ভবাদ ও পরিণাম বাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের যেটুকু জানা আবশ্যক তাহার অতীব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া— মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিবর্ত্তবাদই মায়াবাদ। এই বিবর্ত্তবাদ—শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। বিবর্ত্তবাদের আকৃতি এই প্রকার—বিবর্ত্তভাবস্তু বস্তুনঃ স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরেণ মিথ্যা প্রতীতিঃ।" অর্থাৎ স্ব স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া, স্বরূপান্তর পরিগ্রহ দ্বারা বস্তুর মিথ্যা প্রতীতির নামই বিবর্ত্তবাদ। রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ। অর্থাৎ রজ্জু রজ্জুই থাকে। সাদৃশ্য প্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন রজ্জুতে যে সর্প ইত্যাকার প্রতীতি হয় উহাই—বিবর্ত্ত। এই মতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর সমস্ত পদার্থই মিথ্যা। মিথ্যাজ্ঞান হেতু ব্রহ্মে জগতের প্রতীতি হয়, কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে—জগৎ মিথ্যা প্রতীতিমূলক। এই সকল প্রতীতি মায়া হেতুক। মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ যে একই কথা, গ্রন্থকার তাহাই বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমস্ত দার্শনিক বিষয়— বঙ্গভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি. আশা করি তর্কভূষণ মহাশয় ভবিষ্যতে এইরূপ অন্যান্যগভীর বিষয়ের অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবেন।

সূচি।

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক
বৃষভাষ্টকং।	শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী	৭১
ভাস্কর্য্য।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	[illegible]
চিদম্বরম্।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।	৭৭
ইতিহাসের এক অধ্যায়।	অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮[illegible]
গণিতের এক পৃষ্ঠা।	শ্রীগণপতি রায়।	৮[illegible]
সমালোচনা।		৮[illegible]

শিক্ষা।

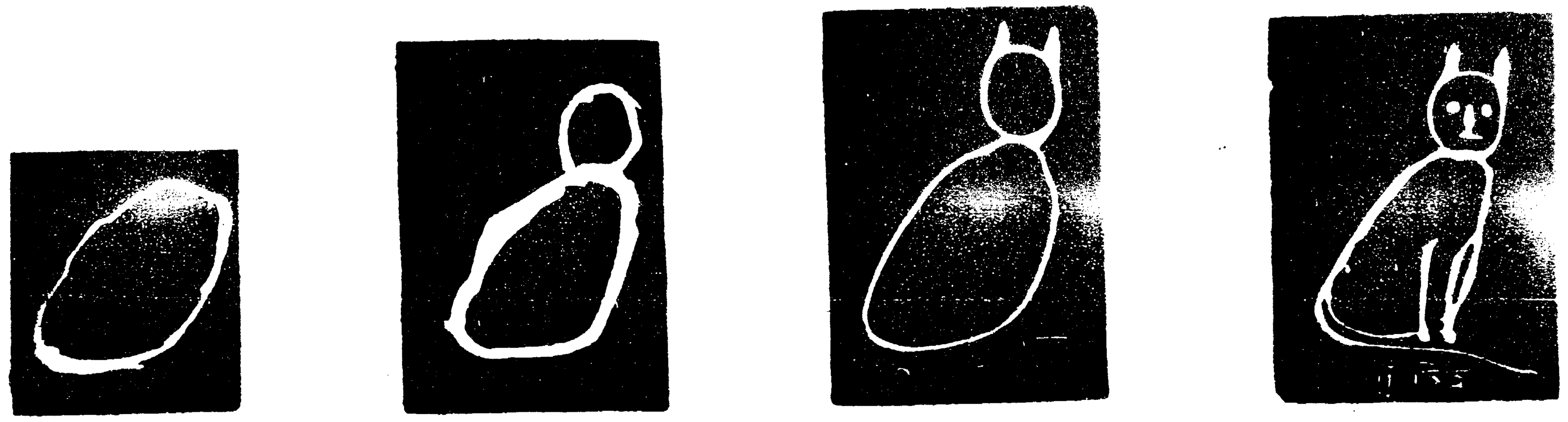

প্রথম আদর্শ।

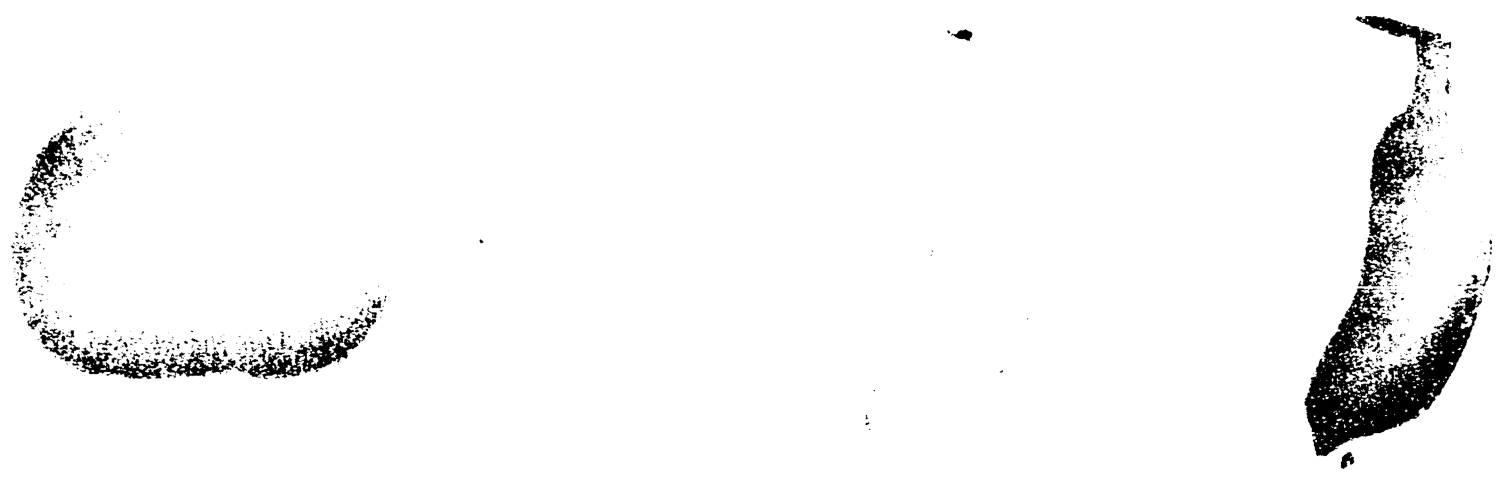

দ্বিতীয় আদর্শ।

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান !

৯ম খণ্ড | সন ১৩১৬—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা

শিক্ষা।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

শিশু বিনয়ন।

প্রথম অধ্যায়।

ইতি পূর্ব্বে আমরা শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, যে কেবল কতকগুলি গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করা শিক্ষাপদ বাচ্য হইতে পারে না। ঐ কার্য্য শিক্ষা-কার্য্যের সহায় মাত্র। 'শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শিশুকে মানুষ করা। শিশুকে মানুষ করিতে গেলে, তাহার মধ্যে যেগুলি মনুষ্যত্বের বীজ আছে তাহার সম্পূর্ণ পুষ্টি-সাধন করিতে হইবে। তাহার সমুদায় ইন্দ্রিয়-গুলিকে পুষ্ট ও কর্ম্মঠ করিতে হইবে, তাহাদিগকে সুপথে চালিত করিতে হইবে। মনের সংযমই প্রধান কর্ত্তব্য। সৎবৃত্তিগুলির পোষণ ও অসৎ-বৃত্তিগুলির বলনাশ ও সংযম একান্ত কর্ত্তব্য। এইবার আমরা শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্যে, আলোচনা করিয়া দেখিব, কি উপায়ে তৎ কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি, শৈশবে প্রকৃতিবশে এক একটী করিয়া ইন্দ্রিয়নিচয় বিকশিত হয়, ক্রমে স্বতই তাহাদের পুষ্টি সাধিত হইতে থাকে। তত্তৎ কার্য্যে সহায়তা করাই কেবল শিক্ষকের কর্ত্তব্য। দেখিয়াছি যে, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পুষ্টি-সাধনজন্য ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের চালনা—শিশুগণ, প্রকৃতিবশে আপনা আপনিই করিতে চায়। সুশিক্ষকের কর্ত্তব্য তাহাতে যেন বাধা না পড়ে অথবা সে কার্য্য যেন অযথা সাধিত না হয়। কারণ হীনযোগ বা অতিযোগের ফল বিষময়। জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও যথাযথ চালনা একান্ত কর্ত্তব্য

চক্ষু কর্ণ ও হস্ত মনের সাহায্যে জ্ঞানার্জ্জন করে, অন্য ইন্দ্রিয়গুলিও তৎকার্য্যে অল্পাধিক সাহায্য করে। কর্ণের পোষণ, সুসঙ্গীত সাহায্যে সাধিত হয়। কিরূপে শিশুকে সেই সঙ্গীত শিখাইতে হয় তাহা প্রকৃতি জানেন, তাঁহাদ্বারাই সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শিক্ষক তাহাতে সহায়তা করিবেন। চক্ষু ও হস্তের শক্তি-বর্দ্ধন বা কর-নয়ন-বিনয়ন কার্য্য কিরূপে সাধিত হইবে তাহাই প্রথমে আলোচন করা যাইতেছে।

কর-নয়ন-বিনয়ন।

Hand and eye training.

দর্শন কার্য্য, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্য। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন তেজস্তত্ত্বের সত্ত্বাংশ সাহায্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকার হয়। আলোকই দর্শনশক্তি বর্দ্ধনের একমাত্র উপাদান। তাহার হীনযোগ বা অতিযোগ-দ্বারা দর্শনশক্তির নাশ হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান বহুল পরিমাণে প্রদান করিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়ের পোষণজন্য, শিশুর ক্রীড়া-গৃহে বিবিধবর্ণের গোলক প্রভৃতি দিতে হয়। যাহার দর্শনশক্তি বর্দ্ধনের জন্য যে বর্ণের অভাব আছে, সে সেই বর্ণই ভাল বাসে এবং তাহা লইয়াই খেলিতে ভালবাসে। বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্র, প্রদর্শন এবং কুসুমোদ্যানে ভ্রমণও এই কার্য্যে সহায়তা করিবে। এইরূপে শিশু একটু বড় হইলেই দেখা যাইবে যে, সে দেওয়ালে, মেজেতে, ও যে কোনও পরিষ্কার স্থান সম্মুখে পাইতেছে তাহাতে—কয়লা, খড়িমাটী বা যাহা সম্মুখে পায়, তাহাদ্বারাই দাগ কাটিতেছে। ঐ কার্য্যদ্বারা শিশু দৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া থাকে। শিশুর ঐ কার্য্যে এককালে বন্ধকরা কর্ত্তব্য নয়। দেওয়ালও নষ্ট না হয় অথচ চিত্রাঙ্কনদ্বারা শিশু নিজের ধারণার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, এরূপ উপায় নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য-প্রদেশ সমূহে এই কার্য্য সাধনজন্য ব্ল্যাকবোর্ড ও শ্লেট ব্যবহৃত হয়। কোনও কোনও শিক্ষাতত্ত্ববিৎ বলেন যে, কাল জমির উপর সাদা রেখা ব্যবহৃত না করিয়া, ঐ বোর্ডের রং সাদা করিয়া কাল খড়িদ্বারা তাহাতে আঁকান কর্ত্তব্য। কারণ কালর উপর সাদা দাগ দৃষ্টিশক্তি পোষণের অন্তরায়। এজন্য শিশুর সম্মুখে কাল জমি থাকিলেও সে স্বতই সাদা জমিতে কাল দাগ কটিতে ভালবাসে।

প্রথম প্রথম শিশুকে যথেচ্ছ অঙ্কন করিতে দিতে হইবে, কেবল যাহাতে সে দাগ গুলা খুব বড় বড় করে বা তার অভীষ্ট ছবিগুলা খুব বড় বড় করে, তাহারই সুবিধা দিতে হইবে। ঐরূপ করিতে করিতে, তাহার চিত্রে, দৃষ্ট দ্রব্যের আভাস দৃষ্ট হইবে। তখন তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে তাহার অভীষ্ট দ্রব্যের নাম করিবে। তখন সেই চিত্রের অভাব একে একে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য অপেক্ষাকৃত বিশদ হইবে।

একটী শিশু তাহার শ্লেটেই ১ম আদর্শের ক চিত্রের একটা ছবি অঙ্কিত করিয়াছে। দূরে একটা বিড়াল বসিয়া আছে। আমি মনে করিলাম, হয়ত শিশুর উদ্দেশ্য ঐ বিড়াল আঁকা। জিজ্ঞাসা করিলাম "ওটা কি হ'লো?" শিশু বলিল "বিড়াল", আমি বলিলাম "বেশ হ'য়েছে, কিন্তু তোমার বিড়ালের মাথা কৈ?" সে উপরে আর একটা গোল আঁকিয়া খ চিত্রের মত

করিল। আমি বলিলাম "বেশ হ'য়েছে কিন্তু তোমার বিড়ালের কাণ কৈ?"

এবার সে বিড়ালের দিকে দেখিল ও দুটী কাণ আঁকিয়া গ চিত্রবৎ করিল। আমি আবার বলিলাম "বেশ হ'য়েছে, কিন্তু চোক মুখ কৈ?" এবার সে মাথায় দুটি শূন্য দিয়া চক্ষু ও একটি রেখা দ্বারা নাক করিল, এবং আপনা হইতেই সে সম্মুখের দুটি পা রেখা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া আর একটি রেখা দ্বারা লেজ অঙ্কিত করিল, চিত্রটি কতকটা ঘ চিত্রের মত হইল। তার পর সে কয়েকবার বিড়ালটির দিকে দেখিয়া ছবিটি মুছিল ও আবার অঙ্কিত করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমি তাহাকে এক টুকরা কাগজ ও একটা লেড পেন্‌সিল দিলাম। সে যে চিত্র করিল তা অপেক্ষাকৃত ভাল। এবার আর তাহাকে কিছু বলিতে হইল না।

এইরূপেই শিশুর চিত্রশিক্ষা সুসাধিত হইতে পারে। ইহার ফল দ্রব্যের স্বরূপ স্মৃতিপটে অঙ্কিত হওয়া। শিক্ষক উত্তরোত্তর সহজ হইতে জটিলতর পদার্থ শিশুর সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে তাহার চিত্র করিতে বলিলে, হয়ত সে ভয়প্রযুক্ত পারিব না বলিবে, কিন্তু তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া চাই যে, 'পারিব না' কথা ভাল নয়। যে যাহা পারে করুক, ক্রমেই ভাল হইবে। এইরূপে অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে শিশুকেঅনেক বিষয় শেখান যাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিই—

একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছি। বন্ধুর একটি তিন চারি বৎসরের ছেলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আমায় দেখিয়া বলিল "কাকাবাবু আমায় একটা ছবি দেবে?"

আমি বলিলাম "ছবি ত আমার সঙ্গে নাই বাবা।"

সে বলিল, তবে "বটুকখানায় এসে এঁকে দাও।"

আমি বলিলাম "চল।"

দুজনে বৈটকখানায় আসিলাম। তাহার পিতাও কিছু কিছু চিত্রবিদ্যা জানেন, নিজের মনে যা আসে তাই আঁকেন। গিয়া দেখি একটা থালায় কতক-গুলি ফল মূল রহিয়াছে। তিনি জলের রঙ্গে তাহার ছবি আঁকিয়াছেন।

সে দিন বৃহস্পতিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী, মনে মনে বলিলাম, "বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠ।" বলিলাম 'ভোঁদা ছবি আঁকবি?'

সে বলিল "হ্যাঁ কাকাবাবু"। আমি এক টুকরা ড্র‌য়িং কাগজ, একটা সেব্‌ল তুলি, আর একটী পাত্রে কমলা লেবুর রং আনিলাম, ও একটা কমলা লেবু তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম "এই কমলা লেবুটা আঁক দেখি।"

সে আপনা হইতে তুলি করিয়া রং লইয়া একটু একটু করিয়া প্রায় গোলাকার করিল অনেকটা কমলালেবুর মত হইল। আমি তাহাকে পরিচালিত, করিয়া শেষে নিজে উহার মত করিয়া দিলাম, তারপর বলিলাম "আঁক এই কলাটা" এবারেও আমার সাহায্যে উহা কতকটা কলার মত হইল। তারপর একটা কাঁচাকলা। এক কাগজে তিন ছবি হইল। ভোঁদার ভারি আনন্দ! সে কারীকর হইয়াছে এমন সময়ে তাহার পিতা আসিল। সে তাঁহাকে দেখিয়া বলিল "বাবা, দেখ কেমন ছবি এঁকেছি।" তাহার পিতা বলিল "কে?" সে বলিল "আমি;"—

কাকাবাবু দেখিয়ে দিলেন।” তিনি বলিলেন “বেশ হয়েছে।”

তারপর সেই ছবি আর ভোঁদাকে লইয়া আমি সিমেন্টের মেঝেতে এক টুকরা খড়ি লইয়া বসিলাম। ব্ল্যাক বোর্ডের খড়ি দু এক টুকরা আমার পকেটে সর্ব্বদাই থাকে।

দুজনে বসিয়া বলিলাম, এ ছবিটা কি (চ-চিত্র)। সে বলিল “কমলালেবু” আমি খুব বড় বড় করিয়া লিখিলাম কমলা, বলিলাম “কমলা এই রকম করে লিখ্‌তে হয়।” তারপর তার হাত ধরে ‘ক’ টার উপর বুলাইয়া দিলাম। ছেলেটির বেশ তীক্ষ্ণবদ্ধি। আমায় বলিল “কাকাবাবু আমি আপনি বুলুই তুমি দেখিয়ে দাও” আমি পকেট হতে পেনসিলটি বাহির করিয়া কোন খান হইতে, কোন দিকে খড়ি লইয়া যাইতে হইবে দেখাইয়া দিতে লাগিলাম। সে ধীরে ধীরে তিনটী অক্ষরই বুলাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ বুলাইয়া সে আঁকা বাঁকা অক্ষরে আর এক জায়গায় লিখিল “কমলা”।

তারপর কলার ছবি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ‘এটা কি? সে বলিল “কলা” আমি লিখিলাম কলা। সে বলিল ওটা আমিও লিখ্‌তে পারি এই বলিয়া সে লিখিল “কলা”।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এটা কি লিখিয়াছ, সে বলিল, কমলা।

“আর এটা?”

“কলা”।

সে বারকয়েক আপনা আপনি মনে মনে বলিল কমলা, কলা, তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল “কাকাবাবু আমি বুঝিয়াছি, এইটা ক, এইটা ম, এইটা লা নয় কাকাবাবু।”

সত্যই সে ক, ম, লা চিনিয়াছে শুধু চেনা নয় লিখিয়াছে আমি আরও বার কয়েক, ক, ম, লা স্বতন্ত্র ভাবে লেখাইলাম, তারপর সমস্ত দাগ মুছিয়া বলিলাম “লেখ।” সে আবার আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখিল “কমলা, কলা।”

আমি বলিলাম “দাদা, আপনার ভোঁদা কমলা, আর কলা লিখেছে।”

তিনি তাঁহার চিত্রের সমাপ্তি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। “বলিলেন” লিখেছে কি রে?”

আমি বলিলাম “এসে দেখ।”

তিনি আসিয়া দেখিলেন। বলিলেন হাতধরে লিখিয়েছ বুঝি?”

ভোঁদা বলিল “না বাবা, এই দেখ আমি নিজে লিখি” বলিয়া আবার লিখিল।

আমি বলিলাম “কোনটা কি বলত?

সে উল্‌টা দিক হইতে বলিল এইটা “লা,” এইটা “ক,” এইটা আর একটা “লা,” এইটা “ম” এইটা আর একটা “ক”

দাদা আমার অবাক! বলিলেন ওরে ওর যে আজো হাতে খড়ি হয় নি!”

আমি বলিলাম “আজইত হাতে খড়ি হ’য়েছে ঐ দেখনা ওর হাতে খড়ি।”

দাদা বলিলেন “হাতে খড়ির বয়স ত হয়নি।”

আমি বলিলাম “যখন বয়স হবে তখন, যথারীতি বিদ্যারম্ভ করিও, এখন দিন কত আমি ওকে ছবিটে আস্‌টা আঁকাই। তাতে কিছু দোষ হবে না, বরং

ওর কল্যাণে আজ একখানা ডালি নারায়ণের ঘরে দিও। এখন ভোঁদা যখন কমলা আর কলা দুই চিনেছে তখন ও দুটো জিনিসের আস্বাদ পাওয়া উচিত।

তিনি তাহাকে একটী লেবু আর দুইটি কলা দিলেন।

ভোঁদা বড়ই আনন্দিত হইল।

আমি দেখিলাম, সে শিখিতে বিরক্ত হয় নাই। কাজেই আরও একটা অক্ষর শিখাইবার ইচ্ছা হইল।

বলিলাম “বাবাজি, কাঁচা কলাটা এখনও লেখা হয়নি” এই বলিয়া লিখিলাম “কাঁ চা ক লা” সে আবার লিখিতে বসিল। এবার ক লিখিয়া তাহার মাথায় চন্দ্রবিন্দু দেখিয়া বলিল “কএর মাথায় এটা কি কাকাবাবু?” আমি বলিলাম ওটাকে চন্দ্রবিন্দু বলে কাঁ লিখতে হলে কয়ের মাথায় ঐ চন্দ্রবিন্দুটা দিতে হয় আর পাশে আ দিতে হয়।

সে জিজ্ঞাসা করিল “এটা আ (া)?”

আমি বলিলাম “হাঁ।”

সে “কাঁচা কলা লিখিল চ লিখিবার সময় দেখাইয়া দিলাম সে আমার চ-য়ে কয়েকবার বুলাইয়া তার পর লিখিল। সমস্ত লেখা হইলে একটু স্থির ভাবে দেখিয়া বলিল “কাকাবাবু, এটা যদি আ (া) হলো, তবে এটা ক এটা চ এটা ল নয় কাকাবাবু?”

আমি বলিলাম “হাঁ।”

সকল ছেলের এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয় না, কিন্তু চালনা দ্বারাই ক্রমে তীক্ষ্ণতা জন্মে।

আমি লিখিলাম—

ক ল ম

জিজ্ঞাসা করিলাম কি লিখেছি বল দেখি?

সে মনে মনে বার দুই বলিয়া বলিল “কলম, যা দিয়ে বাবা চিঠি লেখে নয় কাকাবাবু?”

আমি বলিলাম “হাঁ।”

তার পর লিখিলাম—

ম ল ম

সে এ বারেও বার বার মনে মনে বলিল, একটু বিলম্ব করিয়া বলিল “ঘায়ে যে মলম দেয় সেই মলম নয়?”

দাদা দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিলেন তাই ত রে, তুই যে এক দিনেই ভোঁদাকে পণ্ডিত করে দিবি দেখ্‌চি।

আমি বলিলাম “না এখন আর নয়।”

দাদা বলিলেন—“ ‘ক খ’ না শিখে একেবারে জিনিষের নাম লিখতে শেখালি। তবে হাতে খড়ি হলে কি শিখবে?”

আমি বলিলাম “কোন্ অক্ষরের পর কোন্ অক্ষর তাই শিখবে। তার আগে বোধ হয় অর্দ্ধেকের বেশী অক্ষর লিখ্‌তে শিখ্‌বে।”

দাদা বলিলেন “সব শিখ্‌বে না?”

আমি বলিলাম “বর্ণমালার সব অক্ষর ত লিখ্‌তে দরকার হয় না!”

এই ছেলেটিকে আমি প্রায় একবৎসর শিক্ষা দিয়াছিলাম। যখন তার হাতেখড়ি হ’লো সে খালি ঌ আর ঞ লিখ্‌তে শেখেনি। দু চারিটা যুক্তাক্ষর বাদে সমস্ত সংযুক্ত ও অসংযুক্ত বর্ণ লিখিতে শিখিয়াছিল। দুইমাস শিক্ষার পর তাহাকে সেই পুরাতন

কমলার ছবি দৃষ্টে যে রচনা করাইয়াছিলাম, তাহা আমার শিশূত্থানের প্রথম ফল, বলিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়াছি।

যেরূপে রচনা করাইয়াছিলাম বলিতেছি।

আমি একদিন সেই পুরাতন ছবি লইয়া লেবুর ছবিটা দেখাইয়া বলিলাম "এটা কি ?"

সে বলিল "কমলালেবু।"

আমি বলিলাম "লেখ।" সে লিখিল।

আমি বলিলাম "কমলালেবু দেখিতে কেমন্ ?"

সে বলিল "গোল আর লাল।"

আমি বলিলাম 'লেখ।' সে লিখিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কমলালেবু খেতে কেমন ?"

সে বলিল "খেতে ঠাণ্ডা আর মিষ্টি।"

আমি বলিলাম 'লেখ।' সে লিখিল।

আমি বলিলাম তারপর লেখ 'সকলে খেতে ভালবাসে।' সে তাহাও লিখিল। তখন সমস্ত অংশ পড়িতে বলিলাম সে বলিল—

"কমলালেবু গোল আর লাল, খেতে ঠাণ্ডা আর মিষ্টি, সকলে খেতে ভালবাসে।"

এইরূপে সে লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিতেছিল।

এই উপায়ে শিশুদিগকে বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমে ক্রমে দিতে হইবে।

ছোট ছেলেরা চিত্রকর হইবার জন্য অঙ্কন বিদ্যা শিখিবে না। শিখিবে মনোভাব প্রকাশের জন্য। প্রথম প্রথম তাহাদের অঙ্কিত চিত্র অতি কদর্য্যই হইবে, কিন্তু ক্রমে তাহারা এরূপ অঙ্কিত করিবে যে, তদ্দ্বারা তাহাদের অভিপ্রায় বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

একটু বড় হইলে তখন তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ ভাবে অঙ্কিত করাইতে যত্ন করিতে হইবে।

শিল্প ও সাহিত্যে ধারাবাহিকরূপে অঙ্কনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, সেই জন্য এ প্রবন্ধে আর তাহা আলোচনা করা যাইবে না। কেবল এই মাত্র বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণ শিক্ষার সহিত ড্রয়িং শিক্ষার উদ্দেশ্য ;—

(১) পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শন-ক্ষমতার (Power of observatin) বর্দ্ধন।

(২) সৌন্দর্য্যবিচার শক্তির উন্মেষ ও পুষ্টি।

(৩) মনের একাগ্রতার বর্দ্ধন।

(৪) দর্শন বা স্মৃতি উন্মেষ ও পুষ্টি।

(৫) কল্পনা ও বর্ণনা শক্তির উন্নতি।

(৬) মনোভাব প্রকাশ ও

(৭) অন্যান্য বিষয় শিক্ষায় সহায়তা। এই সমস্ত উদ্দেশ্য মধ্যে শেষোক্ত দুইটি প্রধান। অপরগুলি আনুষঙ্গিক।

ড্রয়িংএর মনোভাব প্রকাশ শক্তি অত্যন্ত অধিক। কারণ চিত্র, সকল জাতীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধবণিতা সকলে চিত্র দর্শনে চিত্রকরের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। এইজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে Universal Language বলিয়াছেন।

কর-নয়ন-বিনয়নে. গঠন কার্য্যের ক্ষমতা চিত্র কার্য্য অপেক্ষাও অধিক। কারণ চিত্র কেবল এক-

দিকেই হইতে পারে কিন্তু গঠন কার্য্য-দ্বারা দ্রব্যের চারিদিক প্রস্তুত করিতে হয়। এবং স্পর্শন দ্বারা স্পর্শন স্মৃতিরও পুষ্টি হয়। এইজন্য শিশু-বিনয়নের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা গঠন কার্য্যের বিষয়ে আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

প্রবুদ্ধি।*

(১)

তখনও বসন্তকালের চাঁদিনী রাত্রি গভীরা হয় নাই। ফুলের সৌরভ বিলাইয়া মৃদু বায়ু বহিতেছিল। চন্দ্র কিরণে সুকুমারের কক্ষের অধিকাংশ আলোকিত হইয়াছিল।

সুকুমার বাটি আসিয়া দেখিলেন মৃন্ময়ী ঘুমাইয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে শিশু কন্যাটিও ক্ষুদ্র মুখখানি মাতার বাহুতে ন্যস্ত করিয়া ঘুমাইতেছে। মৃন্ময়ীর অলকগুচ্ছ তাঁহার মুখের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে—কন্যার রক্তাভ সুগোল মুষ্টি তাহার ওষ্ঠাধর আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

সুকুমারের কণ্ঠস্বরে মৃন্ময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। 'আমি এখনও বাটি আসি নাই, মৃন্ময়ী! আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছ যে?' মৃন্ময়ী বলিলেন 'অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া আর জাগিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি কোথায় গিয়াছিলে?'

'মৃন্ময়ী, এখনও দেখিতেছি তোমার ছেলেমানুষী স্বভাব ঢাকা পড়ে নাই। একটু রাত্রি হইলেই চক্ষু জড়াইয়া আসে। ঘুমে ঢুলিয়া পড়। তোমাকে দেখিয়া আমার সোণার কাঠি মনে হইতেছিল।'

'আমি আর ছেলেমানুষ কিসে। আমার কি ছেলেমানুষী শোভা পায়? বাবা থাকিলে ছেলেমানুষ থাকিতে পারিতাম।'

সুকুমার অবশ্য এরূপ উত্তর আশা করেন নাই। এরূপ উত্তরে তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন 'এ কি! আমি কি ভাবে কথাটা কহিলাম, আর কি ভাবে উহা গৃহীত হইল! ইহার অর্থ কি?'

(২)

একখানি হীরক সুদক্ষ ব্যক্তির দ্বারা কর্ত্তিত হইলে যেমন অসংখ্য কোণযুক্ত হয়, তেমনি মনুষ্য-হৃদয় যোগ্যব্যক্তি কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলে অসংখ্য গুণসংযুক্ত হয়। সেই গুণসমূহই অপরের গুণগ্রহণের আধার স্বরূপ হইয়া থাকে। বাল্যে মৃন্ময়ীর হৃদয় সুশিক্ষিত হয় নাই। সেই জন্যই চিত্তবৃত্তির যেরূপ উন্মেষ আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা হয় নাই। অতএব সুকুমার মৃন্ময়ীর নিকটে একদিনও যে একটা সহৃদয়তার কথা শুনেন নাই ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আজি সুকুমার মর্ম্মাহত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—কই মৃন্ময়ী ত' তাহা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন নাই! উপাধি লাভের কিছুদিন পরেই তিনি কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হন, কই মৃন্ময়ী ত' তাহাতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ বাক্য বলেন নাই। তবে কি মৃন্ময়ীর সহিত তাঁহার একটা বাহ্যিক সংসারের সম্বন্ধ ব্যতীত আন্তরিক কোনই সম্বন্ধ নাই?

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহাশয়ের অ-পূর্ব্ব প্রকাশিত রচনা।

মনের দুঃখে সুকুমার মৃন্ময়ীকে কয়েক দিন কোনও বিশেষ কথা বলেন নাই। সুকুমারের পিতা ইতঃপূর্ব্বে একদিন কথায় কথায় তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন "বাবা! সংসারে মনের মত সব জিনিষ পাইবে না। আপনার মনের মত গঠিয়া লইতে হইবে।" সেই কথাই আজি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'তবে কি আমারই গঠিবার দোষে এরূপ হইল? বালিকা অবস্থায় মৃন্ময়ীকে আনিয়াছি—কাছে কাছে সর্ব্বদাই রাখিয়াছি। কই তাহাকে ত অযত্ন করিয়া কোনও কথা কহি নাই। ভাল বিষয় শিক্ষা দিতে ক্রুটি করি নাই। তবে কেন এমন হইল?

হায়! কে বলিবে কেন এমন হইল? দূরে এমন সময় কে গান গাহিতেছিল—

'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।'

সেই অনুদ্দিষ্ট স্বরলহরীর স্রোতে সুকুমারের হৃদয়-তন্ত্রী তীব্র ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। তিনিও ভাবিতে লাগিলেন—

'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।'

(৩)

আর একদিন রাত্রিকালে মৃন্ময়ী ঘুমাইতেছেন সুকুমার আসিয়া তাঁহাকে জাগাইলেন। মৃন্ময়ী ছোট ছোট কথায় দুটি একটি উত্তর দিলেন। অবশেষে বলিলেন 'তোমার সঙ্গে আজি কালি আমার সম্পর্ক কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। দিনে তোমার সাক্ষাৎ পাই না, রাত্রিতেও না। তুমি আমি এক বাটিতে থাকি, এই পর্য্যন্ত। আজ কতদিন আমার সঙ্গে দেখা কর নাই, একটা কথা পর্য্যন্ত কহ নাই। আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

সুকুমার এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি কি বলিবেন 'তুমি আমায় বুঝিতে পার না!' অথবা বলিবেন 'আজ পর্য্যন্ত আমি তোমার কাছে একটুও সহৃদয়তা পাই নাই?'

সুকুমার উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। কাজেই তিনি কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন, এবং মৃন্ময়ীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার দোষ দেখাইবার চেষ্টা করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিলেন।

মৃন্ময়ী পুনরায় বলিলেন 'আমি কি করিয়াছি?' সুকুমার এবার অবশ্য কথা কহিলেন। বলিলেন 'কি করিয়াছ মৃন্ময়ী! তাহা আমি বলিতে পারি না। দেখ, অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে মানুষে চেষ্টা করিয়া সুখী হইতে পারে না। আমি ভাবিতাম মৃন্ময়ী! আমি একটা সুখের সংসার লইয়া থাকিব। বিবাহের পূর্ব্বে আমার ভালবাসার আদর্শ অতি উচ্চ অতি মহৎ ছিল। আমি বুঝি নাই মৃন্ময়ী! পৃথিবীতে যাহার আদর্শ যত উচ্চে কার্য্যতঃ তাহাকে সেই পরিমাণে নিম্নে থাকিতে হয়। আদর্শের সহিত যথার্থ অবস্থার এরূপ বিসদৃশ পার্থক্য দেখিয়া আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি।'

সুকুমার যথেষ্ট বলিয়াছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে মৃন্ময়ী অত কথা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার মনোমধ্যে কি একটা অন্ধকার সেই মুহূর্ত্ত হইতে দৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

(৪)

সুকুমার ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শুনিয়া সকলে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং সকলে আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন বলিয়াই মৃন্ময়ী একটু আহ্লাদিতা হইলেন। সুকুমার কলিকাতায় যাইবেন। সমস্ত আয়োজন হইল। সুকুমারের পিতা শুভ দিন দেখিয়া মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইলেন। শুভক্ষণে সুকুমার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চলিলেন। তিনি যাইবার সময় পিতা মাতাকে প্রণাম এবং মৃন্ময়ী ও কন্যার মুখচুম্বন করিলেন। কন্যাটি হাসিতে লাগিল—মৃন্ময়ী কিছু বলিলেন না।

সুকুমার অবশ্য মৃন্ময়ীর কাছে দুই চারিটা কথা শুনিতে পাইবেন আশা করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! বিদায়ের কালেও মৃন্ময়ী ভাল করিয়া একটা কথা কহিলেন না। নিশ্চয়ই তবে মৃন্ময়ী নিষ্ঠুরা না হইয়া যান না। এইরূপ চিন্তার পর সুকুমার সিদ্ধান্ত করিলেন কিছুকাল এখন বাটী আসিব না। ঘনিষ্ঠতায় মৃন্ময়ীর স্নেহ কমিয়াছে। অনেক দিন না দেখিলে হয়ত, মৃন্ময়ী আমায় ভালবাসিবে। সুকুমার! মৃন্ময়ী কি তবে তোমায় ভাল বাসেন না।

সুকুমার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চলিলেন। গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাঠ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রে অভিনব সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইতেছিল। পাখীগুলা আনন্দে চীৎকার করিতেছিল। মাঠে রাখালগণ গাভীবৃন্দ লইয়া সানন্দচিত্তে গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল।

এমন সময় গৃহ পশ্চাতে ফেলিয়া শূন্য হৃদয়ে সুকুমার অনেক দূর চলিয়া গেলেন। সঙ্গে গ্রামের এক নীচ জাতীয় ব্যক্তি তাঁহার জিনিষপত্র লইয়া যাইতেছিল। সে সুকুমারের মুখপানে কয়েকবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল "বাবু তোমার মুখখানি বড় শুকিয়ে গেছে। বাড়ী থেকে বেরুতে না বেরুতেই এই। বিদেশে থাকবে কেমন ক'রে?"

(৫)

আজি দুই দিন হইল সুকুমার কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই দুই দিনেই তাঁহার বাহ্যিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোথায় তাঁহার সেই নিরালা গ্রামের গৃহ—আর কোথায় এই অসংখ্য জন-কোলাহল-পূর্ণ নগরীর গৃহ। এরূপ পরিবর্ত্তনে কিন্তু তাঁহার মনের কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি মৃন্ময়ীর কথাই ভাবিতেছিলেন। নিধিরাম সত্যই বলিয়াছিল। বিদেশে মৃন্ময়ীকে ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে যে বড়ই কষ্টকর হইবে তাহা তিনি এই দুই দিনেই বেশ বুঝিয়াছিলেন। মৃন্ময়ীর ভাবে তিনি বিশেষ ম্রিয়মাণ থাকিলেও মৃন্ময়ীকে দূরে রাখিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে এই নূতন। এ অবস্থার সহিত তিনি আপনাকে কোনো ক্রমেই মিলাইতে পারিতেছেন না। বালিকা মৃন্ময়ীকে গৃহে আনিয়া অবধি তাঁহার যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল সকলই এক এক করিয়া আজি তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বাতায়ন-পথে বসিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। বালিকা মৃন্ময়ী নূতন নূতন আসিয়া কেমন কথা কহিত। তখন বুঝি সে তাহার বালিকা হৃদয় দু'একটি কথায় উন্মুক্ত করিত।—কিন্তু কই? সে ভাব ত' আর নাই। পূর্ব্বে মৃন্ময়ী যে দিন প্রথম সলজ্জ-ভাবে, স্বেচ্ছায় তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল সে দিনের কথা সুকু-

মারের মনে পড়িল। সে দিন সুকুমারের পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল। সে আঘাত তখন মৃন্ময়ীর বিকাশোন্মুখ ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকরুণ স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল—সে আঘাত কত সুখের। আজি তদপেক্ষা গুরুতর আঘাত সুকুমারের হৃদয়ে লাগিয়াছে—সুকুমার কি উপায়ে সে ব্যথা দূর করিবেন? পূর্ব্বে মানসতুলাযন্ত্রে একধারে পায়ের আঘাত একধারে মৃন্ময়ীর কথা ওজন করিয়াছিলেন। মৃন্ময়ীর কথার দিকটাই ঝুঁকিয়াছিল। আঘাতের লঘুত্ব হিসাবেও আইসে নাই। আজি হৃদয়ের ব্যথা যে দিকে সে দিকটাই অধিক ঝুঁকিয়াছে। আজি যদি মৃন্ময়ীর প্রেমের তত গুরুত্ব থাকিত তাহা হইলে এ নিদারুণ ব্যথা অত্যন্তই লঘু হইত।

মৃন্ময়ীর রূঢ় কথাগুলা আজ তাঁহার মনে পড়িতেছিল। একদিন তিনি নিমন্ত্রণ হইতে বাটি ফিরিয়াছিলেন ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। মৃন্ময়ী বলিয়াছিলেন ‘কষ্ট করিয়া আসিলে কেন? আমি ত আসিতে বলি নাই!’ আর একদিন সুকুমার মৃন্ময়ীর গায়ে গোলাবজল দিতে গিয়াছিলেন মৃন্ময়ী বলিয়াছিলেন ‘আমায় ও সব দিও না—আমি ওসব মাখিতে ভালবাসি না। তুমি একেলা মাখ।’—‘একেলা মৃন্ময়ী! একেলা কি কখন মাখামাখি হয়? মাখামাখি করিতে হইলে দুইজন চাই।’ তাহাতে মৃন্ময়ী উত্তর দিয়াছিলেন “তবে কিছুদিন অপেক্ষা কর। আমি আগে মরি। আবার নূতন বৌ আনিয়া তাহার সহিত মাখামাখি করিও।”

(৬)

সুকুমার কলিকাতায় ছয়মাস কাটাইলেন। একজন প্রবীন উকিল তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন সুতরাং এই ছয়মাসেই তিনি উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপার্জ্জন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। একদিন সন্ধ্যার সময় আপনার কক্ষে বসিয়া আছেন এমন সময় একখানা পত্র আসিল। পত্রে এই কথা লেখা ছিল—সুহৃদ্বরেষু—আমি কাল কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম তুমি এইখানেই আছ। আরও তোমার উপার্জ্জনে ক্ষমতা জন্মিয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। অদ্য সন্ধ্যার সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—মন্মথ।

মন্মথের সহিত সাক্ষাৎ হইবে শুনিয়া সুকুমার এই দুঃসময়ে কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে মন্মথ আসিলেন। বহুদিন পরে দুই বন্ধুতে এই সাক্ষাৎ হইল। মন্মথনাথ সুকুমারের মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেই চিরপ্রফুল্ল মুখজ্যোতিঃ ম্লান হইয়াছে। হৃদয়ের ঘোর অশান্তি নিষ্প্রভ নয়নদ্বয়ে আপন প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছিল। আজি সুকুমারের এ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনে মন্মথনাথ অন্তরে ব্যথা পাইলেন।

* * * *

মন্মথনাথ সকল শুনিলেন। সুকুমার কহিলেন—মন্মথ! তুমিই সুখী। এতদিন বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিলেও কতবার উৎসাহ হারাইয়াছিলাম। কই মৃন্ময়ী ত একদিনও আমাকে উৎসাহ দেয় নাই। এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। বিদায়ের কালে মৃন্ময়ীর মুখে ত’ একটা উৎসাহের কথা শুনিলাম না। কতবার মৃন্ময়ীর মুখে চাহিয়াছি—সমবেদনার কত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি—কিন্তু প্রতিপদেই তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। আপনিই হতাশ্বাস হইয়াছি—আপনিই আবার নিরুপায় হইয়া আশা ধরিয়াছি। কিন্তু ভাই! আমার তুলনায় তুমি কত সুখী! তুমি প্রতিপদে উৎসাহ পাইয়া থাক। তোমার প্রত্যেক কার্য্যে তোমার প্রিয়তমার সহৃদয়-দৃষ্টি পতিত হয়। তোমার আর্থিক অবস্থা আমার অপেক্ষা উন্নত না হইলেও তুমি অধিকতর সুখের অধিকারী। ভাই আমি ভূতের বোঝা বহিলাম। স্ত্রী হইয়া যদি তাহার চিত্তে ভক্তি ও ভালবাসা প্রস্ফুটিত না হয় তবে আর বৃথা খেলাঘর সাজাইয়া ফল কি ভাই?

মন্মথনাথ সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কেন না তখন স্ত্রীর ভক্তি ও ভালবাসার কথায় তাঁহার হৃদয়ে মনোরমার অপরিসীম প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার নিকট প্রেমের আদর্শ উচ্চ না থাকিলেও তিনি যে বস্তুতঃ সে বিষয়ে সুকুমার অপেক্ষা অধিক সুখী তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যখন মন্মথনাথ সুকুমারের কাছে মনোরমার অপরিসীম প্রেমের কথা বলিতেন তখন সুকুমার তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন ‘ওহে এখন নূতন, তাই এত সুন্দর দেখাইতেছে। এখনকার অবস্থা স্বাভাবিক নহে। অগ্রে ফেণা মিলাইতে দাও—তার পরে এ কথা শুনিলে সুখী হইব।’ সে ত’ অনেক দিনের কথা। আজিও যখন মন্মথনাথ সাহস করিয়া সেই কথা বলিতেছেন তখন মন্মথ যে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সুখী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পরিশেষে মন্মথ কহিলেন ‘হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে শিখ। তবেই সব মনের মত হইবে। ভালবাসার জয় চিরকাল।

(৭)

বাটিতে মৃন্ময়ীর প্রথম প্রথম পাঁচ সাত দিন এক প্রকার কাটিল। কয়েক দিন পূর্ব্বমত অনতিগভীর রাত্রিতে সুকুমারের কথা ভাবিতে ভাবিতে মৃন্ময়ী নিদ্রা যাইতেন। কিন্তু অধিক দিন মৃন্ময়ীর এরূপ কাটিল না। স্বামীর সেই বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কয়টি স্খলিত কথা মৃন্ময়ীর চিত্তে জাগিয়া উঠিল। ‘অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে মানুষে চেষ্টা করিয়া সুখী হইতে পারে না।’ তবে কি তিনি সুখী নহেন? স্বভাবতই মৃন্ময়ীর মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল। কিন্তু কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? সুকুমার বাটিতে থাকিলে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও করিতে পারেন—কিন্তু তিনি ত’ বাটীতে নাই। আসুন, জিজ্ঞাসা করিব। এইরূপ সংকল্প করিয়া মৃন্ময়ী কিছু নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহার পাঁচ ছয় দিন পরে মৃন্ময়ীর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বাটিতে মহা আনন্দ। সুকুমারের কাছে ভৃত্যগণ ছুটিল। তাহার পর তাহারা ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দিল যে সুকুমার কোনো বিশেষ কার্য্যে এক মাসের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। চিন্তার কোনো কারণ নাই, নির্দ্দিষ্ট সময়েই তিনি ফিরিবেন।

এত আনন্দে এই সংবাদ একটু নিরানন্দের কারণ হইল। যাহা হউক কেহ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন না।

কিন্তু বিশেষ চিন্তিত হইলেন মৃন্ময়ী। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আমার কাছে থাকিলে তিনি সুখী হন না বলিয়াই হয়ত' আমাকে দেখিতে আসিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে মৃন্ময়ী বিষণ্ণা হইলেন। দুইটী বৃহচ্চক্ষু হইতে পাংশু-শীর্ণ-কপোল বহিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। নাসাগ্র ও অধর স্ফীত হইয়া উঠিল।

মৃন্ময়ী স্বামীর জন্য এই প্রথম চক্ষুজল ফেলিলেন।

(৮)

অশ্রুজল মুছিয়া মৃন্ময়ী উৎকণ্ঠায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। প্রতীক্ষার দিন স্বভাবতই দীর্ঘ হয়। মুখ চাওয়া প্রভাত আসিতে বিলম্ব করে। নিষ্ফল আশা ও আকাঙ্ক্ষায় মৃন্ময়ী জর্জ্জরিতা হইয়া উঠিলেন। সেই ক্ষিন্না ক্লিষ্টা মৃন্ময়ী সূতিকাগারে পীড়িতা হইয়া বিরহ-দীর্ঘ দুইটী মাস অতিবাহিত করিলেন। শারীরিক ও মানসিক এই উভয়বিধ ক্লেশে মৃন্ময়ীর রমণীয় লাবণ্য এককালে বিনষ্ট হইল।

সুকুমার বাটী আসিলেন না। মৃন্ময়ীর পীড়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া দেখিতে লাগিলেন।

একদিন হঠাৎ মৃন্ময়ীকে দেখিতে আসিয়া ডাক্তার মুখ বিকৃত করিলেন। সুকুমারের পিতা কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন উনি যে বসন্তরোগে ভুগিতেছেন উহাতে দৃষ্টির বিশেষ ক্ষতি করিবে।

বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। মৃন্ময়ী চক্ষে কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না। ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

ঠিক এমনি সময়ে সুকুমার বাটী আসিলেন। * * * * সুকুমার সব অবগত হইলেন। উদ্বেলিত চিত্তে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া শীর্ণা মৃন্ময়ীর দিকে দেখিলেন। তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ম্লান কণ্ঠে ডাকিলেন "মৃন্ময়ি"!

মৃন্ময়ী অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিলেন—'আমার শেষ সময় দেখা দিতে আসিয়াছ! যদি দয়া দেখাইলে তবে কাছে আইস তোমায় একবার স্পর্শ করি। আমি অন্ধ হইয়াছি। তোমার মুখখানি আর দেখিতে পাইব না। ছেলের মুখ দেখিতে পাইলাম না। আমার কত সাধে ছাই পড়িল। তুমিই তাহাকে দেখিও। অমি হয়ত' আর অধিক দিন থাকিব না। এত দিনে তোমায় বুঝিয়াছি। যদি বাঁচি তবে তোমায় আর অসুখী হইতে হইবে না।'

দেড় মাস পরে ডাক্তার কহিলেন এযাত্রা বোধ হয় ইনি রক্ষা পাইলেন। কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন কি না বলিতে পারি না। চেষ্টা করিয়া দেখি যদি চক্ষু ভাল হয়।

আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, তীব্র বেদনায়, সুকুমার দিন কাটাইতে লাগিলেন।

আসিরীয় দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা।

বিরোসাস নামক বেবিলন দেশীয় এক জ্যোতির্ব্বিৎ আসিরিয়া দেশীয় এক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। বিরোসাস খৃষ্টের জন্মের ৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে বেবিলনে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের মতে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে। বিরোসাস ২৮০ খৃষ্টাব্দে ৩ খণ্ডে এই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাসের খণ্ডাংশ মাত্র পাওয়া

গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ঐতিহাসিক হিসাবে এই ইতিহাসের মূল্য কত তাহা অনুমান করা যায় না। "Historians History of the world" সম্পাদক হেনরী স্মিথ উইলিয়ামস্ মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "Modern Historian known nothing of a King Ninus or of any warlike female ruler of Assyria. Nevertheless. This stony has true historical value as showing the manner of tradition that may be woven about the half remembered facts of history. The account has interest for another reason; it is a record that passed current as the authensic history of Assyria for some eighteen hundred years from classical times till after the middle of the 19th century."*

বিরোসাসের ইতিহাসের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে যে খণ্ডে ভারতবর্ষের কথা আছে অদ্য আমরা তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

অতি পুরাকালে আসিরিয়া দেশে লিনাস নামক এক রাজা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী সেমিরামিসকে রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ও তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র নিনিয়াসের ভারার্পণ করিয়া যান। তৎকালে রাজ্ঞী সেমিরামিসের ন্যায় সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং বীরারমণী কেহই ছিলেন না। রাজ্ঞী সেমিরামিস প্রথমতঃ তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত শেষ করিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েন। তিনি শুনিতে পান যে ভারতবাসীরাই পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এদেশের ন্যায় উর্ব্বরা দেশ আর কুত্রাপি নাই। ভারতবর্ষে এত নদ ও নদী যে সে প্রকার সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা দেশ আর নাই। ষ্টাব্রোবেটীস তখন ভারতের রাজা ছিলেন; যুদ্ধের জন্য সদাসর্ব্বদাই তাঁহার অনেকগুলি হস্তী প্রস্তুত থাকিত। অধিবাসীরা সকলেই ধনাঢ্য ছিল এবং সে দেশে এত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যাদি জন্মিত যে সেদেশে কোন দিনই দুর্ভিক্ষ হইত না। ভারতবর্ষে স্বর্ণ. রৌপ্য, তাম্র, লৌহ এবং অনেকানেক মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া রাজ্ঞী ভারত অধিকারের জন্য বিশেষ উৎসাহান্বিতা হইলেন। যদিও ভারতবাসীরা কোনরূপেই তাঁহার ক্রোধোদ্দীপন করে নাই তত্রাপি লোভ সকলের উপরই আধিপত্য করে। যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহের জন্য রাজ্ঞী তাঁহার অধীনস্থ সকল প্রদেশের শাসন কর্ত্তার নিকট পত্র দিলেন এবং যাহাতে সকলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত সাজ সহায় সহিত হইয়া উপস্থিত হয় তাহার আদেশ প্রদান করিলেন। সূত্রধরদিগকে আদেশ দিলেন যেন তাহারা এরূপ প্রণালীতে জাহাজ প্রস্তুত করে যাহা আবশ্যক মত খণ্ড ২ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়া যাইতে পারে। * সিন্ধুনদী পার হইবার জন্য অনেক জাহাজের দরকার কিন্তু ঐ

---

* "Semiramis the Assyrian Queen, took in hand an expedition against India, but died before she could execute her design" Arrian. এই উক্তির সহিত অন্য উক্তির কত প্রভেদ?

* আরিয়ান পাঠে জানা যায় যে গ্রীকবীর আলেকজান্দারও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন Arran v. 8.

নদী-তীরবর্ত্তী প্রদেশে জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ না থাকায় তাঁহাকে এই প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

ভারবাসীরা হস্তীর উপরে থাকিয়া যুদ্ধ করে। রাজ্ঞী সেমিরামিসের হস্তী না থাকায় এবং সেই অভাব দূরীকরণ মানসে তিনি অনেকগুলি কৃত্রিম হস্তী প্রস্তুত করেন। কৃষ্ণবর্ণের তিন লক্ষ ষাঁড় বধ করিয়া তিনি তাহাদের চামড়া দিয়া হস্তীর সদৃশ অনেকগুলি জন্তু প্রস্তুত করিয়া খড় দিয়া উহাদের উদর পূর্ণ করিলেন। এই সমস্ত কৃত্রিম হস্তী বহন করিবার জন্য অনেকগুলি উষ্ট্রও ক্রয় করিলেন। যাহাতে শত্রুগণ এই ছল চাতুরী না জানিতে পারে সেই জন্য নিভৃতস্থলে উপযুক্ত লোক ও বিশ্বস্ত প্রহরীর তত্ত্বাবধানে এই নূতন জন্তুগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল।

এই সমস্ত আয়োজন শেষ করিতে পূর্ণ দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপর ত্রিশলক্ষ পদাতিক, একলক্ষ রথ, একলক্ষ উষ্ট্রারোহী দীর্ঘ তরবারী-ধারী-সৈন্য এবং একসহস্র রণপোত লইয়া তিনি ব্যাকট্রিয়া হইতে যুদ্ধযাত্রা করেন। যাহাতে ঘোটকেরা প্রকৃত হস্তী দেখিয়া ভয় না পায় তজ্জন্য কৃত্রিম হস্তীগুলির নিকট অশ্বগণকে আনয়ন করা হইত—এই প্রকারেই তাহাদের হস্তী-ভীতি দূরীভূত হয়।

ভারতীয় রাজা ষ্টাব্রোবেটীস যখন এই অভিযানের বৃত্তান্ত লোকপরম্পরায় অবগত হইলেন তখন তিনিও নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সেমিরামিসকে যাহাতে পরাজয় করিতে পারেন তজ্জন্য তিনিও উদ্যোগে ব্রতী হইলেন। প্রথমেই তিনি চারি সহস্র বেতের নৌকা প্রস্তুত করিলেন। তৎপর, ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহে তৎপর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এক প্রচণ্ড বাহিনী প্রস্তুত হইল। রাজা তাঁহার যে সমস্ত যুদ্ধ-হস্তী ছিল তদ্ব্যতীত আরও অনেক হস্তী যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া সেমিরামিসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কোনরূপ উত্তেজনার কারণ না থাকাতেও কেন রাজ্ঞী সেমিরামিস যুদ্ধার্থ উপস্থিত তাহার কারণ জানিবার জন্য পত্র প্রেরণ করিলেন। দূত তাহার বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া পরে নিবেদন করিল যে সেমিরামিস যদি প্রত্যাগমন না করেন ষ্টাব্রোবোটাস, সেমিরামিসকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ক্রস বিদ্ধ করিয়া প্রদর্শনীর আগারে রাখিয়া দিবেন। সেমিরামিস দূতকে সসম্মানে বিদায় দিয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়া সিন্ধুনদীতীরে দেখিলেন যে বেতসের নৌকা লইয়া ভারতীয় রাজা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। নৌসেনা লইয়া রাজ্ঞী যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং অন্যান্য সৈন্যদেরও প্রস্তুত হইবার আদেশ দিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল; উভয় পক্ষই যথেষ্ট বীরপণা দেখাইলেন কিন্তু ভারতীয় বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার এক প্রকার চিরন্তন প্রথানুসারে বিদেশিনীর অঙ্কেই নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে একলক্ষ ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইল।

সেমিরামিস একটী নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়া রাজার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। মাত্র ষষ্টিসহস্র সৈন্য এই নৌ-সেতু রক্ষণে নিযুক্ত থাকিল। কৃত্রিম হস্তীগুলির কথা শুনিয়া রাজা ষ্টাব্রোবোটাস অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কেননা আসিরিয়ার রাণীর হস্তী পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক,

গুপ্তচরে রাজাকে সঠিক সংবাদ দিলে রাজাও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার অশ্বারোহী এবং রথীগণকে সম্মুখীন হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ভারতীয় অশ্বগণ এই নূতন রকমের হস্তী দেখিয়া এবং ঘ্রাণে ও নূতনত্বের আঘ্রাণ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়নপর হইল। এই অবসর বুঝিয়া সেমিরামিস একদল সুশিক্ষিত সৈন্যসহ ভীমবেগে ভারতীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। রাজা ষ্টাব্রোবেটীস ও ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং নিজ পার্শ্বচর পরিবেষ্টিত হইয়া রাণীকে আক্রমণ করিলেন। ভারতীয় হস্তীগণও এই সময়ে মদমত্ত হইয়া আসিরিয়ানদিগকে আক্রমণ করিল। ষ্টাব্রোবেটাস সেমিরামিসকে আহত করিলেন কিন্তু দ্বিতীয় তীর ছাড়িবার পূর্ব্বেই সেমিরামিস পলায়ন করিতে লাগিলেন। উভয় সৈন্য ভীষণ যুদ্ধ করিতে করিতে নৌসেতুর উপর উপস্থিত হইলে সেমিরামিস সুকৌশলে নিজ সৈন্যের অনেকাংশ পার হইয়া গেলে সেতুর বন্ধনাদি কাটিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে অনেক ভারতীয় সৈন্য বিনষ্ট হইল কিন্তু যুদ্ধে, পথশ্রমে এবং অন্যান্য কারণে সেমিরামিস যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহার একতৃতীয়াংশ লইয়া ফিরিতে পারিলেন না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

চিন্তে পাগ্‌লা।

উপক্রমণিকা।

অনেক দিন গত হইল আমাদিগের গ্রামে হরশঙ্কর ঘোষাল নামে একজন সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। সঙ্গতিপন্ন বলিলেই যে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন এরূপ নহে। তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহার কিয়দংশ তিনি নিজে চাস করাইতেন এবং অবশিষ্টাংশ প্রজাবিলি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সম্পত্তির উপস্বত্ব সমস্তই তাঁহার সংসার প্রতিপালনকার্য্যে ব্যয়িত হইত না। কিয়ৎ পরিমাণে উদ্বর্ত্ত থাকিত।

যখন ঘোষাল মহাশয়ের শৈশবাবস্থা তখন এদেশে ইংরাজিবিদ্যার এতদূর প্রচলন ছিল না। যদিও তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যার সমধিক আলোচনা ছিল তথাপি ঘোষাল মহাশয় সে বিদ্যা উপার্জ্জন করেন নাই কারণ যাঁহাদিগকে যাজ্যক্রিয়া বা দীক্ষাদিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত তাঁহারাই কেবল সংস্কৃত বিদ্যার আদর করিতেন। যাঁহাদিগের সংসার নির্ব্বাহের জন্য কোনরূপ অনাটন ছিলনা বা যাঁহাদিগকে ঐরূপ কোনও বৃত্তির পথাবলম্বী হইতে হইত না তাঁহারা বড় একটা কষ্ট স্বীকার করিয়া সংস্কৃত বিদ্যা অভ্যাস করিতেন না। অতএব ঘোষাল মহাশয় পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট যাহা কিছু বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। তিনি মধ্যাহ্নে আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিয়া কিয়ৎকাল রামায়ণ বা মহাভারতাদি পাঠ করিতেন

পরে গ্রামের পাঁচজনের সহিত একত্রিত হইয়া নানা প্রকার গল্পগুজব ও তাম্রকূটের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতেন। এতদ্ভিন্ন সময়ের অপর কোনও সদ্ব্যবহার তিনি শিক্ষা করেন নাই।*

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে স্বচ্ছন্দতা থাকিলে তাৎকালিক লোকের যেরূপ একটা দোষ সচরাচর দেখা যাইত সেই দোষটা ঘোষাল মহাশয়ের কিছু অধিক মাত্রায় ছিল। তিনি অন্নের অতিশয় অপব্যয় করিতেন। যদ্যপি হরশঙ্কর ঘোষালের রুচি এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত মার্জ্জিত হইত তাহা হইলে তিনি সংসার নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিতেন তদ্দ্বারা তাঁহার পত্নীর অলঙ্কারাদি কিম্বা ভূমিসম্পত্তি ক্রয় করিয়া নিজের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঘোষাল মহাশয়ের হৃদয়ক্ষেত্রে এরূপ জ্ঞান আদৌ অঙ্কুরিত হয় নাই। অধুনা আমরা ইংরাজি-শাস্ত্রের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী; কারণ তাহার বিশদ বৈজ্ঞানিক আলোক সাহায্যে আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি যে ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান করিলে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এমন নয়, দেশের অবনতির দ্বার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কারণ বলিষ্ঠ ভিক্ষাজীবিগণ ভিক্ষান্বেষণে যে সময় বৃথা নষ্ট করিয়া থাকে সেই সময় শিল্প কিম্বা অন্য কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইলে আপনাদিগের বিলক্ষণ সঙ্গতি ও দেশের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারে। ইংরাজি অনভিজ্ঞ হরশঙ্কর ঘোষাল এই সারগর্ভ উপদেশ কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই, সুতরাং মধ্যাহ্নে যে কেহ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইত তাহাকেই অকাতরে অন্নদান করিতেন; দানের পাত্রাপাত্র বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। ইহাতে তিনি দেশের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন তাহা তিনি একদিনের জন্যও বুঝিতে পারেন নাই! আলস্যপ্রিয় লোকেরাও এমন সুবিধা উপেক্ষা করিত না, তাহারা উদরান্নের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা বা পরিশ্রম না করিয়া যথাকালে ঘোষাল মহাশয়ের গৃহে আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিত এবং উদরপূর্ণ করিয়া অন্ন ধ্বংস করিত। হরশঙ্করের গৃহিণীও এবিষয়ে বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। এই সকল অনাহূত লোকের ভোজনের জন্য তাঁহাকে রন্ধনকার্য্যে প্রায় সমস্ত দিবসই ব্যাপৃত থাকিতে হইত এবং কোন কোন দিন দিবসে তাঁহার আহারই হইত না। তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ হইত না। একদিন তাঁহার কোন একজন প্রতিবেশিনী তাঁহাকে এরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "বাছা, আমরা স্ত্রীলোক আমাদিগের পরিশ্রমকে ভয় করিতে নাই। যদি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পাঁচজনের পাতে অন্নই দিতে না পারিলাম তাহা হইলে নারীদেহ ধারণের ফল কি হইল, মা?"*

* টীকা—আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই সকল আলস্যপ্রধান লোক জগতের একপ্রকার ভার স্বরূপ। বোধ হয় এই অযথা ভারের লাঘবের জন্যই এদেশে উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষ এবং নানাবিধ উৎকট রোগের আবির্ভাব হইয়া বৎসর বৎসর বহুল পরিমাণে লোকক্ষয় হইতেছে।

* টীকা—ইহাতেই বোধ হয় সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন যে ঘোষাল গৃহিণী লেখা পড়ার নাম মাত্রও জানিতেন না। নতুবা তিনি নিজের স্বাস্থ্যের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিতেন না কেন?

এই সকল কারণবশতঃ ঘোষাল মহাশয়ের বাটিতে কুপোষ্যের অভাব ছিল না। তন্মধ্যে একজনের নাম চিন্তে পাগলা। চিন্তে পাগলা কে, কোথা হইতে কি প্রকারে আসিয়াছিল, কিম্বা কোথায় তাহার জন্মস্থান কেহই তাহা জানিত না। বাঙ্গালার ইতিহাসেও চিন্তে পাগলার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। অতএব চিন্তে পাগলা একজন পাগল লোক অগত্যা আমরা এই মাত্র পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। চিন্তে পাগলার প্রকৃত নাম চিন্তামণি কিনা এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না, কারণ তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে "চিন্তে পাগলা" বলিয়াই পরিচয় দিত; যদ্যপি কেহ তাহাকে আদর করিয়া চিন্তামণি বলিয়া ডাকিত তাহাতে সে উত্তর দিত না। চিন্তে পাগলা বলিয়া ডাকিলেই সন্তোষলাভ করিত।

চিন্তে পাগলা হরশঙ্কর ঘোষালের বাটিতে থাকিত। ক্ষুধা পাইলে আসিয়া আহার করিত এবং প্রয়োজন হইলে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শয়ন করিত। প্রয়োজন হইলে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সে কখনও একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না; প্রায়ই পথে পথে, ঘাটে, মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত; ঝড়, বৃষ্টি, শীত, আতপ প্রভৃতি কিছুই গ্রাহ্য করিত না। যখন সে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন কখনও হাসিত কখনও কাঁদিত আবার আপনা-আপনি কত কি বলিত। চিন্তে পাগলা নিরক্ষর ছিল না; তাহার প্রমাণ আমরা প্রত্যহ পাইতাম। সে মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিত এবং একখানা খাতা বাহির করিয়া তাহাতে কি লিখিয়া রাখিত। কি লিখিত কাহাকেও তাহা দেখাইত না এবং কেহ তাহা দেখিতেও চাহিত না। খাতাখানি সে অতি গোপনভাবেই রাখিয়া দিত।

পাগল লোকের কার্য্যকলাপ কিছু অস্বাভাবিক ধরণের, চিন্তে পাগলার কার্য্যগুলিও সেইরূপ ছিল। সে পথে যাইতে যাইতে কোথাও গর্ত্ত দেখিলে তাহা অন্যস্থান হইতে মাটি আনিয়া পূরণ করিয়া দিত; কাঁটা, খোঁচা ইত্যাদি দেখিলে তাহা দূরে ফেলিয়া আসিত। বিষ্ঠা থাকিলেও তাহা স্থানান্তরিত করিয়া সে স্থান গোময় দিয়া পরিষ্কার করিত। এই শেষোক্ত কার্য্যের জন্য কেহই তাহাকে স্পর্শ করিতে চাহিত না এবং সে যখন পথ দিয়া চলিয়া যাইত তখন লোকে পাশ ভাঙ্গিয়া সরিয়া যাইত। এতদ্ভিন্ন চিন্তে পাগলার আরও অনেক অপকর্ম্ম ছিল। কেহ পুষ্করণীতে ছিপ ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেছে, চিন্তে পাগলা অমনি তাহার চারের উপর উপর্য্যুপরি লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যধারী বিরক্ত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সে পুষ্করণীতে ঝম্প-প্রদান-পূর্ব্বক জল তোলপাড় করিতে করিতে সন্তরণ-দ্বারা অপর পাড়ে উঠিয়া পলায়ন করিত। সুতরাং মৎস্যধারীকে সে দিবস বিরত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইত। পরে এতদূর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, কেহ মৎস্য ধারণ কালে চিন্তে পাগলাকে দেখিলেই ছিপ গুটাইয়া উঠিয়া যাইত। কেহ মাঠে ঘুনি কিম্বা আড়া পাতিয়া রাখিলে চিন্তে পাগলার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র অমনি সেগুলিন দূরে ফেলিয়া দিয়া স্রোতের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিয়া

আসিত। কোথাও আবার স্তন্যপায়ী বৎস বদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে, দূরে তৎপ্রসূতী বারম্বার তাহার প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া ঘন হাম্বারবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে, চিন্তে পাগলা ধীরে ধীরে যাইয়া বৎসের বন্ধন মোচন করিয়া দিত এবং দূরে দাঁড়াইয়া তাহার সোৎসুক দুগ্ধপান নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে হাস্য করিত। ইহাতে অনেক গৃহস্থকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত সন্দেহ নাই। কোথাও শাকুনিক, পক্ষী ধরিবার জন্য ফাঁদ কিম্বা আটাকাঠি পাতিয়া রাখিয়াছে চিন্তে পাগলা তাহা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। এইরূপ ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য গ্রামবাসিগণ তাহার উপর হাড়ে চটিয়াছিল, কিন্তু কি করিবে, চিন্তে পাগলার শরীরে বল অপরিমেয়, দুই চারিজনে তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, কাজেই তাহার উপর গালিবর্ষণ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

গ্রামের সকল লোকই যে চিন্তে পাগলার উপর বিরক্ত ছিল, একথা আমরা বলিতে পারি না। কেননা অনেকে তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিত এবং তাহার বিশেষ কারণও ছিল। কাহারও গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, তাহা নির্ব্বাণ করিতে না পারিয়া পরিবারবর্গ হাহাকার করিতেছে আর প্রতিবাসিগণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতেছে। কিন্তু এদিকে বহ্নিদেব শতজিহ্বা বাহির করিয়া চতুর্দ্দিক গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছেন সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময়ে চিন্তে পাগলা দৌড়িয়া আসিয়া দুই হস্তে দুইটী কলসী লইয়া এবং পুষ্করণী হইতে জল পূর্ণ করিয়া নিজের জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপ বারম্বার জলভার বহন করিয়া অচিরেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চিন্তে পাগলার শরীরে বল অসীম, এরূপ সময়ে তাহার বল যেন দ্বিগুণতর হইয়া উঠিত। কোন লোক রুগ্নশয্যায় পড়িয়া আছে, লোকাভাবে তাহার শুশ্রূষাদি হইতেছে না, চিন্তে পাগলা তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অহোরাত্র তাহার পরিচর্য্যা করিত। সে অবস্থায় চিন্তে পাগলার অনশনেই দুই চারি দিন কাটিয়া যাইত, কিন্তু তাহাতে সে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিত না। কোন গৃহস্থের বাটিতে মৃতদেহ পড়িয়া আছে, লোকাভাবে তাহার সৎকার হইতেছে না, চিন্তে পাগলা একাই তাহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহাদি কার্য্য সমাধা করিয়া আসিল। তৎকালে চিন্তে পাগলাকে একা একশত বলিয়া বোধ হইত।

গ্রামবাসিনী-স্ত্রীলোকেরা চিন্তে পাগলাকে দেখিয়া বড় একটা লজ্জা করিত না। কারণ চিন্তে পাগলার মনুষ্যের মত আকার প্রকার থাকিলেও, তাহার ভিতর মনুষ্যত্বসূচক কোন একটা পদার্থ আছে একথা রমণীরা আদৌ বিশ্বাস করিত না। চিন্তে পাগলাও দুই একটি বয়স্থা গৃহিণী ব্যতীত অন্য কোন রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিত না, এমন কি স্ত্রীজাতির ছায়া পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে তাহার বিরক্তি বোধ হইত। কিন্তু গ্রামের বালকেরা তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। চিন্তে পাগলা বালকগণকে দেখিলেই কাহাকেও কোলে লইয়া নৃত্য করিত, কাহাকেও স্কন্ধে আরোহণ করাইত, কাহারও বা হস্ত পদ ধারণ করিয়া দোল খাওয়াইত এবং

কাহারও সহিত করতালি-যোগে গান করিত। আবার ফলের সময় হইলে বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল পাড়িয়া বালকদিগকে খাইতে দিত। এজন্য বালকেরা চিন্তে পাগলাকে দেখিলেই হর্ষধ্বনি করিত এবং কোলাহল করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিত।

এইরূপে কাহারও বা বিরাগভাজন হইয়া এবং কাহারও বা অনুরাগভাজন হইয়া হরশঙ্কর ঘোষালের আশ্রয়ে চিন্তে পাগলার জীবনের অনেকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন চিন্তে পাগলা কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, ক্রমে অনেকদিন কাটিয়া গেল। পরে একমাস, দুইমাস করিয়া কতিপয় মাসও অতিক্রান্ত হইল তথাপি চিন্তে পাগলা ফিরিল না। তখন কেহ অনুমান করিলেন হয়ত, সে কোনগতিকে মারা গিয়া থাকিবে। কেহ বলিলেন পাগলের মতিস্থির নাই হয়ত, অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এ বিষয়ের অনেক অন্দোলন হইল বটে কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসা কিছুই হইল না। এই ঘটনায় গ্রামের কতক লোক হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিল সে যেখানেই যাউক এক প্রকার আপদ গিয়াছে, আবার কতক লোক বলিল আহা! সে পাগল বটে কিন্তু বড় পরোপকারী ছিল, অনেকের বিপদে মাথা দিত। ঘোষাল মহাশয় চিন্তে পাগলার জন্য কয়েক দিন বিষণ্ণ ভাবে রহিলেন এবং তাঁহার গৃহিণী প্রায়ই তাহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

কিছুদিন পরে যখন ঘোষাল মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল, তখন দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার সময় চিন্তে পাগলার সেই খাতাখানি বহির্গত হয়। পাগল খাতায় কি লিখিত ইহা দেখিবার জন্য সকলেরই ঔৎসুক্য জন্মিল এবং তাহা লইয়া পাঠ করিতে লাগিল। আমরাও পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থ তাহার অদ্যোপান্ত শুনাইব।

ক্রমশঃ

শ্রীউমাচরণ মিত্র।

বর্ণ-চিত্রণ।

(৫৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিতাংশের পর)

চিত্রের সম্মুখভূমিই (Foreground of Picture) প্রকৃতপক্ষে চিত্রের আভ্যন্তরিক ভাবসমূহের পরিচয় প্রদান জন্য প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজের মোহনরূপমাধুরী দেখাইতে দেখাইতে দ্রষ্টার পথপ্রদর্শকরূপে ইহা যেন ক্রমেই চিত্রের অন্তর হইতে অন্তরের মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে দ্রষ্টা বিমোহিত হইয়া তখন তদ্গত চিত্তে তাহার প্রতি নয়নার্পণ করিয়া তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে থাকে। সুতরাং শিল্পীর সেই অসাধারণ কৌশলকলাপ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহার উপরও নিতান্ত অল্পক্ষমতা বিস্তার করে না। বস্তুতঃ চিত্রের দূরত্ব ও বিশালত্ব আদি ভাবরাশি এই সঙ্কীর্ণ ও সম্মুখভুমির তুলনার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থাৎ চিত্রের তলরেখা বা তন্নিকটস্থ বস্তু দেখিয়াই চিত্রান্তর্গত যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

চিত্রের এই সম্মুখভূমি কোন, শিল্পীই নিতান্ত নিরাভরণ করিয়া কখন অঙ্কিত করেন না—পরন্তু

অতিশয় যত্ন সহকারেই উচ্চ উদ্ভাবনা দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কখন অনতিদীর্ঘ সুন্দর তরুলতা ও গুল্ম, নবপল্লবমুঞ্জরিত বা ফুল্লকুসুমদাম শোভিত, কখন কোনও নরনারী বা যে কোনও জীব জন্তু প্রকৃতির কোলে আপনমনে বিচরণ রত, আবার কখন বা শিল্পীর অভিলষিত যে কোন অদ্ভুত চিত্ত-বিনোদক বিচিত্র বস্তু যেন ঘটনাচক্রে চিত্রের সেই সম্মুখভূমিতে সমাবিষ্ট। তবে শিল্পীর স্মরণ রাখা বিধেয় এমন কোন অত্যুজ্জ্বল বর্ণ-সম্পাতে নিসর্গচিত্রের সেই সম্মুখভূমি কখনও চিত্রিত করা উচিত নহে যাহাতে চিত্রের নায়কাংশ-স্বরূপ মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তাহার সমক্ষে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ইহা কেবল-মাত্র মূল বস্তুর সৌন্দর্য্য-বিকাশে যাহাতে সম্পূর্ণ সহায়তা করে অথচ তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হয় এইরূপ করিয়া ইহার অঙ্কন কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

বৃক্ষাদি (Plants); সকল সময়েই নিসর্গচিত্রের সম্মুখভাগে যে, বৃক্ষলতাদি চিত্রিত করিতে হইবে তাহার এমন কিছু নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, কারণ অন্য নানাবিধ বস্তুর বিন্যাসদ্বারা (Fore ground) বা চিত্রের সম্মুখভূমি সুশোভিত করিতে পারা যায়। তবে চিত্রের দৃশ্যানুসারে শিল্পীর একান্ত ইচ্ছা হইলে বৃক্ষালতাদিও সম্মুখভূমির বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রদান করে। সেরূপ ক্ষেত্রে যে সকল তরুলতা চিত্রের সম্মুখভূমিতে বিন্যাস করিতে হয় তাহা চিত্রের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সুস্পষ্ট (Well finished) করিয়া অঙ্কিত করিবে। অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানানুসারে যেমন দূরস্থিত বস্তু ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া যায় সেইরূপ ক্রমে অস্পষ্টও হইয়া যায় সুতরাং সম্মুখভূমিস্থিত পদার্থনিচয় সমগ্র চিত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টই হইবে এবং তাহার গঠন, বর্ণ ও পরিকল্পনাদি হইতেই দূরস্থিত অস্পষ্ট বস্তু সকলের প্রকৃতভাব পরিজ্ঞাত ও অনুভূত হইবে। এরূপ স্থলে সম্মুখের বৃক্ষ লতাদির পত্র পল্লব ও বল্কল প্রভৃতির যথাযথ ভাববিন্যাস করাই কর্ত্তব্য।

প্রতিমূর্ত্তি (Figure)-নিসর্গচিত্রের পাত্রসমাবেশ উপলক্ষে চিত্রের মধ্যে সুবিধামত দুই একটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার প্রলোভন অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন না। বাস্তবিক গতিশীল মূর্ত্তির সমাবেশ দ্বারা নৈসর্গিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য ও সজীবতা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। অধিকাংশ সময়ে শিল্পীর চিত্র পরিসমাপ্ত হইবার পরেই তাহাতে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার কথা মনে হয়। বস্তুতঃ নিসর্গ চিত্রে মূর্ত্তিই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নহে সুতরাং চিত্র সমাপ্ত হইলেই কোনস্থলে তাহা অঙ্কিত করিলে ভাল দেখাইবে তাহা তখনই শিল্পীর বিচারাধীন হইয়া পড়ে।

বহু প্রসিদ্ধ প্রাচীন শিল্পাচার্য্য তাঁহাদের বিরাট ও সঙ্কীর্ণ-জাতীয় নিসর্গচিত্রের মধ্যে চিত্রের সৌন্দর্য্যও মনোহারিত্ব সম্পাদন জন্য স্থানে স্থানে মূর্ত্তির সমাবেশ করিয়াছেন। যখনই তাঁহারা এইরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তখনই গতিশীলভাবে চিত্রস্থ করিয়াছেন অর্থাৎ কোন স্থলেই নিশ্চল বা ক্রিয়াবিহীন করিয়া অঙ্কিত করেন নাই, সেই সকল মূর্ত্তি পশ্চাত-বিস্তৃত নিসর্গদৃশ্যাবলীর ক্রোড়ে যেন কর্ম্মরত বা ঘটনাচক্রে সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

সুশিল্পী এইরূপ মূর্ত্তি অঙ্কনকালে তাহার পরিমাণ-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হন, অর্থাৎ উহা কত বড় বা কত ক্ষুদ্র করিয়া অঙ্কিত করিলে চিত্রখানির প্রকৃতির সহিত উহার ঠিক মিলন বা মানান হইবে তাহা স্থির করিয়া লন। মূলকথা মূর্ত্তি প্রাকৃতিক-দৃশ্য-চিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, তবে দ্রষ্টার দর্শনাকাঙ্ক্ষা ও মনোযোগ উদ্বোধিত করিবার ইহা একটী অন্যতম উপায়মাত্র। সুতরাং পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানানুসারেও দূরস্থিত বিরাট তরুরাজির সম্মুখে এরূপ পরিমাণে মূর্ত্তি কল্পনা করা আবশ্যক যাহাতে তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিষম-পার্থক্য দর্শনমাত্রেই সূচিত হইতে পারে। যদ্যপি মূর্ত্তি, চিত্রের সম্মুখভূমিতে বৃহৎ করিয়া অঙ্কিত করা হয় তাহা হইলে পশ্চাতের দৃশ্যাবলী যেমন অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইবে সেইরূপ উহার গাম্ভীর্য্য ও বিশালত্বও হীন হইয়া পড়িবে, আর যদ্যপি নিতান্ত ক্ষুদ্র করিয়াই মূর্ত্তি অঙ্কিত হয় তাহা হইলে সেই বিরাট দৃশ্যের সম্মুখে তাহার অস্তিত্ব অত্যন্ত হেয় হইবে—তাহার উপযোগিতা আদৌ উপলব্ধি হইবে না। তবে বৃহদাকারের অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার মূর্ত্তিই বরং ভাল কারণ তাহাতে নিসর্গ-চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট না হইয়া কথঞ্চিৎ সজীবতা রক্ষা হইতে পারে। প্রকৃতকথা প্রাকৃতিক-চিত্রের মধ্যে মূর্ত্তি-কল্পনা কেবল তাহার সৌন্দর্য্য ও সজীবতা রক্ষার জন্য। যাহাতে প্রতিমূর্ত্তি জীবন্ত, কর্ম্মশীল ও নিসর্গচিত্রের কাল-বোধক এবং তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ হয় শিল্পীর তদ্বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ রাখা আবশ্যক।

তরুরাজি (Trees);—নিসর্গ-চিত্রের মধ্যে বিবিধ তরুরাজির সৌন্দর্য্য-সমাবেশ বোধ হয় উহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, বিভিন্ন বৃক্ষের পরস্পর আকার-গত ও বর্ণগত স্বাতন্ত্র্য, তাহাদের চাকচিক্য এবং অবিরত-পবন-কম্পিত সচলভাব বস্তুতই নিসর্গচিত্রের জীবনস্বরূপ। নানাবস্তু নানাভাবে বিচিত্র-বিধানে সমাবিষ্ট হইলেও তরুরাজিই নিসর্গচিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিতে হইবে। ইহাদের জাতিগঠন ও বর্ণগত স্বাতন্ত্র্যের বিষয় যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তদ্বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ ব্যতীত শিল্পী কখনই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবে না। শাল, তাল, তমাল, তিন্তিড়ি, আম, জাম, বিল্ব, বদরী, পনস, শিরিশ, নারি-কেল ও খর্জ্জুরাদি বিবিধ তরুর বিবিধ বর্ণ ও গঠন পত্র পুষ্প ও ফলের স্বাভাবিক বিচিত্র পার্থক্য নিসর্গ শিল্পীর ধীর অনুকরণ ও গভীর অনুশীলনের বিষয়ী-ভূত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অধিকাংশ শিল্পশিক্ষার্থী ও অনেক কৃতীশিল্পীরও এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য নাই। নিতান্ত অবহেলার সহিত উহা চিত্রিত করায় তাহাতে মাত্র তরুলতা বলিয়াই অনুভূত হয়, কাননের বা অরণ্যের অতি স্থূল দৃশ্যই প্রতীত হয় কিন্তু তাহাদের স্বাতন্ত্র্য আদৌ উপলব্ধ হয় না। ইংরাজ শিল্পিগণের অনুকরণ অর্থাৎ যাহারা জগতে প্রতিমূর্ত্তি চিত্রকর বলিয়াই বিশেষ প্রশংসিত তাহাদের মধ্যে দুই একজন অতি সাধারণ চিত্রকর যাহারা বেতনভোগি-শিল্পো-পদেষ্টারূপে অধুনা এদেশে উপস্থিত হন তাহাদেরই নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এ দেশীয় শিল্পিগণ ভ্রান্ত-ধারণা পুষ্ট হইয়া ইংরাজদের নিসর্গ-চিত্র-শিল্পী বলিতেও কুণ্ঠা অনুভব করেন না। অধিকন্তু ইংরাজ শিল্পী-চিত্রিত নিসর্গ-চিত্রের সেই ক্ষীণ আদর্শকেই সম্পূর্ণ

ও অভ্রান্ত বোধে গ্রহণ করিয়া অনুকরণ করেন মাত্র। আমি আমার শিক্ষকের নিকট তাঁহার বন্ধু ও উপদেষ্টা জর্ম্মান শিল্পি মিঃ স্থাঙ্কেল যিনি নিসর্গচিত্রেই বিশেষজ্ঞ এবং এদেশে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার চিত্র ও কার্য্য প্রণালী জানিয়াছি; ইতালির সুপ্রসিদ্ধ শিল্পীবর মিঃ জিওনলির উপদেশাবলী শুনিয়াছি যে, বৃক্ষাদির জাতিগত পার্থক্য সংরক্ষণ নিসর্গ-চিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার এবং অতি অল্পসংখ্যক পাশ্চাত্য শিল্পীও এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। প্রাচ্য-দেশীয় শিল্পীর যে, সে বিষয়ে লক্ষ্য ছিল না তাহা নহে, আমি এ দেশীয় দুই একটী পুরাতন পোটুয়া-দিগের চিত্রের মধ্যে অন্যান্য বহু দোষ সত্ত্বেও তরুরাজির স্বাতন্ত্র্যতা-চিত্রণের অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়াছি, আধুনিক সভ্য শ্রেণীর শিল্পীগণ তাহা পটুয়াদিগের চিত্র বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন কিন্তু অপক্ষপাত-গুণের আদর করিতে শিখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত শিল্পাচার্য্যগণের উপদেশ মত বলিতে হয় যে, "Those who come nearest to perfection in it, will make their works infinitely pleasing and gain a great name." যাঁহারা ইহাতে কথঞ্চিৎও কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাঁহারাই নিসর্গচিত্রশিল্পে জগত বিমোহিত করিয়া শিল্পগুরুর উচ্চ আসন অধিকার করিয়া থাকেন।

তরুরাজির এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি সত্ত্বেও তাহা-দের সাধারণ একটী ভাব আছে সে ভাব রক্ষা করি-বার সঙ্গে সঙ্গেই অতি সামান্য তুলিকাঘাতে তাহাদের পার্থক্য দেখান যাইতে পারে—কোন বৃক্ষের শাখা প্রশাখা স্বাভাবিক স্থূল, দীর্ঘ ও অসংখ্য অথবা অনতি-দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও সংখ্যায় বিরল, কোন জাতীয় বৃক্ষের বল্কল শুষ্ক পাটলবর্ণ ও অসমান কোন শ্রেণীর চিক্কণ হরিতাভা-বিশিষ্ট আবার কোথাও বা অল্প পীত বা লোহিতাভাযুক্তও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে নূতন ও প্রাচীন ভেদেও বহু পার্থক্য আছে আবশ্যকও সুবিধানুসারে নয়নতৃপ্তিকর বিভিন্নশ্রেণীর বৃক্ষ-লতার শিল্পী নিজ নিজ চিত্রের উৎকর্ষ ও মনোহারিত্ব সম্পাদন করিতে পারেন।

নিসর্গচিত্র সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, শিক্ষার্থিগণ অবশ্যই তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন এক্ষণে এতদ্বিষয়ে কার্য্য ও ইহার অভ্যাস সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

শিক্ষার্থী বা কৃতী নিসর্গচিত্রশিল্পী অনেকেই বিভিন্ননিয়মে প্রাকৃতিক চিত্র অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণের ন্যায় ইহার অনুকরণকাল শিল্পীর আয়ত্বাধীন নহে। প্রকৃতির অঙ্গে কখন যে কি ভাব ফুটিয়া উঠিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না—সুতরাং তাহারই অনুগত হইয়া শিল্পীকে অগ্রসর হইতে হইবে। সেই অতি সামান্যকালের মধ্যে, তাহার প্রধান প্রধান ভাবগুলির লাঞ্ছনক্রিয়া বা স্কেচ সম্পন্ন করিতে হয়। এই জন্য যাঁহার যেমন শিক্ষা বা যেরূপে সুবিধা হয় তিনি সেইরূপেই তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করেন কিন্তু সাধারণভাবে নিম্নলিখিত নিয়মটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।

প্রকৃতির অন্তর্গত সামান্য তৃণ হইতে মহীরুহ

শৈলখণ্ড ক্রমে অচল, অর্ণব, মেঘাঙ্ক ও আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্তই একই নির্দ্দিষ্টসময়ের মধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। সেই কারণ অতি সত্বর কাগজ পেন্সিলে সীমারেখা মাত্র অঙ্কিত করিয়া তাহারই স্থানে স্থানে ১।২ ক খ প্রভৃতি সংখ্যা বা বর্ণ চিহ্নিত করিয়া স্মরণ রাখিবার জন্য নিম্নে সেই সেই সংখ্যা বা বর্ণের উল্লেখান্তর তাহাদের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবে। যথা—মেঘ ক পাটল বর্ণ, মেঘ খ ঈষৎ সিন্দূর লোহিতাভাবিশিষ্ট গ স্কাই ব্লু, ঘ পাহাড় বার্ণ্ট আম্বারি ও ব্লু, এইরূপে নিজের বুঝিবার মত করিয়া সংক্ষেপে লিখিয়া লইবে। পরে ঘরে আসিয়া সুবিধামত তাহা বর্ণ-বিলেপনে সম্পন্ন করিতে যত্ন করিবে। জানা থাকিলে ক ক্রমেটিক প্লেটে একখানি আলোকচিত্র বা ফটো তুলিয়া লইলে আরও সুবিধা হয় (আলোক চিত্রণে দেখ) পূর্ব্বোক্তরূপে সামান্য সামান্য লিখিয়া আনিবার যে কত সুবিধা তাহা কার্য্য করিতে করিতে বুঝিতে পারিবে। কতকটা সেই লেখায় ও কতকটা মনে চিন্তা করিয়া সমস্তই স্মরণ হইয়া যাইবে পরে অবসরমতসময়ে পুনরায় সেই স্থানে যাইয়া অন্যান্য বিষয় দেখিয়া সম্পন্ন করিয়া লইবে। তরুলতা, পাহাড়, প্রস্রবণ সকল সময়েই প্রায় একরূপ থাকে তাহাদের আকারও পার্থক্য বড় সহজে দেখা যায় না তবে সময় বিশেষে আলোকের তারতম্য অনুসারে ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। সে সকল কথা পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি। যাহা হউক এ বিষয়ে অভ্যাসলাভ করিবার আর একটী বিধান শিক্ষার্থীর স্মরণ রাখা আবশ্যক অর্থাৎ একেবারেই প্রকৃতি (Nature) দৃষ্টে এ কার্য্য আরম্ভ না করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অঙ্কিত নিসর্গচিত্রাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করা আবশ্যক। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী, বর্ণসম্পাত ও পরিপ্রেক্ষিত-শুদ্ধ সীমাঙ্কন আদি পূর্ব্বোল্লিখিত সকল বিষয়ই মনোযোগ দিয়া দর্শন ও অনুকরণ করা বিধেয়। প্রতিমূর্ত্তিচিত্রণ অপেক্ষা নিসর্গচিত্রণ বিষয়গত কঠিন ক্ষেত্র ও বিস্তৃত ইহাতে নানাবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা আবশ্যক। সুতরাং সকল শ্রেণীর সকল চিত্র ও সকল আদর্শ হইতেই ইহার উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। মধুকরের ন্যায় নানাফুল হইতে তিল তিল মধু সংগ্রহ করিয়া ক্রমে নিজ শিল্প-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রস্তর চিত্রণ।

(১৬৮ পৃষ্ঠার প্রকাশিতাংশের পর)

স্বচ্ছকাগজ ও চিত্র স্থানান্তরিত করিবার কাগজ প্রস্তুত প্রণালী।

স্বচ্ছ কাগজ—এই কাগজের কথা উপরে বলা হইয়াছে এবং ইহার ব্যবহার কিরূপে করিতে হয় তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এ কারণ নিম্নে দুই একটী প্রকরণ প্রদত্ত হইল।

পাতলা শাদা কাগজ (Double Crown tissue paper) এক খণ্ড লইয়া কোন সমতল টেবিলের উপর স্থাপনপূর্ব্বক একটী ৪ ইঞ্চি বিস্তৃত

পাতলা তুলিকা দ্বারা (Flat hog hair brush) নিম্নলিখিত যে কোন একটী তৈল প্রস্তুত করিয়া উহাদ্বারা উক্ত কাগজ খণ্ডের এক পার্শ্ব উত্তমরূপে সিক্ত করিবে। অধিক কাগজ প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইলে টেবিলের উপর কাগজগুলি উপরে উপরে রাখিয়া উপরিকথিত নিয়মানুসারে তৈলাক্ত করিবে। কাগজগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া তৈলাক্ত করা না হয়। এইরূপ করিলে তৈল বৃথা ব্যয় করা হইবে।

১ম তৈল।

তারপিন তৈল ৬ ভাগ
রজন ১ ,,
বাদাম তৈল ১ ,,

Spirit of turpentine 6 parts
Resin ... ... I ,,
Boiled nut oil I ,,
By weight.

২য় তৈল।

কেনাডা বলসাম ১ ভাগ
তারপিন তৈল ১ ,,

Canada bolsam I part
Spirit of turpentine I ,,

৩য় তৈল।

মাস্তিক্ বার্ণিষ ১ ভাগ
তারপিন তৈল ১ ,,

Mostic Varnish I part
Oil of turpentine I ,,

৪র্থ তৈল।

রেড়ি তৈল (খাঁটি) ১ ভাগ
তারপিন তৈল ... ৩ ,,

Castor oil (pure) I part
Oil of turpentine 3 ,,

উপরেলিখিত তৈল সকলের মধ্যে শেষোক্ত তৈলটী সহজ প্রাপ্য এ জন্য ছাত্রগণ প্রথমে এই তৈলটী পরীক্ষা করিবে। তৈল উত্তমরূপে শুষ্ক না হইলে স্বচ্ছ কাগজ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

চিত্র স্থানান্তরিত করিবার কাগজ-প্রস্তুত-প্রণালী অতিশয় সহজ। পাতলা শাদা কাগজ (Double Crown tissue paper) এক খণ্ড লইয়া উহার এক পার্শ্বে লাল বর্ণের গুঁড়া (Indian red powder) উত্তমরূপে মাখাইয়া দিবে। একখণ্ড পাতলা বস্ত্রমধ্যে কিছু পরিমাণে উক্ত লাল গুঁড়া আবদ্ধ করিয়া ঐ কাগজের উপর থুব দিবে। কিম্বা লাল রং উক্ত পাতলা কাগজের উপরে সমভাবে ছড়াইয়া দিয়া এক টুকরা কাপড় দ্বারা মার্জ্জিত করিবে। পরে কাগজখানি উত্তমরূপে ঝাড়িয়া লইবে অর্থাৎ অতিরিক্ত গুঁড়া যেন কাগজের উপর অবস্থান না করে। কাগজখান রং মাখাইবার পূর্ব্বে কোন সমতল টেবিলের উপর স্থাপন করিবে। রং মাখাইবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন কোনপ্রকারে জল বা অপর কোন তরল পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত না হয় কিম্বা কাগজকে সিক্ত না করে। অপর অপর বর্ণের গুঁড়া দ্বারাও কাগজ সজ্জিত করিতে পারা যায়; কিন্তু লাল বর্ণ ব্যবহার সুবিধাজনক বিবেচনায় এস্থলে ঐ বর্ণ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করা হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্য প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সূচী।

শিক্ষা (ক্রমশঃ) শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব। ৯১
প্রবৃত্তি ... স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, ৯৭
আসিরীয় দেশের ইতিহাসে
ভারতের কথা ... শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। ১০২
চিন্তে পাগলা (ক্রমশঃ) শ্রীউমাচরণ মিত্র। ১০৫
বর্ণ চিত্রণ (ক্রমশঃ) শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী। ১০৯
প্রস্তর চিত্রণ (ক্রমশঃ) শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ১১৩

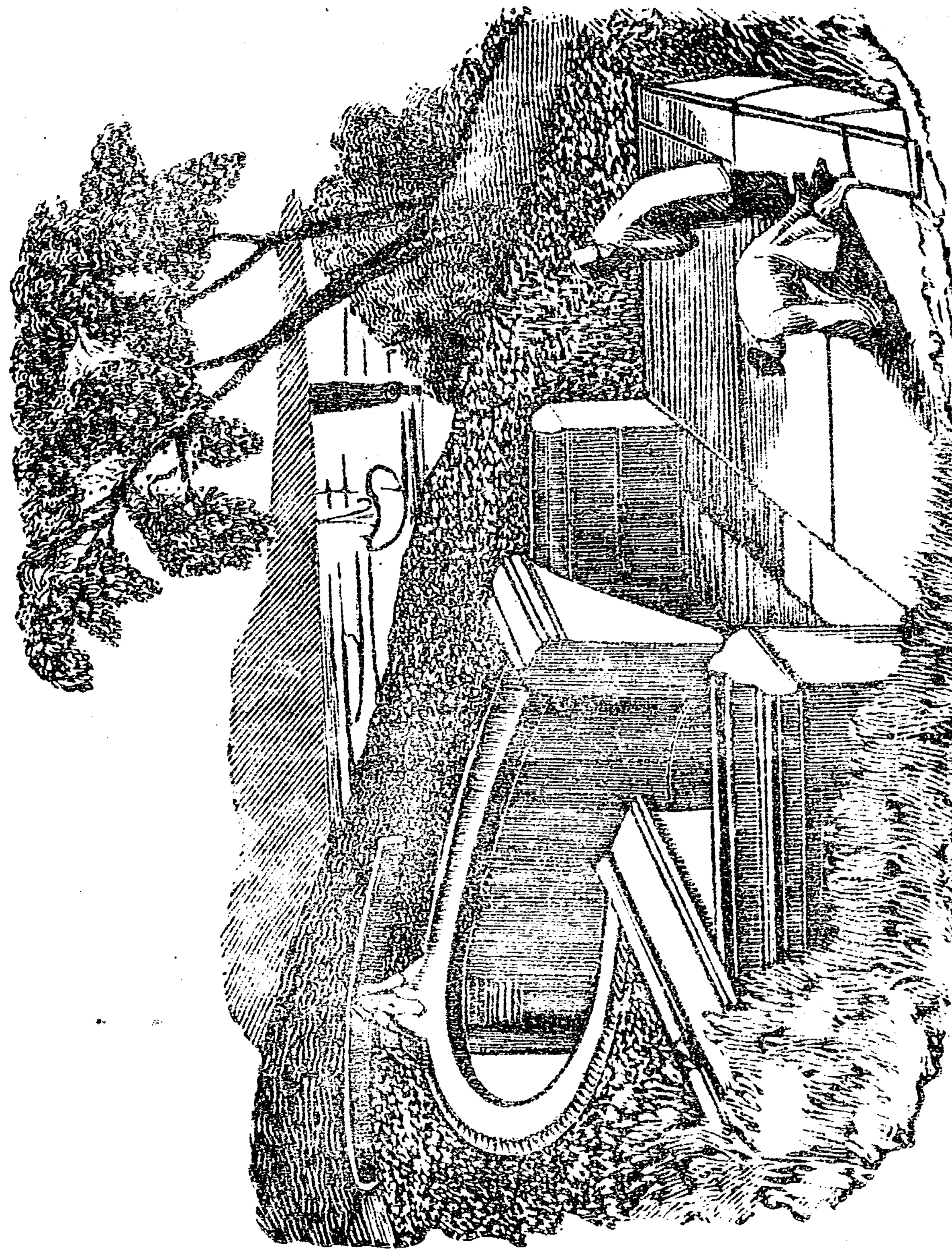

চীনের সমাধি-মন্দির।

শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত।

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৯ম খণ্ড } সন ১৩১৬— ফাল্গুন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কোণার্ক দর্শন।

দেবী প্রকৃতিরাণী নিত্য নূতন ভাবেই খেলিতে ভালবাসেন, তাঁহার অঙ্কস্থিত মানবাদিইবা সেবিধি উল্লঙ্ঘন করিবে কেন? প্রতিনিয়ত একইরূপের দর্শন জীবন-সঙ্গিনীর ন্যায় আনন্দদায়ক হইলেও, তাহা দেখিতে দেখিতে কি জানি কেন কাতর হই, শ্রান্তও অশান্ত হইয়া উঠি—তখন জীবন নাটকের অঙ্ক পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা হয়—প্রকৃতির বিরাট নাট্যমন্দিরের পটপরিবর্ত্তন করিয়া অঙ্কান্তরে ক্রীড়া করিতে থাকি, সেই ক্লিষ্ট প্রাণ শান্ত করিবার জন্য, সেই শুষ্ক মরুসদৃশ জীবন কোমলতার-মধুর-ধারায় অভিষিক্ত করিবার জন্য, তাই বুঝি সেই শস্যশ্যামলা জননী জন্মভূমি বঙ্গের নিকট বিদায় লইয়া আজ কয়েকদিন হইল এই বিশাল নীলাম্বুশোভিত পুরীধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অতীতস্মৃতি পরম-প্রীতিপ্রদ, প্রবাসীসঙ্গিনীর ন্যায় হৃদয়ে কত নূতন অমৃতধারা বর্ষণ করে। কত যুগযুগান্তর অতীত হইয়াছে, পূজ্যপাদ পিতামহগণের সেই অতীতকীর্ত্তি কীর্ত্তিশ্বররূপে ভারতের শ্রেষ্ঠতীর্থ সেই পুরীধাম কত প্রাচীন আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখনও তাঁহাদের সেই অদ্ভুত অতীতকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে।

এই তীর্থরাজ-সলিলোত্থিতা, পৃথিবীর স্তন-সদৃশা পুরী—একাধারে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর এবং বৌদ্ধের অপূর্ব্ব-সম্মিলনের আদিভূত বিরাট পুরুষের লীলাক্ষেত্র। এখানকার অনন্তবিস্তারী, ফেণমালা-পরিশোভিত, ঊর্ম্মিচঞ্চল মহোদধির বিরাট সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য অতীতস্মৃতি এই কয়দিনেই আমাদের মনোমন্দির ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইচ্ছা হয়না এই স্থান ছাড়িয়া যাই। অবশেষে

ধ্বংসাবশেষ কোণার্কের অতীতস্মৃতির সঙ্গে একটু বেশী মিশিয়া যাইবার জন্য, তাহার মাধুরীতে প্রাণমন আর একটু সিক্ত করিবার জন্য, তাহার মধুর স্মৃতিটুকু ভালকরিয়া দেখিয়া জীবনে ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, অদ্য ১৫ই অগ্রহায়ণ বৈকালে ৫ টার সময় আমি, ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল শিল্পিগুরু শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী দাদামহাশয় এবং পুরীর কালেক্টারের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ সরকার এই তিন-জনে দুইখানি গোযানে আরোহণ করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যাদেবী সবেমাত্র আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। গৃহস্থেরা সময়োচিত মঙ্গলাচরণে নিযুক্ত হইতেছিল। আমরা কাছারীরোড্ ছাড়াইয়া, বড়দাণ্ড দিয়া বরাবর গুণ্ডিচা মন্দির হইয়া বালীঘায়ের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এক্ষণে সন্ধ্যা নিজ কার্য্য শেষ করিয়া পৃথিবীকে রজনীর হস্তে সমর্পণ করিল, রজনীও অনতিবিলম্বে তাহার চিরাভ্যস্ত গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবীকে আচ্ছন্না করিয়া ফেলিল। অদ্য কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতিথি। চন্দ্রোদয় হইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া আমরা দুইটী হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া-ছিলাম। সঙ্গে রাত্রের আহার্য্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও ছিল। মন্মথ দাদা ও কালীবাবু যে গাড়ী-খানিতে ছিলেন, সেখানি অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, আমার গাড়ী একটু পশ্চাতে ছিল; বালীঘায়ের রাস্তায় পড়িয়াই আলো জ্বালিয়া দিলাম। সেই ক্ষুদ্রালোকে দেখিলাম, আমরা মরুভূমিসদৃশ বালুকাময় প্রান্তরের উপর দিয়া যেন কোনও অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছি। অন্ধকারে সম্মুখে বেশীদূর লক্ষ্য হইল না। তবে সেই তামসাবৃত নক্ষত্রখচিত আকাশাম্বরের ক্রোড়ে ও পার্শ্বে যেন দুই একটা তালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। রাস্তায় মনুষ্যসমাগম মোটেই নাই অবিরাম মেঘগর্জ্জনসদৃশ সিন্ধোত্থিত সেই বজ্রনিনাদ নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া কেবলমাত্র কর্ণে প্রতিহত হইতেছিল; তাহাতে মনে হইতেছিল যে, সে যেন গর্জ্জনচ্ছলে বলিতেছে আমিই তোমাদের এ নির্জ্জনতার একমাত্র সঙ্গী। রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমরা বালীঘাই ডাকবাঙ্গালায় পৌছিলাম। এক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্র পঞ্চমীর গগণে দেখা দিয়াছিল। যদিও তাহার জ্যোতিঃ নিতান্ত ক্ষীণ, তথাপি তাহার নৈসর্গিকপ্রভাবে অন্ধকার যেন পূর্ব্বাপেক্ষা কম বোধ হইতে লাগিল। বাঙ্গালাখানি দেখিতে অতি সুন্দর। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এদিকে মফঃস্বলে আসিয়া এইখানে অবস্থান করেন। আমরা এইখানে রাত্রের আহারাদি শেষ করিলে গাড়ো-য়ানেরাও আহারাদি করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি শুইয়া পড়িলাম। পরদিবস প্রাতে যখন নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, তখন পূর্ব্বদিকে জবাকুসুমবর্ণে দিবাকর উদিত হইতেছিলেন। উঠিয়া গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাপু মন্দির এখান হইতে আর কতদূর? সে উত্তর দিল ঐ যে সম্মুখে মন্দির দেখা যাইতেছে।" তাহার কথায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া সম্মুখে তাকাইয়া দেখিলাম যে, বাস্তবিকই দূরে অস্পষ্টভাবে মন্দির দেখা যাইতেছে। পরে তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে মন্দির এখনও আমাদের নিকট হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। দর্শনেচ্ছা ও আকুলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অবশেষে বেলা ৯ টার সময়

আমরা কোণার্কে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই কোণার্ক পুরী হইতে ১৯ মাইল দূরে উত্তর পূর্ব্ব কোণে (ঈশান কোণে) সমুদ্রতীরে অবস্থিত। স্থানটী দেখিলে মনে হয় যে, বহুদিন পূর্ব্বে ইহা একটী বাণিজ্যোপযোগী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। কপিল-সংহিতা এবং শাম্বপুরাণে কোণার্কের প্রাচীন ইতিহাস উল্লিখিত আছে। এই স্থান শাস্ত্রে উৎকলের পঞ্চতীর্থের অন্যতম তীর্থ "অর্কতীর্থ বা পদ্মক্ষেত্র' নামে অভিহিত। শাম্বপুরাণে এই স্থান "অর্কতীর্থের" পরিবর্ত্তে "মৈত্রেয়-বন" নামে খ্যাত। কিন্তু কোথায়ও "কোণার্ক" এই বর্ত্তমান প্রচলিত নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র "The corner of the sun or The corner of Orissa dedicated to the sun. Kona "corner" and Arka "the sun = Konarak" এই প্রকার বাক্যার্থের দ্বারা প্রচলিত নামের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কৃষ্ণকায় বলিয়া ইংরাজেরা ইহাকে "Black Pagoda" বলিয়া থাকেন। এই স্থানে সূর্য্যদেবের ধ্বংসপ্রায় কৃষ্ণমন্দির এখনও অবস্থান করিতেছে। এতৎসম্বন্ধে কপিল-সংহিতার ইতিহাসাংশ অতীব সংক্ষিপ্ত; শাম্বপুরাণের বর্ণনাই বিস্তৃত। পাঠকের অবগতির নিমিত্ত আর্য্যকীর্ত্তির শাম্বপুরাণোক্ত ঋষি-বর্ণিত ইতিহাস প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি।

উপাখ্যান ও উৎপত্তি।

জাম্ববতীর গর্ভে কৃষ্ণের এক পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম শাম্ব। শাম্ব অতীব রূপযৌবনসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। যৌবন-স্বভাব-সুলভ দাম্ভিকতা বশতঃ তিনি গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও জ্ঞানীদিগের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন না এবং সর্ব্বপ্রকার দুষ্টকার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার পিতা ও সমগ্র যদুবংশীয়গণ মহর্ষি নারদকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্রূপের চক্ষে দেখিতেন। এই সমস্ত কারণে মহর্ষি নারদ প্রথমে অনেক সদুপদেশ দ্বারা তাঁহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে ব্যর্থমনোরথ হওয়ায়, তাঁহাকে শাম্বের শাসনের জন্য কঠিন ও অসদুপায়ও পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। একদিন নারদ কৃষ্ণের সমীপে গমন করিয়া কথাচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন যে, শাম্ব যুবাপুরুষ। আপনার মহিষীদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে; এমন কি আমার বোধ হয় ইহা দূষণীয় অবস্থায় পদার্পণ করি-য়াছে। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন যে, সে অতিশয় সচ্চরিত্র যুবক, তাহার দ্বারা এই প্রকার কার্য্য কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ইহাতে নারদ বলিলেন, আপনি এক্ষণে আমার কথায় যদিও বিশ্বাসস্থাপন করিতেছেন না, কিন্তু শীঘ্রই ইহা আমি আপনার নয়নগোচর করিব। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, কৃষ্ণ পরিভ্রমণার্থ মহিষীদের সহিত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলে পর, নারদ শাম্বের নিকট যাইয়া বলিলেন "তোমার পিতা তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব তুমি অবিলম্বে রৈবতকে গমন কর।" তাঁহার নিকট এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শাম্ব রৈবতকে গমন করিলেন। এদিকে নারদও অজ্ঞাতভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শাম্ব তথায় যাইয়া উপস্থিত

হইলে, সরোবরে স্নাননিরতা তাঁহার বিমাতারা শাম্বের অনিন্দ্যনীয় রূপে মুগ্ধ হন। এই অবসরে নারদ কৃষ্ণকে আনাইয়া সেই ব্যাপার দেখাইলে কৃষ্ণ মহিষীগণসকাশে শাম্বকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও তাঁহাকে তাঁহার সৌন্দর্য্যনাশের জন্য "কুষ্ঠগ্রস্ত হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। শাম্ব তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রথমে অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায়, অবশেষে ভগ্ন-হৃদয়ে নারদেরই পরামর্শানুসারে পীড়ামুক্ত হইবার জন্য মৈত্রেয়-বনে গমন করেন।

চন্দ্রভাগানদীতীরে মৈত্রেয়-বনে উপস্থিত হইয়া শাম্ব রোগমুক্তির নিমিত্ত অতীব কঠোরতা ও একাগ্রতার সহিত, অনাহারে কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করতঃ সূর্য্যের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার এতাদৃশ একাগ্রতাদিতে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া নিম্নলিখিত একবিংশতি নামযুক্ত মন্ত্রটী * দ্বাদশ বৎসর যাবৎ জপ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর এইপ্রকার অনন্যচিন্তার সহিত দ্বাদশ বৎসর মন্ত্র জপ শেষ হইলে, ভগবান মরীচিমালী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—বৎস! আমি তোমার তপস্যায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকট অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া শাম্ব বলিলেন—দেব! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমি সর্ব্বদা আপনাতে অনুরক্ত থাকি। তদুত্তরে বিভাবসু বলিলেন যে, আমি তোমার এই অনন্যভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হউক। এক্ষণে তুমি পুনরায় আমার নিকট অন্য বর প্রার্থনা কর। তাহাতে শাম্ব কহিলেন, প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে এই মহারোগের হস্ত হইতে মুক্ত করুন। এই প্রার্থনায় দিবাকর "তথাস্তু" বলিলেন। শাম্ব অনতিবিলম্বে রোগমুক্ত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট শরীর প্রাপ্ত হইলেন। এই সমস্ত ঘটনার পর পুনরায় সূর্য্য বলিলেন, শাম্ব! তোমাকে যাহা বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। "আজ হইতে পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি আমার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে সে সনাতন লোক প্রাপ্ত হইবে।" শাম্ব তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিবার জন্য কৃত সংকল্প হইলেন। অনন্তর পরদিন প্রাতে যখন চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি নদীগর্ভে প্রস্তরময় সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পান। শাম্ব সেই মূর্ত্তি মন্দিরে স্থাপন করেন এবং সেই দেবতার আদেশানুযায়ী ঔষধব্যবসায়ী শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া তাঁহার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিলেন!

* "ভাস্করো ভগবান্ সূর্য্যশ্চিত্রভানুর্বিভাবসুঃ।
যমতাতোঽস্রমালীচ যমুনা প্রীতিদায়কঃ॥
দিবাকরো জগন্নাথঃ সপ্তাশ্বশ্চ প্রভাকরঃ।
লোকচক্ষুঃ স্বয়ম্ভূশ্চ চ্ছায়ারতি প্রদায়কঃ॥
তিমিরারি র্দিনধবো লোকত্রয় প্রকাশকঃ।
ভক্ত বন্ধু র্দয়াসিন্ধুঃ কর্ম্মসাক্ষী পরাৎপরঃ॥
একবিংশতি নামানি যঃ পঠেৎ গদিতে ময়ি।
তস্য শান্তিং প্রযচ্ছামি স্বয়ং সত্যং বদাম্যহম্॥"
(কপিল সংহিতা)

সূর্য্যেরও স্থানের রোগনাশকতা-শক্তির পরিচয়।

অন্যান্য শাস্ত্রে ও এই ঋষিকথিত ইতিবৃত্তে আমরা সূর্য্যের রোগনাশকতা-শক্তির, এবং প্রধানতঃ কুষ্ঠরোগনাশকতা-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাই। নবম শতাব্দীতে রচিত মন্মথ ভট্টের কাব্যপ্রকাশেও সূর্য্যের রোগ-নাশকতাশক্তির পরিচায়ক কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ময়ূর ভট্ট নবম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বতন কালের। প্রসিদ্ধি আছে, তিনি সূর্য্যশতক রচনা করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গোয়ীচন্দ্র তাঁহার "সংক্ষিপ্তসার" ব্যাকরণের টীকায় সূর্য্যের রোগনাশকশক্তির পরিচায়ক নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেজ্ জ্ঞানমিচ্ছেত্তু শঙ্করাৎ।
মুক্তিঞ্চ কেশবাদিচ্ছেদ্ধন মিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ॥"

কপিলসংহিতাদিতেও এতদ্বিষয়ক অনেকগুলি শ্লোক আছে। প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে সেগুলি তুলিতে সাহসী হইলাম না। স্থানটীও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হয়; ইহার নিকটবর্ত্তী পুরীতে যেরূপ কুষ্ঠরোগীর বহুল সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এস্থানের লোকসংখ্যা পুরীর অনুপাতে অনেক কম, তত্রাচ ঐ রোগাক্রান্ত লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত কারণে স্থানটীও বিশেষভাবে কুষ্ঠরোগের উপকারী বলিয়া বিশ্বাস হয়।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র কপিলসংহিতায় অর্কক্ষেত্রে রথযাত্রার উল্লেখ দেখিয়া কোণার্কের এই সূর্য্যমন্দিরকে বৌদ্ধ মন্দির সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার "উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব" পুস্তকে রথযাত্রা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহার অনুকূল ঐতিহাসিক মত এবং সুযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সকল মত পাঠ করিলে যদিও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু হিন্দুর প্রাচীনশাস্ত্রে এই রথযাত্রা দ্বাদশযাত্রার অন্যতম বলিয়া খ্যাত। আরও ধর্ম্মশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ মনুমতানুসারী স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং গদাধর কর্ত্তৃক তাঁহাদের রচিত পদ্ধতিতে স্কন্দপুরাণোক্ত যাত্রাতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে রথযাত্রার উল্লেখ দেখিয়া ও বিশেষবর্ণনা পাঠ করিয়া হঠাৎ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে উহা গৃহীত বলিতে কিম্বা গৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কোন কোন ঐতিহাসিক পুরাণসমূহ বৌদ্ধযুগের পর লিখিত বলিয়া অনুমান করেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও সংহিতা বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বতন কালের লিখিত। সেই সংহিতার অন্যতম কপিলসংহিতাতে যখন এই কোণার্ক অর্কক্ষেত্র বলিয়া পাওয়া যাইতেছে ও এস্থানে রথযাত্রার উল্লেখ আছে * তখন আর কি করিয়াই বা ইহাতে বৌদ্ধস্বত্ব স্থির করি! আশা করি ইতিহাসাভিজ্ঞ পাঠকবর্গ ইহার যথাযথ মীমাংসা করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন। যাহা হউক, অতঃপর আমরা

বৌদ্ধস্বত্বের প্রতিবাদ।

* "রবিক্ষেত্রে নরা যে চ রবিবারে সমাহিতাঃ।
ভক্ত্যাপশ্যন্তিচ রবিং তেগচ্ছন্তি রবের্গৃহম্॥
মৈত্রেয়াখ্যে বনে পুণ্যেরথযাত্রামহোৎসবম্।
যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা তে পশ্যন্তি তনুং রবেঃ॥"

ইহার বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের অনুসরণ করিতেছি।

১। "আইন-ই আকবরী" প্রণেতা আবুল ফজেল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উড়িষ্যার কোণার্ক-মন্দির দেখিয়া লিখিয়াছেন— "জগন্নাথের নিকট কোণার্কের সূর্য্য-মন্দির অবস্থিত।

ঐতিহাসিক মত, উহার অসামঞ্জস্য ও মন্দিরের প্রাচীনত্ব।

এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে সমগ্র উড়িষ্যার দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব ব্যয়িত হইয়াছিল। এই মন্দিরের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কৌশল দেখিয়া কেহই বিস্ময়ান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহার চতুর্দ্দিকের প্রাচীর দেড়শত হস্ত উচ্চ ও উনবিংশ হস্ত পুরু।* এই মন্দিরের তিনটী প্রবেশদ্বার আছে। ইহার পূর্ব্বদ্বারে হস্তীর অতীবসুন্দর দুইটী মূর্ত্তি আছে। প্রত্যেকটীর শুণ্ডের উপরিভাগে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি ধৃত। পশ্চিম দ্বারে অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত বিস্ময়োৎপাদক দুইটী অশ্বমূর্ত্তি অশ্বসেবক কর্ত্তৃক ধৃত রহিয়াছে ও উত্তরদ্বারে দুইটী ব্যাঘ্রমূর্ত্তি আছে। ব্যাঘ্র ২টী হস্তীকে বধ করিবার ভাবে ২টী হস্তীর উপর উপবিষ্ট। দ্বারের সম্মুখে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত অষ্টভূজাকৃতি শত হস্ত উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভে উঠিবার জন্য নয়টী ধাপযুক্ত একটী সোপান আছে। সেই সোপান পথে উপরে উঠিলে একটী বিস্তৃত স্থানে আসা যায়, সেই স্থানে একটী অর্দ্ধ গোলাকৃতি প্রস্তরময় তোরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। তাহার চতুঃসীমায় নানাপ্রকার মনোভাব-প্রকাশক সর্ব্ববর্ণের বিভিন্ন প্রকার পূজকদিগের মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। এই মন্দির ৭৩০ বৎসরের প্রাচীন। রাজা নরসিংহদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই মন্দির তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ হইয়াছে। পুরীর সিংহদ্বারস্থ অরুণ-স্তম্ভটী পূর্ব্বে এই খানে ছিল। এই মন্দিরের নিকটে আরও আটাইশটী ছোট মন্দির আছে। তন্মধ্যে ছয়টী উত্তরদ্বারের সম্মুখে অপর বাইশটী ইহার সীমার বাহিরে অবস্থিত। ঐগুলি দেখিলে অনুমান হয় যে, উহাদের কারুকার্য্যাবলী অলৌকিকত্বের পরিচয় দিতেছে।"

২। হান্টার সাহেব ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কোণার্ক দেখিয়া, তাঁহার "উড়িষ্যা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"কোণার্ক মন্দির ভারতের সূর্য্য-উপাসনার স্মৃতিচিহ্ন। ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বিশ্বস্ত কাগজপত্রাদি দেখিয়া অনুমান হয়, যে, এই মন্দির ১২৩৭ হইতে ১২৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দিরের দেওয়ালের উপর অশ্লীলচিত্র খোদিত হইলেও, ইহার শিল্পাংশ বঙ্গের শিল্পকার্য্যের শীর্ষস্থানীয়, এমন কি মুসলমানযুগের শিল্পকার্য্য হইতে উৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৩। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মান্দলা পঞ্জিকায় এই মন্দির ১২০০ শকে (অর্থাৎ ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ আছে। উহাতে লিখিত আছে যে, "রাজা লাঙ্গুলীয় নরসিংহদেব ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২০৪ শক)। এই রাজা অর্কক্ষেত্রে সূর্য্যদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মিঃ ষ্টার্লিং বলিয়াছেন যে, "নরসিংহদেবের মন্ত্রী "শিবাই সৌত্রের" তত্ত্বাবধানে ১২৪১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির প্রস্তুত হয়। পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় "লাঙ্গুলীয় নরপতি ১১৫৯ হইতে ১২০৪ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে মন্দিরের নির্ম্মাণকালের কোন উল্লেখ নাই। আবুল ফজেল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই মন্দির ৭৩০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফার্গুসন মান্দলা পঞ্জিকার নির্দ্দিষ্ট সময়ই মন্দির নির্ম্মাণের সময় বলিয়াছেন। আমরা এই সমস্ত সময় পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, নির্ম্মাণকালের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। অথচ এই সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ ছাড়া, আর কিছুই উপায় নাই যাহা দ্বারা নিশ্চিত সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সমস্ত কারণে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার স্থাপত্য কার্য্য দেখিয়া, এই মন্দির নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অতঃপর এই মন্দির যে বহু প্রাচীনকালের তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ হইবে না। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।

* স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রাচীর ২৫ ফিটের মধ্যে উচ্চ ও ৭।৮ ফিট পুরু ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমরাও এই মতের সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। কারণ অত উচ্চ প্রাচীর কোন স্থানে দেখা যায় না, বা পুস্তকেও পাওয়া যায় নাই। Battlement যাহা দুই একখানি পড়িয়া আছে, সেগুলি ৫২ ইঞ্চি উচ্চও প্রায় ১৬ ইঞ্চি পুরু।

চীনে সমাধি প্রথা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে আমরা চীনের সভ্যতালোক দেখিতে পাই। এই প্রাচীন জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চীনেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যজনক ক্রিয়া বলিয়া মনে করে, ও আড়ম্বরসহ সম্পন্ন করিয়া থাকে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই ব্যাপার অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম্মাদি অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

চীনদিগের বিশ্বাস যে, নিঃসন্তান হইয়া পরলোক-গমনাপেক্ষা মনুষ্যের আর অধিক দুর্ভাগ্য কিছুতেই হইতে পারে না। চীনদিগের ধারণা, মৃত্যুর পর মৃত আত্মার প্রীত্যর্থে পূজা ও সমাধি-সমীপে সাময়িক উপাসনা ও বলিপ্রদান করিবার জন্য যে ব্যক্তি পুত্র রাখিয়া যাইতে না পারেন, তাহার অপেক্ষা পাপী ও হতভাগ্য জগতে অতি বিরল। এইজন্য চীনে পুত্র-সন্তান একান্ত প্রিয় ও প্রার্থনীয়। আর সভ্য জগতে কোথায় বা ইহার ব্যত্যয় দেখা যায়?

চীনে সমাধি-প্রথা বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। চীনেরা তাহাদিগের বৃদ্ধ জনক জননীকে শবাধার (Coffin) উপঢৌকন প্রদান করিয়া অকপট পিতৃ-মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। প্রায়ই ঐ সকল সিন্দুক দেখিতে সুন্দর ও কারুকর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে চীনগণ নিজ নিজ মৃত্যুর বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আপন আপন শবাধার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এ প্রথাটী সমৃদ্ধিশালী মুসলমান জমিদার ও বাদসাদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইত।

চীনদিগের মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র আত্মীয়-স্বজন-সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ দুইটী তাম্রমুদ্রা একটী চীনামাটী-পাত্রে রাখিয়া নিকটস্থ কোন নদীতে

নিক্ষেপ করে। পরে সেই স্রোতস্বতীর বারি আনয়ন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মৃতব্যক্তির শব উত্তমরূপে স্নান করাইয়া থাকে।* অবশেষে রেশমনির্ম্মিত পরিচ্ছদে দিব্যরূপে শবকে আচ্ছাদিত করে। পরিশেষে মণি, মুক্তা, স্বর্ণ প্রভৃতি পাঁচটী বহুমূল্য দ্রব্য মৃতব্যক্তির বদনের ভিতর সংস্থাপন করা হয়। পরে কফিন বা শবাধার এরূপভাবে আবদ্ধ করা হয় যে, কোন দিক দিয়া বায়ু তাহার ভিতরে প্রবিষ্ট বা ভিতর হইতে বহির্গত হইতে না পারে। জ্যেষ্ঠের অভাবে এই সকল কার্য্য তৎকনিষ্ঠ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথম সপ্তাহে বালক বালিকা-গণ শোকচিহ্নস্বরূপ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শবাধারের নিকট প্রতিদিন কিছুক্ষণ করিয়া উপবেশন করিয়া থাকে। দেহটী শবাধারে স্থাপিত হইলে পর একখণ্ড কাষ্ঠ-ফলক (Tablet) স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তাহার উপর সংবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই ফলকের উপর এইরূপ খোদিত হয়:—

"The abode of the Spirit (or Intellect) of the Chief (i.e. Gentleman,) Chao-k'hi-chang by name. The illustrious deceased finished (his state of trial) under an Emperor of the dynasty of Ts'hing;" or "the abode of the spirit of a Lady of the family of Li, (attached) to the Gate of Chao, the companion of her husband, who died under (the dynasty of) Ts'hing." †

যে গৃহে এই স্মৃতি-ফলক স্থাপিত করা হয়, সেই গৃহকে শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত করা হইয়া থাকে এবং মেজের উপর একটী সুগন্ধযুক্ত বাতি রক্ষিত হইয়া থাকে।

মৃত্যুর সপ্তদিন পরে মৃতের বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট শোক-লিপি প্রেরিত হয়। যে গৃহে শব রক্ষিত হয়, আত্মীয়গণ সকলে স্বীয় স্বীয় সাধ্যানুযায়ী অর্থ, সৌগন্ধ, খাদ্য ও অপরাপর নানাবিধ উপঢৌকন সমেত সেই গৃহে উপস্থিত হয়। বাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলেই শ্বেতবর্ণ শোক-পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং শববহনকারীরা শকটের নিকটস্থ হইয়া মৃত ব্যক্তিকে অভিবাদন করে ও শবের সন্নিকটে ধূপ ধূনা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। নবাগত আত্মীয়গণ যখন শবের নিকট এইরূপে উপহার প্রদান করিয়া মৃতব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে, তখন মৃতব্যক্তির পরিবারগণ মৃতের নিকট রোদন করিতে থাকে। শোক-চিহ্নস্বরূপ গৃহের দ্বারে শ্বেতবর্ণ ফলক সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ তিন সপ্তাহ অতীত হইলেই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। সমাধির সমুদয় আয়োজন স্থির হইলে মৃতের আত্মীয়বর্গ সকলে একত্র হইয়া যে গৃহে মৃত ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণ শায়িত আছেন ও তাঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণ কাষ্ঠ অথবা প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে, সেই গৃহে গমনপূর্ব্বক প্রথমে সর্ব্ব-নিয়ন্তার আরাধনা করিয়া থাকে। পরে মৃতব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা এইরূপ সম্বোধন করিয়া থাকে:—

"সমাধি-ক্রিয়া সংসাধনের প্রথানুযায়ী সময় উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব্বপুরুষগণের রীত্যনুসারে আমরা আপনার শব সমাধিক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি।" * অনন্তর সমাগত পরিবার ও আত্মীয়বর্গ

* Davis 'CHINA'—P. 338 Vol. I.

† Encyclopaedia Metropolitana Vol. XIX. P. 575.

* "অনুসন্ধান"—১২৯৯, ১৫ই চৈত্র দ্রষ্টব্য।

সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া ক্রন্দনের সহিত মৃতব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

শবাধার পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হইয়া থাকে ও শব-বাহকেরা ধূপ ধূনা ও মৃত ব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন-কারী কাষ্ঠ ফলক (Tablet) সঙ্গে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল শব-বহনকারী কেহই মৃতের আত্মীয় নন। শব বাহির করিবার সময় মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ একটী প্রকোষ্ঠে যাইয়া লুক্কায়িত হন। ইহার কারণ, পাছে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা পরিবারগণের কোনরূপ ত্রুটী বা অসাবধানতা অবলোকন করিয়া অসন্তুষ্ট হন ও তাহা-দিগকে নানারূপ ব্যাধি বা অভিশাপ প্রদান করিয়া শাস্তি দেন। শোকবস্ত্র-পরিহিত ২০ জন লোক বৃহৎ চাঁদোয়া দ্বারা আচ্ছাদিত শবাধার বহন করিয়া লইয়া যায় ও একজন লোক উহার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে। পরে মৃতের আত্মীয়গণ শোকসূচক শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া ও মস্তকে বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া মহাসমারোহের সহিত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করে। কেবল মৃতব্যক্তির স্ত্রী, উপপত্নী ও কন্যারা শ্বেত-পরদাচ্ছাদিত চেয়ারের ন্যায় কাষ্ঠাসনে (Sedan) বসিয়া গমন করিয়া থাকে।

এই সমারোহ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর অবস্থা ও প্রাদেশিক নিয়মানুযায়ী সুসম্পন্ন করা হইয়া থাকে। শব কবরের মধ্যে রক্ষিত হইলে মৃত ব্যক্তির ব্যবহারের নিমিত্ত তাহার ভিতর কতকগুলি কাগজের কৃত্রিম মুদ্রা, শকট ও দাস-দাসীর প্রতিমূর্ত্তি অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এই সকল দ্রব্য পরলোকে মৃতের ব্যবহারে আসিবে। যাহা হউক, এই সকল বিধি-বদ্ধ কার্য্য শেষ হইলে, আত্মীয়বর্গ পূর্ব্বমত সমারোহে মৃত ব্যক্তির বিবরণ-কাষ্ঠ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং যে গৃহে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণ-কাষ্ঠ বা প্রস্তর-ফলক খোদিত আছে, সেইখানে উহা স্থাপিত করেন। পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি-চিহ্ন স্বতন্ত্র গৃহে রাখিতে ধনী ভিন্ন আর কেহ পারে না। দরিদ্রেরা বাটীর যে কোন অংশে ঐ সকল কাষ্ঠ অথবা প্রস্তর ফলক রাখিয়া দেয় এবং প্রত্যহ ঐ সকল স্থানে ধূপ ধূনা জ্বালাইয়া থাকে। *

কোন ধনীব্যক্তির মৃত্যু হইলে সাধারণতঃ তাঁহার মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত বহু দূরস্থিত হইলেও, জন্মভূমিতে নীত হইয়া থাকে।

এই মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় কোন প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান দিয়া লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ। শববাহীরা স্নানার্থ ব্যবহৃত নদীতীরস্থ ঘাটের নিকট অথবা চীন সম্রাটের অধিকৃত কোন রাজবর্ত্ম দিয়া শব বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন না।

সময়ে সময়ে সমাধির উপযুক্ত স্থানাভাবে শব অনেকদিন পর্য্যন্ত গৃহে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সময়ে মৃতের পরিবারগণ প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে শবের নিকট ধূপ ধূনা প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য জ্বালাইয়া থাকে। ধনীগণের মৃত্যুর পর যতদিন তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা মনোমত স্থান নির্ব্বাচিত করিতে না পারেন, ততদিন তাহাদের শবের সমাধি হয় না। এতদ্ভিন্ন কখন কখন মৃতব্যক্তির সমাধির বহুবর্ষ পরে, যদি অধিকতর সুন্দর স্থান পাওয়া যায়, তাহা

* 'প্রদীপ'—১৩১১, চীন-প্রবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের চীন-প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইলে শবকে কবর হইতে উত্তোলন করা হইয়া থাকে ও তাহার অস্থিগুলি লইয়া ঐ নূতন স্থানে কবরস্থ করা হয়।

চীনদিগের সমাধি-ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর নাম "How—too—Queen (Earth)

হিন্দুদিগের যেরূপ পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য ও মৃতব্যক্তির সন্তানেরা এই পুণ্য কর্ম্মে যেরূপ সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ চীনেরাও তাহাদের পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আবশ্যক হইলে স্বীয় ভবন, ভূমি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। পূর্ব্বে তিনবৎসর যাবৎ শোক প্রকাশই, পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল ; কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ স্থলেই চীনেরা দুই বৎসর তিনমাস শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। তিন বৎসরের মধ্যে পুত্র অনেক সময় একাকী পিতামাতার সমাধিপার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে। যতদিন না তিনবৎসর গত হয়, ততদিন সন্তানের বিবাহ করা নিষিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে তিনবৎসর যাবৎ শোক প্রকাশ করিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর কবরের উপর অবসর সময়ে ও পর্ব্বাহে ব্যজন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক উচ্চপদস্থা না হইলে ২৭ মাস শোক প্রকাশ করিতে হয়। পত্নীবিয়োগ-বিধুর স্বামীকে এক বৎসর শোকচিহ্ন ধারণ করিতে হয়। * অন্যান্য আত্মীয়বৃন্দের বিয়োগেও সাধারণতঃ এক বৎসর শোক প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

চীন-বালক-বালিকাদিগকে পিতৃমাতৃভক্তি শিখাই-বার জন্য নিম্নলিখিত গল্পটী প্রায়ই বলা হইয়া থাকে :—

"এক দরিদ্রের একটী পুত্র ছিল। সে তাহার সহধর্ম্মিণীকে কহিল, 'দেখ ! আমরা এত দরিদ্র যে, মাতার ভরণপোষণ করিতে পারি না। এস, আমরা ছেলেটীকে জীবন্ত কবর দিয়া ফেলি। যদি আমরা জীবিত থাকি, আবার পুত্র পাইতে পারি। কিন্তু মাকে হারাইলে আর মা পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।" স্ত্রী সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিল না। স্বামী সমাধি খনন করিতে গেল। কিছুক্ষণ খনন করিতে করিতে সে মুদ্রাপূর্ণ একটী বৃহৎ পাত্র প্রাপ্ত হইল। পাত্রের উপর খোদিত ছিল,—

"পরমেশ্বর মাতৃভক্ত সন্তানের জন্য এই পুরস্কার দিলেন।" *

পিতামাতার মৃত্যুতে যেরূপ শোক প্রকাশও নিয়ম পালন করা হইয়া থাকে, সম্রাটের মৃত্যুতে প্রজাবৃন্দও সেইরূপ শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। রাজ্যের সমস্ত লোক একশত দিবস পর্য্যন্ত মস্তক মুণ্ডন করেনা এবং শোকসূচক শ্বেতবস্ত্র অনেকদিন পর্য্যন্ত পরিধান করিয়া থাকে। কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের রাজকীয় কর্ম্মচারিত্বের নিদর্শন টুপী ও রক্তবর্ণ রেশমী বস্ত্রখণ্ড খুলিয়া ফেলেন। চীনেরা সম্রাট্ বা তাঁহার মহিষীকে এতই ভালবাসেন যে, কথিত আছে 'কাংহি' সম্রাট্-মহিষীর মৃত্যুতে তাঁহার চারিজন পরিচারিকা তাঁহার সহিত কবরস্থ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ

* Modern part of universal History p. 186 vol. VII.

* "সাহিত্য"—শ্রাবণ ১৩০৯—২৫৩ পৃঃ

করিয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞ সম্রাট্ রাজ্যে এরূপ নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হইতে দেন নাই।

দেবদারু "সাইপ্রেস" ও অন্যান্য বৃক্ষরাজিমণ্ডিত কোন পর্ব্বত বা লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী কোন উচ্চস্থানে চীনদিগের সমাধিস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহার উপর ছোট ছোট ঘরের ন্যায় কবর নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত কবর চীনের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠিত হইয়া থাকে।

চীনে সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি প্রচলিত আছে ; সেগুলি এই :—

রাজপুত্র, রাজজ্ঞাতি ও রাজকুটুম্বদিগের সমাধি মন্দিরের পরিধি একশত ত্রিশগজ পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং এই সকল মন্দিরের চারিটী করিয়া দ্বার থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের মন্দিরের পরিধি, ১১০ গজ পর্য্যন্ত এবং তাহাতে দুইটীর অধিক দ্বার থাকিবার রীতি নাই। * এইরূপে ক্রমশঃ মৃতের পদমর্য্যাদা অনুসারে তাহার সমাধিমন্দিরের পরিধিরও হ্রাস হইয়া থাকে।

প্রত্যেক রাজজ্ঞাতি বা রাজকর্ম্মচারীর সমাধিক্ষেত্র ...পার্শ্বে মন্দির সমীপে দুইটী করিয়া পাষাণ-নির্ম্মিত ...ঘোড়া, ব্যাঘ্র অথবা মেষমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়া থাকে। ... মূর্ত্তিগুলি জীবন্তমূর্ত্তি হইতে আকারে বৃহৎ ব্যতীত ...ন অংশে ক্ষুদ্র হয় না। চীনেরা সমাধিক্ষেত্র ...সজ্জিত করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত ... না।

চীনদিগের প্রত্যেক প্রধান সহরের বহির্ভাগে, দ্বারহীন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ সংযুক্ত একপ্রকার মন্দির আছে। শিশুগণ প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদিগের মৃতদেহ মোটা মাদুরে আবৃত করিয়া, চীনগণ উক্ত মন্দিরের নিকট আনয়নপূর্ব্বক গবাক্ষ দিয়া মন্দির ভিতরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মৃতদেহ মন্দিরের ভিতরে গভীরকূপে বা গর্ত্তের ভিতর গিয়া পতিত হয়।

বৎসরের মধ্যে বসন্ত ও শরৎকাল মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ক্রিয়া কর্ম্মাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বসন্ত কালই প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া সাধারণতঃ সকলেই ঐ সময়ে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া থাকে।

প্রতিবর্ষের তৃতীয় মাসে (April) বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চীনবাসীই বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া নিজ নিজ পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রের নিকট গিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। এই উপাসনা সময়ে তাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশে কাগজ-নির্ম্মিত বাক্স, চৌকী, অপরাপর আসন ও নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার উৎসর্গ করিয়া থাকে। অনন্তর কর্ত্তা বা পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তি সমাধি সম্মুখে প্রথমে নয়বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া থাকেন এবং তৎপরে অপরাপর ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকে। পরিশেষে নানাপ্রকার আতসবাজী পোড়াইয়া সকলে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই সময় চীনেরা সমাধিমন্দির সংস্কৃত ও অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। এই সমাধিমন্দির সংস্কৃত করাকে তাহারা একটী পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* "অনুসন্ধান"—১২৯৯, ১৫ই চৈত্র।

বাল-বিধবার আক্ষেপ।

বিশাল ক্ষেত্রের মাঝে পশি'
নিদাঘের মধ্যাহ্ন ভাস্কর,
শুষ্ক করি তৃণদল শোভা
মরুভূমি করে সে প্রান্তর।

বারিধির ছিটা ফোঁটা নাই
অতীতের চিহ্ন লোপ প্রায় ;
ভবিষ্যৎ কোন আশা নাই
ধু ধু বহ্নি জ্বলে বসুধায়।

আমারও হৃদয় প্রান্তরে
তেমতি গো চিন্তা রবিকর ;
সুখ-বারি-বিন্দুর অভাবে,
মন দুঃখে দহে নিরন্তর।

নিরাশের অন্ধকারে মিছে
অতীতের স্মৃতিটুকু হায়,
ক্ষীণা প্রাণে অধীরা করিয়া
শুধু শুধু যাতনা বাড়ায়।

সদা জাগে সেই একদিন,
মিলনের প্রথম দিবস,
সেজেছিনু রাজরাণী বেশে
হৃদে চাপি' কত কি মানস।

বাঁধিয়া গো সাধের কুন্তল,
ফুলমালা বেণীতে জড়ায়ে,
সুরঞ্জিত বসন পরিয়া,
মুখখানি মুকুরে রাখিয়ে।

প্রতিচ্ছায়া দেখিতাম যত
মনে হ'ত রূপের গরিমা ;
সাথীগুলি বলেছিল মোরে,
"তুমি যেন সেজেছ প্রতিমা।"

আদরিণী গরবিণী হ'য়ে,
নিশিযোগে পতির সোহাগে,
কেটেছিল যেই একদিন
(এবে) পরিণত নিশা-স্বপনেতে।

সেই নিশি—আর এই নিশি,
তখন যা ছিল তাই এই,
সেই আমি আর এই আমি,
কিন্তু হায় সেইটি গো নাই।

জীবনের ঊষা সমাগমে
দুঃখ মেঘ আকাশে ছাইয়া,
পরাণের ধ্রুবতারা তাতে
চিরতরে গিয়াছে ডুবিয়া।

আর নাহি হৃদয় রতন,—
একটানা স্রোতস্বিনী ভরে,
ভেঙ্গে নিয়ে সে প্রেমের বাঁধ
মিশে গেছে অনন্ত সাগরে।

একা বিনা কেহ নাহি মোর,
নাহি আছে জুড়াবার ঠাঁই,
মরমেতে কি যে গো বেদনা
কেবা আছে কারে বা বুঝাই।

জগদীশ এ ভব সংসারে
তুমি বিনা কেহ নাহি মোর
তব পদে মিনতি আমার
ভেঙ্গে দাও স্বপনের ঘোর।

দাও মোরে শান্তির আশ্রয়
বাঁচিতে গো নাহি মম সাধ,
পতি যথা গিয়াছেন ছাড়ি,
যাই তথা ঘুচাতে বিষাদ।

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।

দ্রাবিড়ী ভাষার প্রাচীনত্ব।

সংস্কৃত দেবভাষা, উহার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব। কেহ কেহ প্রাকৃত ভাষাকেও সংস্কৃত-ভাষার তুল্যবয়স্কা বলিতে উদ্যত। প্রাকৃত, সংস্কৃত ভাষার সমকালোৎপন্ন না হইলেও ঐ ভাষা যে অতি প্রাচীনকালে উৎপন্ন হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কোন কোন পণ্ডিত 'ললিত-বিস্তর' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষাকে প্রাকৃত না বলিয়া মাগধী ভাষা বলেন। মাগধী এই নামের দ্বারাই উহা যে এক সময় মগধে উৎপন্ন হইয়াছিল উহা বেশ অনুমান করা যায়। মাগধী ভাঙ্গা সংস্কৃতের মত এক প্রকার সহজ উচ্চার্য্য মিষ্ট ভাষা। তাহার পর, পালিভাষা উৎপন্ন হয়। পালিও অল্প প্রাচীন নহে। বৌদ্ধ প্রচারকগণ পালিভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করায় উহার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল।

উপরি উক্ত তিনটী ভাষা সংস্কৃত ভাষার রূপান্তর মাত্র। উহাদের পরেই দেশীয় প্রাকৃত বা উপভাষাগুলির সৃষ্টি হয়। দেশীয় উপভাষার মধ্যে বোধ হয় দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী (হিন্দী) এবং গুজরাটীই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি অনেক পরে উৎপন্ন হইয়াছে। যে সকল ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার নিকট সম্বন্ধ, তাহারাই অর্ব্বাচীন এবং যাহাদের সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ নাই অথবা নিতান্ত অল্প সম্বন্ধ তাহাদিগকেই অপেক্ষাকৃত সুপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের মতে ভারতে যত দেশীয় উপভাষা আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়ী ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। যখন দ্রাবিড় প্রদেশে আর্য্যগণের বসতি বিস্তার হয় নাই, তখনও দ্রাবিড়-ভাষা বিলক্ষণ উন্নত ছিল এবং উহার ব্যাকরণ পর্য্যন্ত প্রণীত হইয়াছিল। প্রাচীন দ্রাবিড়বাসীরা অনার্য্য হইলেও সভ্যতা-বিহীন ছিল না। তাহারা যুগ যুগান্তর পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মমত ও ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল। পরে দ্রাবিড়প্রদেশে বৈদিক আচার প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তাহারা নিজ ভাষায় উপনিষদ্ প্রভৃতির মত সঙ্কলন করিয়াছিল।

আমরা দ্রাবিড় দেশীয় একখানি অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রাবিড়ী ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটা গল্প পাঠ করিয়াছি। নিম্নে ঐ গল্পের সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলাম। ঐ গল্পের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক না থাকিলেও উহা পাঠ করিয়া দ্রাবিড় ভাষা সম্বন্ধে দেশের লোকের কিরূপ অভিমত তাহা বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপভাষায় লিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন গ্রন্থ দ্রাবিড়ভাষায় পাওয়া যায়। উহাও দ্রাবিড়ভাষার স্থবিরত্বের অন্যতম প্রমাণ।

গল্পটি এই ;—মাধবদাস এক দিন পরাশর ভট্টার্থকে (১) জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো! শঠারি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ (২) ভারতের অন্যান্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া কেন দ্রাবিড় দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেবভাষা (সংস্কৃতভাষা) পরিত্যাগ করিয়া কেনই বা দ্রাবিড়ভাষায় প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়াছেন? (৩) যদি এ বিষয় শুনিবার আমার অধিকার থাকে, তবে গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উহা বলুন।" ভট্টদেশিক (পরাশরভট্টার্থ) শিষ্যের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া ঐ বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পরাশর ভট্টার্থ বলিলেন;—পূর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বতে পার্ব্বতীর সহিত শঙ্করের বিবাহের উদ্‌যোগ হইয়াছিল। এই পরিণয়োৎসব ত্রিলোকের সাধারণ উৎসব। সুতরাং ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরগণ এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় লোক এককালে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া সমবেত হইল। কৈলাসপর্ব্বত লোকে লোকারণ্য, সূচ্যগ্রপরিমিত স্থানও নাই। জলে ভাসমান নৌকার একদিকে সমস্ত লোক উঠিলে অপর দিকটা যেমন উঁচু হইয়া উঠে, সেইরূপ দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী উত্তর দিকে সমবেত হওয়ায় পৃথিবীর দক্ষিণ দিক্‌টা উঁচু হইয়া উঠিল। ভারে উত্তরদিক হইতে দেবতারা নিম্নে শূন্যে পড়িয়া যান যান হইলেন। দেবতারা এবং মুনিরা তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং ভয়ে কাতর হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের মধ্যে স্থপতি (Engineer)। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা মতলব স্থির করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা দেবরাজ প্রভৃতিকে বলিলেন—"ওহে দেব, ঋষি, মনুষ্য এবং, গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ! আপনারা ভয় করিবেন না, আমি এক উপায় বলিতেছি আদরপূর্ব্বক শুনুন। যোগিবর ভগবান্ অগস্ত্য এখানে উপস্থিত আছেন। এই ত্রিলোকের যত ভার, ভগবান্ অগস্ত্য একাই উহার তিনভাগের একভাগ ভার; অতএব অগস্ত্য যদি এখন দক্ষিণদিকে গিয়া বসেন, তাহা হইলে পৃথিবী পূর্ব্বের মত সমান হইতে পারে। স্থপতিবিদ্যাবিশারদ বিশ্বকর্ম্মার যুক্তিযুক্ত উপদেশ শুনিয়া দেবতারা সন্তুষ্ট হইলেন এবং দক্ষিণাপথে যাইবার জন্য অগস্ত্যের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন।

অগস্ত্যের মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "উমার কল্যাণ সন্দর্শন করিব, ইহা আমার হৃদয়ের চিরপোষিত অভিলাষ। দুষ্ট বেটা বিশ্বকর্ম্মা তাহার ব্যাঘাত করিতে চায়। শোন্ মূর্খ তুই যেমন আমার উৎসব দর্শনের ব্যাঘাত করিতে চাহিতেছিস, অতএব তুই অতি নিকৃষ্ট হইবি, জগতে যাহারা তোর কর্ম্ম অবলম্বন করিবে তাহারা নিকৃষ্ট হইবে এবং তোর কর্ম্মাবলম্বী তোর সন্তানসন্ততিগণ পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট হইবে।" অগস্ত্য যেই এই শাপবাক্য

(১) পরাশর ভট্টার্থ—পরাশর ভট্ট আয়ার। (২) শঠারি একজন মহাপুরুষ। ইনি অতি প্রাচীনকালে দ্রাবিড় দেশের কোন শিল্পি জাতীয় শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবমত প্রচারের নিমিত্ত গ্রন্থ লেখেন কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে লোকে তখন তাঁহার মত গ্রহণ করে নাই। কিছুকাল পরে রামানুজাচার্য্য জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শঠারি কৃত প্রবন্ধকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া বৈষ্ণবমত প্রচার করেন।

(৩) দেবভাষাং পরিত্যজ্য কথং দ্রাবিড় ভাষয়া।

চক্রুঃ প্রবন্ধান্ সকলান্ কিমর্থং দিব্য সূরয়ঃ॥

উচ্চারণ করিলেন অমনি রোষে বিশ্বকর্ম্মার নয়ন প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তিনিও প্রতিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি দেবতাদের সম্মুখেই বলিলেন—"শোন মহর্ষি অগস্ত্য! তুমি যে দ্রাবিড়ী ভাষার সৃষ্টি করিয়াছ, অদ্য হইতে উহা পৈশাচী ভাষার তুল্য হইবে, উহার ব্যাকরণ শূদ্রজাতীয় ব্যাকরণ বলিয়া গণনীয় হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরা ঐ ভাষাকে ম্লেচ্ছভাষার ন্যায় হেয় মনে করিবেন। তোমার অধিষ্ঠিত দ্রাবিড় দেশ 'চোর দেশ' এই নামে কথিত হইবে। আমার অভিশাপে কোন ব্রাহ্মণই ঐ দেশে বাস করিবে না। ঐ দেশের লোক বঞ্চক খল এবং কলহপ্রিয় হইবে। অগস্ত্য উহা শুনিয়া পুনরায় বিশ্বকর্ম্মাকে গালি দিতে লাগিলেন। (এখন যেমন মাদ্রাজীরা (দ্রাবিড়ীরা) বৌবাজারের মোড়ে ফুট্‌পাথের উপর ঝগড়া করে ঐরূপ তুমূল ঝগড়া বাধিয়া গেল।) পার্ব্বতীর বিবাহ হইবে কি দেবতারা অগস্ত্য এবং বিশ্বকর্ম্মাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর, সমস্ত দেবতা সমবেত হইয়া অগস্ত্যকে বলিলেন—"মহর্ষে! আমাদের সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনি দক্ষিণ দিকে গমন করুন, আপনি না গেলে আমাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা।" বিবাহ দেখিতে গিয়া ফিরিয়া আসা কতদূর দুঃখজনক তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অগস্ত্যকে সেই কর্ম্মভোগ স্বীকার করিতে হইল। দেবতাদের অলঙ্ঘ্য আদেশ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, দক্ষিণাপথে ফিরিয়া আসিলেন। পৃথিবীও পূর্ব্বের ন্যায় ঠিক সমান হইয়া রহিল।

অগস্ত্য দক্ষিণদিকে আসিয়া পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার অভিসম্পাতের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে দারুণ কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি স্থির হইতে পারিলেন না, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালব্যাপি তপস্যা করিলেন। বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া অগস্ত্যকে দর্শন দিয়া বলিলেন ;—"মহর্ষে! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং অভিলষিত বিষয়ও আমার অবিদিত নাই। বিশ্বকর্ম্মার অভিসম্পাতে তোমার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, আমি এখনই তাহা দূর করিতেছি। এই দ্রাবিড় দেশে আমি নানা মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইব। আমি ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রুতির অর্থসকল দ্রাবিড় ভাষায় আনয়ন করিব। চারিসহস্র শ্লোকে যে প্রবন্ধ রচিত হইবে উহার নাম হইবে দ্রাবিড় বেদ। এতদ্ভিন্ন শূদ্রজাতীয় শঠকোপ মহামুনি দ্রাবিড় ভাষায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার "সহস্র গীতি" রচনা করিবেন। আরও সহস্র সহস্র মহাত্মা দ্রাবিড়ভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়া এই ভাষাকে জগৎ প্রসিদ্ধ করিবেন। আমি প্রসন্ন অন্তঃকরণে দ্রাবিড় দেশের সর্ব্বত্র বাস করিব। সুতরাং দ্রাবিড় দেশে পবিত্রতার অভাব থাকিবে না। কলিযুগের শাস্ত্রের যাহা কিছু গূঢ়ার্থ সমুদয়ই দ্রাবিড় ভাষায় প্রকাশিত হইবে। আমার অনুগ্রহে কাবেরী যেমন গঙ্গার অপেক্ষা অধিক পূত বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ দ্রাবিড়ী ভাষাও সর্ব্ব ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে (১)।

(১) গঙ্গাধিকাচ কাবেরী যথাভূন্মৎ প্রসাদতঃ।

তথৈব দ্রাবিড়ী ভাষা লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি॥

এই গল্প যিনি যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, দেশীয় ভাষার মধ্যে দ্রাবিড়ী ভাষা কাব্য ইতিহাস ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের জন্য অতুল সম্পদের অধীশ্বরীরূপে বিরাজিত। আরও অসংখ্য গ্রন্থ বিরচিত হইলে তবে বাঙ্গালা ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার সমকক্ষতা লাভ করিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

প্রস্তর চিত্রণ।

Art of Lithography.

(১১৪ পৃষ্ঠার প্রকাশিতাংশের পর।)

পেন্সিল (chalk) কর্ত্তন ও ধারণ ও ইহা দ্বারা প্রস্তরোপরি চিত্র করিবার নিয়ম।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রস্তরে কি প্রকারে চিত্র স্থানান্তরিত করিতে হয় তাহার নিয়ম কথিত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে প্রস্তরে চিত্র করিবার পেন্সিল (chalk) কিরূপে কর্ত্তণ ও ধারণ করিতে হয় তাহা বলা হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে কথিত নিয়মানুসারে চিত্রের রেখা সকল স্থানান্তরিত করিয়া এক্ষণে প্রস্তর-চিত্রের পেন্সিল (chalk) দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এক্ষণে সাবধান হইতে হইবে যেন প্রস্তর-গাত্রে লালা, ঘর্ম্ম, প্রভৃতি কোন তৈলাক্ত দ্রব্য পতিত না হয় কিম্বা হস্তস্পর্শ না হয়।

প্রস্তর-চিত্রের পেন্সিল সাধারণ পেন্সিল অপেক্ষা ভগ্নশীল, এ জন্য ইহাকে সূক্ষ্ম করিয়া কাটিতে হইলে ও হস্তে ধারণ করিয়া প্রস্তরে চিত্র করিতে হইলে অতিশয় সাবধানতার আবশ্যক। ইহাও এস্থলে বলা আবশ্যক যে এই পেন্সিল দুই তিন প্রকার কঠিনত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে অর্থাৎ: কঠিন কোমল প্রভৃতি বহু প্রকারের ব্যবহার হইয়া থাকে।

চিত্রের প্রয়োজনীয় বর্ণ অনুসারে পেন্সিলের মুখও কর্ত্তন করা আবশ্যক। যে চিত্রের বর্ণ অধিক কাল হইবেনা তাহার জন্য পেন্সিল লম্বাভাবে সূক্ষ্মমুখ করিয়া কাটিলে ভাল হয়। মধ্যম প্রকারের কালবর্ণ আবশ্যক হইলে উহা অপেক্ষা কিছু ছোট করিয়া পেন্সিল কাটিতে হইবে। তদপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণে চিত্র আবশ্যক হইলে পেন্সিল আরও একটু ছোট মুখ করিয়া কাটিতে হইবে।

এই পেন্সিল কাটিবার সময় সাধারণ পেন্সিলের মত উপর হইতে নিম্নদিকে কাটিলে চলিবে না। ইহাকে নিম্ন হইতে উপর দিকে বাম হস্তের তর্জ্জনীর উপর স্থাপন করিয়া সাবধানে কাটিতে হইবে।

চিত্র করিবার সময় পেন্সিল (chalk) হস্তে ধারণ করিবার একটু কৌশলের আবশ্যক। যখন চিত্র গভীর কৃষ্ণবর্ণ হইবে, তখন পেন্সিল লম্বভাবে প্রস্তর উপরে ধারণ করিবে। আবার যখন অধিক কৃষ্ণবর্ণে চিত্র আবশ্যক না হইবে তখন পেন্সিল একটু হেলাইয়া ধারণ করিলে চিত্রকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে।

যখন বহুসংখ্যক রেখা পেন্সিল দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ চিত্রের জন্য প্রস্তরে অঙ্কিত করিতে হইবে, ঐ রেখা সকল যদ্যপি উপর্য্যুপরি একপার্শ্ব হইতে অঙ্কিত করা হয় তাহা অপেক্ষা উভয় পার্শ্ব হইতে একবার করিয়া রেখা অঙ্কিত করিলে চিত্র অধিক কৃষ্ণবর্ণ ও স্থায়ী হইবে। অতএব চিত্রের যে স্থান কৃষ্ণবর্ণ করিতে

হইবে সে সকল স্থানে এক একটী রেখার উপর পুনঃ পুনঃ এক পার্শ্ব হইতে পেন্সিল টানিবে না, ভিন্ন ভিন্ন পার্শ্ব হইতে রেখা অঙ্কিত করিয়া চিত্রকে কৃষ্ণবর্ণ করিবে।

পেন্সিলের সূক্ষ্ম মুখ দ্বারা পুনঃ পুনঃ চিত্র করিলে মোটা হইয়া যায়, এজন্য শীঘ্র শীঘ্র পেন্‌সিল না কাটিয়া এক টুকরা কাগজের উপর ঘর্ষণ করিয়া মুখ সূক্ষ্ম করিবে। যখন মুখ ছোট হইয়া আসিবে তখন পুনর্ব্বার কর্ত্তন করিবে।

প্রস্তরে যাহারা প্রথমে চিত্র আরম্ভ করে তাহারা নরম অপেক্ষা কঠিন পেন্‌সিল ব্যবহার করিতে ভাল বাসে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে নরম পেন্‌সিল অধিক উপযোগী হয়, কারণ কৃষ্ণবর্ণ রেখাসকল এইরূপ পেন্‌সিল দ্বারা অতি সহজে অঙ্কিত করিতে পারা যায়। এবং এই সকল রেখার উত্তমরূপ ছাপা হয়। কঠিন ও নরম পেন্‌সিল একচিত্রে ব্যবহার করিতে পারা যায়। অধিক কৃষ্ণবর্ণ স্থানে নরম পেন্‌সিল ও অল্প কৃষ্ণবর্ণ স্থানে কঠিন পেন্‌সিল ব্যবহার করিবে। প্রতিকৃতি বা চেহারা অঙ্কিত করিবার সময় মুখ কঠিন পেন্‌সিল দ্বারা এবং কাপড় জামা প্রভৃতি নরম পেন্‌সিল দ্বারা অঙ্কিত করা আবশ্যক।

প্রস্তর চিত্রণের জন্য পেন্‌সিল (chalk) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে সকল উপকরণ দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়, বিভিন্ন প্রস্তুতকারিগণ উহাদের পরিমাণের অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে। এজন্য দেশের জলবায়ুর অবস্থা অনুসারে উপযুক্ত উপকরণে প্রস্তুত পেন্‌সিল ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রস্তর চিত্রণ শীতপ্রধান দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সকল পেন্‌সিলে কৃষ্ণবর্ণ উপকরণ অধিক থাকে তাহাদের অপেক্ষা অল্পকৃষ্ণ উপকরণযুক্ত পেন্‌সিলের চিত্র ভাল ছাপা হয়। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রস্তর চিত্রণের পেন্‌সিল বায়ুর জল আকর্ষণ করে, এজন্য ইহাকে খোলা বায়ুতে রাখা অতিশয় অকর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

ভাস্কর্য্য।

(৭৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

উৎকল প্রদেশ মধ্যে আর্য্য পঞ্চোপাসকগণের পাঁচটী স্বতন্ত্র তীর্থ বা প্রধান স্থান আছে, সেই কারণ উৎকলের আর একটী নাম "পঞ্চতীর্থ"। তন্মধ্যে পুরুষোত্তম বা জগন্নাথতীর্থ বা মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। ইহার এরূপ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, শঙ্করাবতার মহাকৌল শঙ্করাচার্য্যদেব বৌদ্ধ-প্লাবিত উৎকলখণ্ডে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ প্রকৃত কৌলের ভাবই অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ "অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবাচরেৎ" এই মহান্ শঙ্করাদেশ তিনি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি অতি অল্প আয়াসে উৎকলে পুনরায় নূতন বা সংস্কৃত (reformed) হিন্দু আচারের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। সে সময় পুরীর সেই প্রবল বৌদ্ধ মতকে পরাস্ত করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধের মিলন-জাত এই এক নূতন মতের প্রচার

করা ব্যতীত তিনি প্রাচীন মত পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর পান নাই। ঐতিহাসিক বর্ণনা হইতে জানা যায়, পুরীই বৌদ্ধদিগের প্রধান স্থান বা আড্ডারূপে পরিণত হইয়াছিল। জগন্নাথ মন্দিরও তখন বর্ণ-বিচার-বিহীন একচ্ছত্র বৌদ্ধমন্দিরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যদেব সেই বৌদ্ধাচারপরায়ণ উৎকলবাসিগণকে কতক কতক বৌদ্ধভাবেই ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রাদি-বর্জ্জিত পূজা অর্চ্চনার অধিকার দিয়াছিলেন। এ সকল বিষয় অনেকেই জানেন, সুতরাং অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। সাধারণ উপাসক সম্প্রদায় বৈষ্ণবের সংখ্যাই স্বভাবতঃ অধিক ; বিশেষ ভক্তিমার্গে ভগবানের আরাধনাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য প্রকৃষ্ট প্রাথমিক সাধনা বলিয়া আচার্য্যগণ চিরদিনই উপদেশ প্রদান করেন। সেই কারণ ভারতের আপামর সাধারণ ব্যক্তি (mass) বিষ্ণু-উপাসক। উৎকলখণ্ডস্থিত পঞ্চতীর্থমধ্যে পুরুষোত্তম ভগবান জগন্নাথক্ষেত্র সেই শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুতীর্থ বলিয়া পরিচিত, সুতরাং সাধারণ ভাবেই তাহার প্রসিদ্ধি অধিক। অন্য চারিটী তীর্থ মধ্যে উপাসকের সংখ্যা ভেদে কোনটীর প্রসিদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্প, কোনটীর যৎসামান্য, আবার কোনটী বা একেবারেই উপসকাভাবে বহুদিন হইতে জীর্ণ দীর্ণ হইয়া ক্রমে মরুভূমির বালুকাঙ্গের পরিপুষ্টি করিতেছে। ইহা ত স্বাভাবিক কথা ! প্রাণের লোক না থাকিলে কে কাহাকে কোন্ দিন আদর করিয়া থাকে ? এরূপ অবস্থায় যে অন্যের ভালবাসা-মুগ্ধ, সে তাহার অবসর ও সুযোগ পাইলে সেই হতাদরের সুন্দর অলঙ্কারখানিও বিনা আপত্তিতে সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রণয়ীর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াই থাকে। ফলে একের উন্নতিতে অন্যের অবনতি হয়! উৎকলে আদর পাইয়া বিষ্ণুতীর্থ যে ভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে, অন্যগুলি তেমনটী হইবার অবসর পায় নাই। শিবতীর্থ ভুবনেশ্বর, শক্তিতীর্থ যাজপুর, বিনায়কতীর্থ দর্পণা, একেবারে হতশ্রী হয় নাই; এখনও তত্তৎ তীর্থ বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজা অর্চ্চনা করিবার লোক আছে। কিন্তু অর্কতীর্থটী একেবারেই উপাসকাভাবে যেন সম্পূর্ণই মৃত—সেই বিরাট বৈজয়ন্তিবপু যেন আজ কয়েক খণ্ড অস্থি-কঙ্কাল মাত্রে পরিণত ! যাঁহার চক্ষু আছে, যাঁহার প্রাণ আছে, যাঁহার মানবসুলভ যৎসামান্যও আন্তরিকতা আছে, তিনি সূর্য্যমন্দিরের সেই শেষ চিহ্নমাত্র দেখিয়াই একেবারে মুগ্ধ প্রীত ও চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না—আর একবার প্রাণ ভরিয়া দরদরধারায় নয়নবিগলিত অশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত না করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না। আহা, সেই বিশাল মন্দির কি এক বিচিত্র রীতিতে বিনির্ম্মিত! অনেকেই পুরী, ভুবনেশ্বর, গয়া ও কাশীর অসংখ্য মন্দিররাজি দেখিয়াছেন। সকল মন্দিরেরই বাহ্য অলঙ্কারাদির যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও স্থূলতঃ ভিতরের ভাব প্রায় একরূপ। কিন্তু এই কোণার্ক মন্দিরের আমূল অন্তর্বাহ্য সমস্তই যেন স্বতন্ত্র ধরণের ! যদিও সেই মন্দিরাঙ্গের প্রধান অংশ মূল মন্দিরটী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত—তাহার প্রাচীর, প্রস্তর, মূর্ত্তি প্রভৃতি সকলই স্থানান্তরিত, লুণ্ঠিত বা অপহৃত ; তথাপি তাহার সভামণ্ডপ ভোগমণ্ডপ ও সিংহদ্বারের যে ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই সহজে ইহার বৈচিত্র্য ও বিশালত্বের অনুভব করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ

মন্দিরটী যেন ঠিক মন্দির নহে, সে এক বিপুলকায় রথের আকারে বিনির্ম্মিত। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূর্য্যদেব গগনমার্গে শুভ্র সৌর রথে বিচরণ করেন। হিন্দুদিগের সকল দেবতার 'স-বাহনায়' বলিয়া পূজা করিবার রীতি আছে। সেই কারণ বাহন বা যানযুক্ত মূর্ত্তিই সাধকে পূজা করিয়া থাকেন। সূর্য্যোপাসকগণ ভারতের যে যে স্থানে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সকল স্থানেই সেই একরূপ অরুণ সারথি দ্বারা পরিচালিত সপ্ত অশ্বযুক্ত সৌর রথে সূর্য্যদেব হয় উপবিষ্ট না হয় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থদর্শকের মধ্যে অনেকেই তাহা বহুস্থানেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। হিন্দুর এই শ্রেষ্ঠ সূর্য্যতীর্থ এখনও তাহাই বিরাটভাবে দেখিতে ও অনুভব করিতে পাওয়া যায়। সমগ্র মন্দিরটীই যেন সেই এক বিশাল রথের আকারে বিনির্ম্মিত। সম্মুখে সিংহদ্বাররূপে রথের বেগগামী অশ্বগুলি যুগ্মভাবে সুসজ্জিত ও পর পর রথে সংযোজিত। ভোগমণ্ডপ, সভামণ্ডপ, (এদেশে ইহাকে নাট্যমন্দির বা নাটমন্দির বলে) ও ক্রমে মূল মন্দির পাদস্থিত উপান ও উপপীঠ সকল রথাকারে বৃহৎ প্রস্তর খোদিত সুন্দর রথচক্র সমুহে সুশোভিত। সর্ব্বোচ্চ মূল মন্দিরাভ্যন্তরেই সূর্য্যদেবের একটী সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার নিম্নাংশ উপপীঠভাগ মাত্র তাহার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। তাহারই মধ্যে এখনও সেই সৌর-পীঠ-বেদীকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখস্থিত সেই সুন্দর অরুণস্তম্ভটী এক্ষণে সর্ব্বজন পরিচিত জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে প্রোথিত রহিয়াছে। জগন্নাথ-দর্শনার্থী যাত্রিগণ সকলেই তাহা দেখিয়াছেন। সেই প্রাচীর, প্রস্তর ও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রমে জগন্নাথ মন্দিরের অঙ্গ বর্দ্ধিত করিয়াছে। এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ দিবার এক্ষেত্র নহে। সময়ান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃতভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল। যে বিষয় বলিতেছিলাম, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। সেই অশ্ব ও তাহার সজ্জা,— কোণার্কের অন্তর্গত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাস্কর্য্যমধ্যে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। একটী প্রস্তরখোদিত প্রকাণ্ড অশ্বের আলোকচিত্রের প্রতিলিপি যাহা গত পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়ছে, তাহা হইতেই সকলে সেকালের অশ্ব-সজ্জা সম্বন্ধে অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ জানিতে পারিবেন। মূর্ত্তিটী অতি সাধারণ বালি-পাথরে নির্ম্মিত। চিরদিন প্রাকৃতিক জলবায়ুর তাড়নায় এ সমস্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও আসলে জিনিসগুলি এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক মান্যাস্পদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অন্যান্য পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, সে কালে ঘোড়ার জিন বা রেকাবের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না, অধিকাংশ সময়ে কয়েকখানি গদি উপর উপর রাখিয়া জিনের কাজ চলিত। আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় সাধারণ আরোহীরা ঐরূপ ভাবেই অশ্বারোহণ করিত। কিন্তু বিশিষ্টব্যক্তিগণ ও সৈনিকপুরুষ সকল অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত জিন আঁটিয়াই আরোহণ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত চিত্র হইতেও তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইবে। বোধ হয় রাজেন্দ্র বাবু প্রভৃতি প্রাচীন ভাস্কর্য্য মধ্যে আরোহি-বিহীন সুসজ্জিত অশ্ব কোথাও দেখিতে পান নাই,

সেই কারণেই উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বিশেষ যে চিত্রটী আমি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এটী তাঁহার উড়িষ্যা দর্শন সময়ে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ কোণার্কের বহুঅংশ তখন বালুকাগর্ভে নিহিত ছিল। অতি অল্পকাল হইল এ সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা হউক এই অশ্বটী যে দ্বারদেশে সেবক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া প্রভুর অপেক্ষা করিতেছে, এইরূপ ভাবেই ইহার সাজসজ্জাগুলি দেখিতে অতি সুন্দর নানাবিধ কারুকার্য্যে গঠিত। এ সকল সাজের উপাদান চর্ম্ম, সূত্র ও ধাতুরত্ন প্রভৃতি,। চিত্রটী নিবিষ্টভাবে দেখিলে সমস্তই বোধগম্য হইবে। আর একটী মূর্ত্তি মন্দিরের অনেক উপরে দেখিলাম। তাহাও একটী সূর্য্য মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। অথবা তাহা মন্দিরের অলঙ্কার রূপে কোন অশ্বারোহী বীরেন্দ্র মূর্ত্তি হইবে, যেন মন্দির সংলগ্ন দ্বারমধ্য হইতে সবেগে বহির্গত হইতেছেন। এটীতেও জীন ও রেকাবের আদর্শ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সে কালেও রেকাব লোহার চাকার আকারে দড়ি বা ফিতার দ্বারা আবদ্ধ থাকিত। বল্গা বা লাগাম নানাবিধ ধরণের হইত। অগ্নিপুরাণ হইতেও তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণকার পঞ্চবিধ বল্গার উল্লেখ করিয়াছেন। ১। গোমূত্র, ২। কুটীল, ৩। বেণী, ৪। পদ্মমণ্ডলমালা, ৫। গর্ব্বীক। যাহা হউক প্রাচীন কালে বল্গাদির যে নামই থাকুক বা যেরূপ গঠনই থাকুক পূর্ব্বোক্ত অশ্বের চিত্র হইতে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা মিউজিয়মের মধ্যে (Visit of Raja Procenajit to Budha এইরূপ লিখিত) সুসজ্জিত অশ্বের একখানি প্রস্তর খোদিত ফলক আছে। তাহা হইতেও অনেক প্রাচীন কালের অশ্বসজ্জা সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। সেটীও দেখিতে প্রায় ঐ কোণার্কের চিত্রের অনুরূপ।

ক্রমশঃ।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

সূচী।

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক
কোণার্ক দর্শন।	কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন	১১[illegible]
চীনে সমাধিপ্রথা।	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১
বাল-বিধবার আক্ষেপ।	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী	১২[illegible]
দ্রাবিড়ী ভাষার প্রাচীনত্ব।	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	১২[illegible]
প্রস্তর চিত্রণ।	শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	১৩০
ভাস্কর্য্য।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	১৩[illegible]

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

আলোক চিত্রণ
বা
ফটোগ্রাফি শিক্ষা।

(প্রথম ভাগ)

৪র্থ সংস্করণ।

সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

প্রত্যেক ফটোগ্রাফারের পাঠ করা আবশ্যক।

মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকা

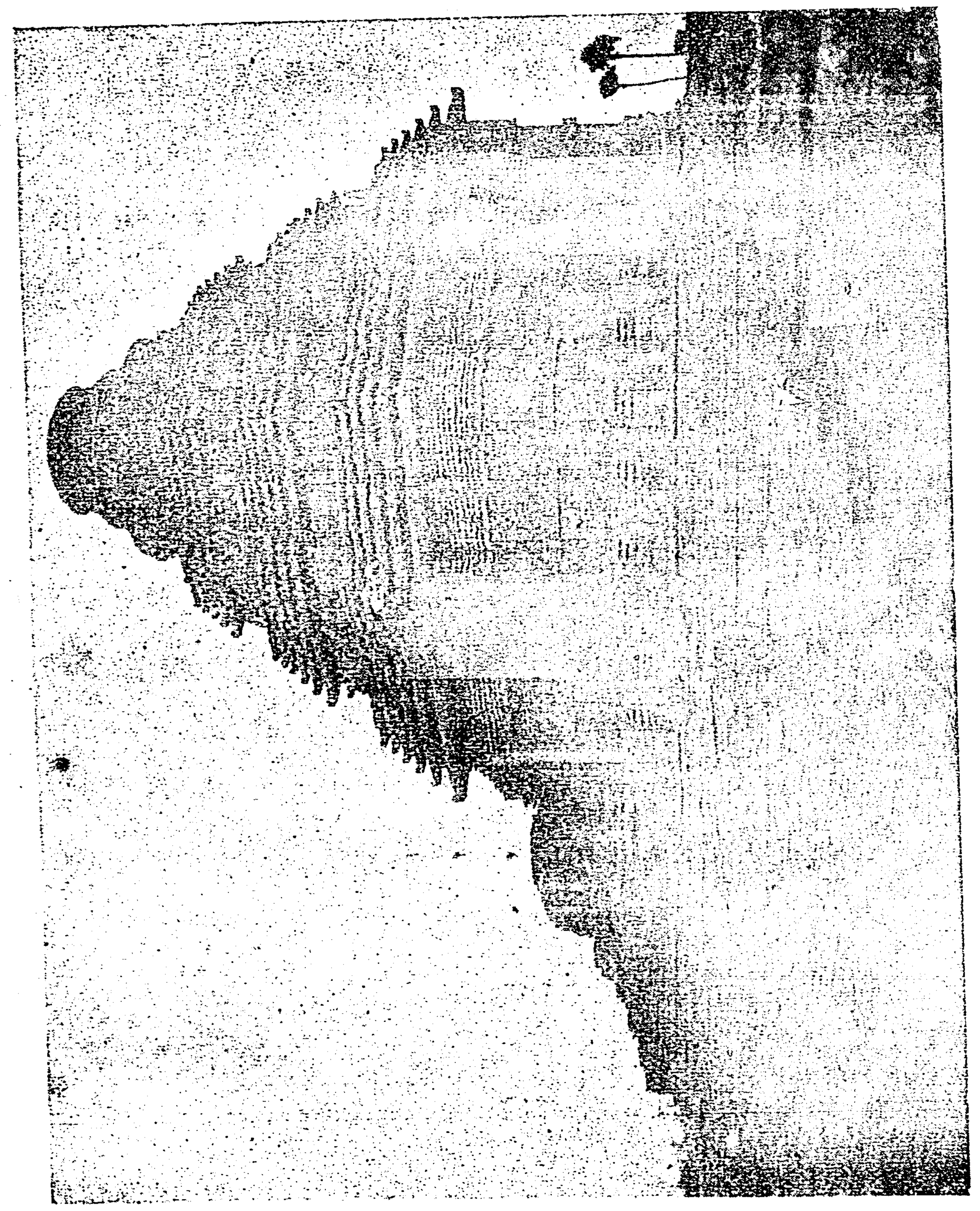

কোণার্কের জগমোহন।

The I. A. School, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য।

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণঃ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৯ম খণ্ড { চৈত্র সন ১৩১৬ ও বৈশাখ সন ১৩১৭। { ৭ম ও ৮ম সংখ্যা

দীন-সংগীত।

একি হলো বল, বুঝি প্রাণ গেল,
পাহাড়ে পর্ব্বতে, বরফেরই শীতে,
কাঁপিতে কাঁপিতে, দিবা নিশি গেল ॥
উঠিতে নামিতে, কত দুঃখ চিতে,
না পারি কহিতে, বদরী বিষাল ॥
একি দূরদেশ, না দেখি যে শেষ,
শ্বাস ও প্রশ্বাস, শেষ হয়ে এল ॥
পর্ব্বত উচ্চতা; গঙ্গা গম্ভীরতা,
পথ দুর্গমতা, বড়ই ভয়াল ॥
তীর্থে তৃপ্তি কই, সব ভুয়া সই,
শুদ্ধ হই হই, হয় যে কেবল ॥
অর্থ পরমার্থ, পাইলে কৃতার্থ,
মিথ্যাই যথার্থ, জগতে রটিল ॥
মাগো তুমি কোথা, এসে দেখ হেথা,
মুখে নাহি কথা, চখে বহে জল ॥
কাঁদে দীন ছেলে, পড়ে ভূমিতলে,
মা বিনে কে তুলে, ধুয়ে কাদা ধূল॥

কঠিন কেদারনাথ তীর্থের অনতিদূরে, তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতবেষ্টিত একটা সমতল ক্ষেত্রে বসিয়া কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত হইয়াছিলাম বলিয়াই এই দীন-গীতটী রচিত হইয়াছে। হিমাচলে নিশায় পর্ব্বতের উপর বরফ পতিত হয়, পরে অত্যন্ত শীতল অবস্থায় জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইয়া যায়, প্রাতে নভঃমণ্ডলে সূর্য্যোদয় হইলে, সূর্য্যকরে তাহাই ধীরে ধীরে গলিয়া পুনরায় শীতল জলে পরিণত হয়, জীব সেই সুনির্ম্মল জল পান করিয়া যেরূপ সুশীতল হয়, সেইরূপ নরগণের অহঙ্কাররূপ পর্ব্বতের উপর অজ্ঞান নিশায়, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অষ্টপাশরূপ বরফ পড়িয়া কঠিন জমাট

হইয়া আছে ; যদি ভাবনভেঃ কভু মহাভাবময় সূর্য্যোদয় হয়, তবেই সেই সব বরফ গলিয়া ভগবৎ প্রেমরূপে স্নিগ্ধ সলিলে পরিণত হইবে। জীব তাহা প্রাণভরিয়া পান করিয়া যেমন সুশীতল হইবে, সেই-রূপ তাহাতে ভাসিতে ভাসিতে সংসার-বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

স্বামী দীনানন্দ।

চিন্তেপাগ্‌লা।

১০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর।

প্রথম কথা।

জমাখরচ।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে আপন আপন আয় ব্যয়ের পরিমাণ জানিবার জন্য একটা হিসাব লিখিয়া রাখে। সেই হিসাবের নাম জমাখরচ। যিনি জমিদার, তিনি হিসাব করিতেছেন যে, তাঁহার জমিদারি হইতে কত টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা, তন্মধ্যে কত টাকা আদায় হইয়াছে, কত টাকা আদায় হইতে বাকী আছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে কত টাকা খরচ হইয়া তাঁহার তহবিলে কত টাকা মজুত আছে। যিনি উত্তমর্ণ তিনি হিসাব করিতেছেন যে, তিনি কাহাকে কত টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন, তাহা সুদে আসলে কত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কত টাকা আদায় হইয়াছে, এবং কাহার কাছে কত টাকা পাওনা রহিয়াছে। অধমর্ণ হিসাব করিতেছেন যে, তিনি কাহার নিকট কত টাকা ঋণ লইয়াছেন, তাহার কত পরিমাণ তিনি শোধ করিয়াছেন এবং কত টাকার জন্যই বা তিনি এক্ষণে দায়ী আছেন। ব্যবসায়ী হিসাব করিতেছেন যে, তিনি ব্যবসায়ের জন্য কত মূলধন বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কি পরিমাণে লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে। আবার যিনি কাহারও নিকট কস্মিন্‌কালে ঋণ গ্রহণ করেন নাই বা কখনও কাহাকেও কিছু ঋণ দেন নাই, অথচ যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন তাহাতেই তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তিনিও সখ করিয়া নিজের আয় ব্যয়ের একটা হিসাব রাখিয়া থাকেন। যিনি লিখিতে জানেন, তিনি লিখিয়া হিসাব করেন ; যিনি লিখিতে না জানেন, তিনি মুখে মুখে কিম্বা কোনও স্থানে কোনও প্রকার চিহ্ন রাখিয়া হিসাব করেন। যাহা হউক জমাখরচ যে সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি এই জমাখরচ প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি হয় একজন বিলক্ষণ দূরদর্শী, না হয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি একবার নিজের কথা বলিতেছি। আমি চিন্তেপাগলা, সংসারের আয় ব্যয়ের কোনও ধার ধারি না, অথচ আমার একটা জমাখরচ আছে। আমি প্রত্যহই আপনার জমাখরচের একটা হিসাব নিকাশ করিয়া থাকি। যখনই আমি নিজের হিসাবের প্রতি দৃষ্টি করি, তখনই দেখিতে পাই যে, আমার খরচ মোটে নাই, কেবল জমাই সুদে আসলে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কি উপায়ে আমার জমা শূন্যে পরিণত হইবে, এই ভাবিতে ভাবিতেই আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। যদি তোমরা কেহ আমার জমাটি গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই। আমি মন খুলিয়া তোমাদিগকে দান করিতেছি, তোমাদিগের লইতে আপত্তি কি? না, দান করা হইল না, কারণ দান গ্রহণ করিলে তোমরা আমার নিকট ঋণী হইয়া যাইবে, তাহাতে আমার জমা বাড়িবে বই কমিবে না।

ভাই ধনেশকুমার! তুমি যে যাদুমন্ত্রবলে তোমার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্য এক-দিনে, এক মুহূর্ত্তে, এমন কি এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছ, আমাকে সেই দিব্য বিদ্যাটী শিখাইবে কি? না, তাহা তুমি পারিবে না, সে বিদ্যা তুমি অনেক দিন হইল ভুলিয়া গিয়াছ। তবে আমার উপায়? এই অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সকলেরই ত উপায় আছে—যে যাহা অন্বেষণ করে সেত তাহাই পায়? এখানে যেমন উৎকট রোগ আছে, তাহার উপশমকারী ঔষধও আছে,—যেমন প্রাণান্তক হলা-হল আছে, তেমনি সঞ্জীবনী সুধাও আছে—যেমন গাঢ় অন্ধকার আছে, তেমনি তন্নিবারক আলোক রাশও বিদ্যমান আছে—যেমন শত শত অন্ধ আছে, তেমনি তাহাদিগকে পথ দেখাইবার জন্য অসংখ্য নিয়ন্তাও আছে,। তবে আমার কি কোন উপায় হইবে না? কই, আমিত নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না! তোমরা কেহ দয়া করিয়া আমাকে একটি উপায় বলিয়া দিবে?

হায় হায়! তোমরা যে আমার কথা শুনিয়া উপহাস করিতেছ, আর বলিতেছ যে, জমা কাহাকেও চেষ্টা করিয়া কমাইতে হয় না, ইহা আপনা হইতেই কমিয়া যায়, ইহার জন্য এত পাগলামি কেন? ভাই, তোমরা প্রকৃত জমা খরচ কি তাহা এখনও বুঝ নাই, তাই এরূপ বলিতেছ। কিন্তু যেদিন তাহা বুঝিতে পারিবে, সেদিন তোমরা চিন্তেপাগলা অপেক্ষাও অধিক পাগল হইয়া উঠিবে। আমি ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমরা এই জমা খরচের জ্ঞানটি শীঘ্র শীঘ্র প্রাপ্ত হও এবং সেই জ্ঞান লাভ করিয়া আমা অপেক্ষা অধিক পাগল হইয়া উঠ।

তোমরা পাগল হইতে চাও না কেন? পাগল তোমাদিগের নিকট নিন্দার পাত্র কি জন্য? ভাই, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ দেখি, এ জগতে পাগল কে নয়? মনে মনে বুঝিয়া দেখ দেখি, তুমিও একজন বদ্ধ পাগল কি না? হয় তুমি রূপ, ধন, মান, যশঃ বা ক্ষমতার জন্য পাগল, না হয় তুমি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা বা ধর্ম্মের জন্য পাগল। তোমরা পেটের কথা কাহা-কেও ভাঙ্গিয়া বলনা, তাই তোমরা প্রকৃতিস্থ ; আর চিন্তেপাগলা মনের দ্বারে কবাট দিয়ে রাখে না, তাই এ চিন্তেপাগল। তোমাদিগের কপটতা বিলক্ষণ অভ্যস্ত। পাগল, কপটতা কাহাকে বলে তাহা একেবারেই জানে না। তবেই ভাবিয়া দেখ, এ পাগল তোমাদিগের অপেক্ষা ভাল কি মন্দ! তোমাদিগের মত কপটা-চারী প্রকৃতিস্থ লোকের দ্বারা জগতের যেরূপ অনিষ্ট হইতেছে, প্রকৃত পাগলের দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও সংঘটিত হয় না। তোমরা অহোরাত্র পরের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছ, পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছ, তাহাতে তোমাদিগের মনের শান্তি হয় কি না জানি না, কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, তোমাদিগের অন্তরে অনুক্ষণ তুষা-

নল জ্বলিতেছে, তাহার তাপে তোমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছ। পাগলের মনে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, খলতা নাই, সে আপনার আনন্দে আপনি বিভোর। তাই বলি তোমরা সকলে পাগল হইয়া যাও—চিন্তেপাগলার মাথার দিব্য তোমরা পাগল হইয়া যাও, তাহা হইলে শান্তিলাভ করিবে।

হরি, হরি! কি কথা বলিতে বসিয়া কি কথা বলিতেছি! আমার উপায়? আমার জমাখরচ করিবার উপায়? তোমরা বলিবে-আমি বিষয় সম্পত্তি হীন, পথের ভিখারী, আমার আবার জমা কিসের? ভাই, এ বড় বিষম জমা, এ টাকা আনা পয়সা নয়! ইহা সংসারে আসিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আইসে, আবার সংসার ছাড়িয়া যাইবার সময় সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া থাকে। মরিলেও ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। যিনি স্থির চিত্তে কখনও এই জমা খরচের বিষয় ভাবিয়াছেন, তিনিই ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। চিন্তেপাগলার সবিনয় নিবেদন যে, যিনি এই জমা খরচের বিষয় এখনও বুঝেন নাই, তিনি যেন বাজে জমা খরচের কথা ছাড়িয়া দিয়া, একবার ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন; নতুবা তাঁহাকে এই জমাখরচের জন্য ভবিষ্যতে ঘোরতর নিকাশের দায়ী হইতে হইবে।

শুনিয়াছি বাসনাই আমাদিগের এই জমাখরচের সৃষ্টিকর্ত্তা। আবার বাসনার সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগের মন। তবেই ত বিষম গোলযোগে পড়িয়া গেলাম। মন যে কিছুতেই আমার বশ মানে না। তাহাকে যে দিকে যাইতে বারম্বার নিবারণ করি, সে সেই পথেই অগ্রে গমন করে। তোমরা বনের পশুকে বশ করিতে জান—যাহার উপর তোমাদিরে মন পড়ে, তাহাকে বশ করিতে বিধিমত প্রকারে চেষ্টা কর—কত গুণ গান, তুক তাক্ করিয়া থাক। তোমাদিগের কাছে আমার করযোড়ে নিবেদন যে, আমাকে বশীকরণ বিদ্যা শিখাইয়া দাও, আমি মনকে বশ করিব। যদি বশীকরণ কার্য্যটাকে অসৎ কর্ম্ম মনে কর, তাহা হইলে আমাকে একটী সদুপায় বলিয়া দাও, যাহাতে আমার মনকে ধরিয়া একবারে তাহাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিতে পারি। আহা, কি আনন্দের কথা! চিন্তেপাগলার অদৃষ্টে কখনও এমন দিন ঘটিবে কি?

ভাল কথা, আর একটী কাজ করি ত সকল গোল মিটিয়া যায়? এ জমার সূত্রপাত কোথা হইতে হইল, তাহাই কেন একবার ভাবিয়া দেখা যাউক না? আমরা এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সকল কার্য্য করি সেইগুলিন আমাদিগের কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। কর্ম্মের ফল ভোগ না করিলে কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। আবার সমস্ত কর্ম্মফলও জীবের একজীবনে শেষ হয় না, কতকগুলিন অবশিষ্ট থাকিয়া যায় এবং তাহারাই জন্মান্তরে সঙ্গে সঙ্গে আইসে। যেমন একটী গর্ত্ত পূরণ করিতে গিয়া লোকে আর একটী নূতন গর্ত্ত খনন করে, সেইরূপ একটি কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার সময় আবার অন্য নানাবিধ কর্ম্ম করিতে হয় এবং তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকে। জীবগণও কোন সময়ে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না, কারণ প্রকৃতি তাহাদিগকে নিয়তই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে। অতএব আমাদিগের জীবনটি কেবল কর্ম্মের সমষ্টি মাত্র। যখন আমি প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিতেছি তখন আমি অবশ্যই স্বাধীন

নহি এবং এই মুহূর্ত্তের পর-মুহূর্ত্তে কি কর্ম্ম করিব, তাহা যখন বলিতে পারি না, তখন আমি সেই কর্ম্মের কর্ত্তা হই কেন? কেন কর্ত্তা হই? আমি আপনাকে কর্ত্তা মনে করি বলিয়া, নচেৎ আমি কে? আমি এই বিশাল বিশ্ব-সংসারে একটি বায়ুতাড়িত গলিত পত্রমাত্র অথবা প্রকৃতির হস্তে কলের পুত্তলিকা! পুত্তলিকার ক্রীড়ার দোষগুণ পুত্তলিকার নহে, তাহা ক্রীড়কের স্কন্ধেই অর্পিত হইয়া থাকে। তবে আমার এত ভাবনা কি জন্য? কর্ম্ম যখন আমার নয় তখন জমাও আমার নয়। যাঁহার কর্ম্ম তিনিই তাহার ফলভোগ করুন, আমার তাহাতে দাবি দাওয়া কিছুমাত্র নাই। চিন্তেপাগলা! আজি হইতে তুমি জমাখরচের দায় এড়াইলে। ভাই, তোমরা যদি কেহ আমার কথা শুন, তাহা হইলে তোমরাও আমার মত জমাখরচের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

দ্বিতীয় কথা।

হাট।

আজি হাটের দিন। প্রাতঃকাল হইতেই পথে জনতা আরম্ভ হইয়াছে। কেহ ভার মাথায় লইয়া যাইতেছে, কেহবা ভার লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। যাহারা ভার লইয়া গিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শূন্য বাজরা লইয়া ফিরিতেছে, কেহবা নিজের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিতেছে। আবার অনেকে হাটে যাইবার সময় শূন্যহস্তে গিয়া প্রচুর দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছে।

হাটের ভিতরেও দৃশ্য বিবিধ। কেহ বসিবার স্থানের জন্য অন্যের সহিত বিবাদ করিতেছে। প্রথমে গালাগালিতে সূত্রপাত হইয়া হাতাহাতিতে উপসংহার হইতেছে। কেহ মাথার বোঝা নামাইয়া বসিবার জন্য আসন পাতিতেছে, কেহ আসন পাতিয়া হস্তে পদে জল দিতে যাইতেছে, কেহ হস্তপদাদি ধৌত করিয়া তামাক সাজিতেছে। আবার কেহবা খরিদ্দারের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আলস্যে চক্ষু মুদ্রিত করিতেছে। কেহবা ব্যস্ততার সহিত দ্রব্যাদি ওজন করিতেছে। কোথাও কোন খরিদ্দার স্বল্পমূল্যে প্রচুর দ্রব্য ক্রয় করিবার সংকল্প স্থির করিতেছে, কেহবা দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মোটেই তাহার মূল্য দিবেনা, এইরূপ পন্থা অন্বেষণ করিতেছে। আবার কোনও দোকানদার উৎকৃষ্ট দ্রব্যের মূল্য লইয়া অপকৃষ্ট দ্রব্য চালাইতেছে কিম্বা ওজনে বিলক্ষণ কম দিতেছে। পরে তাহার প্রতারণা প্রকাশিত হইয়া সকলের নিকট তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। কোন বিক্রেতা অতি সামান্যমাত্র উত্তম দ্রব্য উপরে সাজাইয়া নিম্নে অতি অপদার্থ দ্রব্য রাখিয়া তাহার সমস্ত দ্রব্যই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচয় দিতেছে এবং খরিদ্দারের নিকট হইতে অধিক মূল্য চাহিতেছে। কোন দোকানদারের পণ্যগুলি নিতান্ত অপকৃষ্ট হইলেও তাহার মুখ দিয়া সেই দ্রব্যের এত সুখ্যাতি বাহির হইতেছে যে, খরিদ্দারগণ তাহাই বিশ্বাস করিতেছে এবং তাহার গলাবাজীতে মোহিত হইয়া সেই দিকেই ছুটিতেছে। কোনও বিক্রেতা যথার্থই উত্তম দ্রব্য আনিয়াছে কিন্তু তাহার মুখে কথা নাই বলিয়া কোনও খরিদ্দারই তাহার নিকট যাইতেছে না।

একদিকে কতকগুলি মনোহারীর দোকান

বসিয়াছে। সেই ক্ষণভঙ্গুর ও অকিঞ্চিৎকর খেলনার সামগ্রী ক্রয় কয়িবার জন্ত পালে পালে খরিদ্দার ছুটিতেছে। বলা বাহুল্য যে, ইহারা প্রায়ই অল্পবয়স্ক। এই সকল দোকানদারগণ এত বিক্রয় করিতেছে যে, তাহাদিগের হাতের অবকাশ নাই বলিলেই হয়। বালকেরা এই সকল খেলনা ক্রয় করিয়াই তাহা লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। ক্রীড়া করিতে করিতে অনেকেরই খেলনা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যাহাদিগের খেলনা ভাঙ্গিতেছে, তাহারা রোদন করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছে; আর যাহাদিগের খেলনা এখনও ভাঙ্গে নাই, তাহারা হাসিতেছে এবং আপনাদিগের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের খেলনাও অচিরে ভঙ্গ হইবে বলিয়া বোধ হয়।

এক স্থানে জনৈক বাজীকর বসিয়া তাস ও পাশার অপূর্ব্ব ক্রীড়া কৌশল দেখাইতেছে এবং তাহার সহিত এই খেলায় যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বিলক্ষণ লাভ হইবে, এইরূপ বুঝাইয়া দিতেছে। কেহ কেহ সেই লাভের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া খেলায় প্রবৃত্ত হইতেছে। প্রথমে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ লাভ হইলেও পরিশেষে নিঃসম্বল হইয়া মনের ক্ষোভে তাহাদিগকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। এই খেলা দেখিবার জন্ত কৌতূহল বশতঃ যাহারা তথায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগেরও যে কিছু ক্ষতি হয় নাই এরূপ নহে। যখন হাট করিবার জন্য নিজের গাঁইট হইতে পয়সা বাহির করিতে যাইবে, অমনি দেখিতে পাইল যে, তাহারা হাট করিবার জন্য যাহা কিছু আনিয়াছিল, তাহা আর তাহাদিগের নিকটে নাই, কিরূপে অজ্ঞাতসারে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অতএব তাহারা আর কি করিবে, কেবল হায় হায় করিতে করিতে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে।

যখন হাট বেশ বসিয়াছে, তখন হাটের স্বত্বাধিকারীর লোকেরা দান আদায় করিতে বাহির হইল। দোকানদারগণ তৎপ্রদানে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলেও কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইল না। তাহার পর আবার গ্রামের দেবল ও অন্যান্য যাচকগণ দলবদ্ধ হইয়া এক ধার হইতে তোলা তুলিতে আরম্ভ করিল। এই উপলক্ষে দোকানদারগণের সহিত তাহাদিগের অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইল বটে কিন্তু তোলা আদায়ের কার্য্য কিছুতেই রহিত হইল না।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ সকলেই হাট হইতে চলিয়া যাইতেছে, পরে আর জনতার চিহ্নমাত্র রহিল না। আমি হাট করিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু হাটের এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আর হাট করিবার ইচ্ছা হইল না। তখন একটি বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, লোকসকল ক্ষণকালের নিমিত্ত একত্র সমবেত হইয়া কিজন্ত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়—কেনই বা পরস্পর পরস্পরকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করে? যদি সকলেই সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে কেহ কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হয় না—কেহ কাহারও সহিত বিবাদ করে না—যেমন হাসিমুখে আসিয়াছিল তেমনি সকলে হাসিমুখে চলিয়া যায়। কিন্তু এই অসদাচরণে কাহার যে কি ইষ্টলাভ হইল, তাহাও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইমাত্র বুঝিলাম যে, হাট আর কিছুই নয়, কেবল এই মহান বিশ্বনাটকের একটি সংক্ষিপ্ত অভিনয়মাত্র। এই বিপুল

সারক্ষেত্রে যুগযুগান্তর ধরিয়া যাহা প্রতিদিন প্রতিহূর্ত্তে সংঘটিত হইতেছে, হাটের এই সংকীর্ণস্থানে, ল্পমাত্র সময়ের মধ্যে তাহারই প্রতিকৃতি দেখিলাম। খিলাম—জীবগণ যেরূপ দিবারাত্রি সংসারে প্রবেশ রিতেছে এবং লীলাসম্বরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইরূপ লোকে হাটে আসিতেছে ও যাইতেছে! বিগণ সংসারে আসিবার কালীন তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের একরূপ বোঝা লইয়া আইসে, আবার াইবার সময় অন্তরূপ কর্ম্মের ভার লইয়া প্রস্থান রে। তবে যাহাদিগের কর্ম্মফল এই সংসারেই ংশেবিত হইয়া যায়, অথচ নূতন কর্ম্ম আর কিছুই ঞ্চিত হয় না, তাহারাই কেবল রিক্তহস্তে ফিরিয়া ায়। কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প।

হাটের ভিতর বসিবার স্থান লইয়া যেরূপ রস্পর বিবাদের অবতারণা, সংসার ক্ষেত্রেও সেইপ বিবাদ তুমুল ভাবে চলিতেছে। প্রতিবাসী তিবাসীর সহিত ভূমিসম্পত্তি লইয়া বিবাদ রিতেছে, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত লাঠালাঠি করিতেছে, এক ভূপতি অন্ত ভূপতির সহিত মহা সমর আরম্ভ রিয়াছে। ফলকথা, যিনি একবার যে বস্তু ধিকার করিয়াছেন, তিনি প্রাণ থাকিতে তাহা রকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। তাহাতে উক, মান যাউক, প্রাণ যাউক, এমন কি বংশ লোপ হউক তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ নেন। আবার উভয় পক্ষের মিত্রবর্গও উভয় ক্ষের পৃষ্ঠপোষক হইয়া সেই বিদ্রোহ-বহ্নিতে উপর্য্যপরি আহুতি প্রদান করিতে থাকে। দুর্য্যোধন াণ্ডুপুত্রগণের সর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া বসিয়াছেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট পাঁচখানিমাত্র গ্রাম ভিক্ষা চাহিলেন, দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং কুরুক্ষেত্রে মহাসমর প্রজ্জ্বলিত হইল। ভারতের নৃপতিবৃন্দ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পক্ষ গ্রহণ করিলেন, নরশোণিতে ধরাতল প্লাবিত হইল, দুর্য্যোধন সবংশে বিনষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন বীর, বীরোচিত কার্য্য করিলেন। বিনাযুদ্ধে পাঁচখানি গ্রাম ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় লোকে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিত! অতএব কাপুরুষ নামে অভিহিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই যশস্কর বিবেচনা করিলেন।

আবার লোক মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সহজে পরের বশ্যতা স্বীকার করাও নিতান্ত নিন্দার কার্য্য। এই জন্ত অনেক সময়ে বিবাদের সূত্রপাত হইয়া থাকে। আমার শৌর্য্য আছে, আমার বীর্য্য আছে, ধন আছে, জন আছে, আমি কিজন্ত তোমার বশবর্ত্তী হইতে যাইব? পরাধীন অপেক্ষা ঘৃণিত জীব জগতে নাই, তাহা জান না কি? ভাই স্বাধীনতা প্রিয়! তোমার এ ধারণা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু ভাই! তুমি যে অষ্টপ্রহর ধরিয়া তোমার দেহস্থ রিপুগণের দাসত্ব করিতেছ, তাহারা তোমাকে যে পথে লইয়া যাইতেছে, তুমি অন্ধের মত তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছ, কই কখনত তাহাদিগের হস্ত হইতে স্বাধীনতা লাভ করিতে প্রয়াস পাও না? তবে তুমি পরের অধীন হইব না, বলিয়া এত আস্ফালন করিয়া বেড়াও কেন ভাই? আর যাহাদিগকে তুমি ভালবাস বলিয়া মনে কর, তাহাদিগের সন্তোষের জন্ত যখন পরের পদলেহন করিতেও কুণ্ঠিত হও

না, তখন ভাই তোমার স্বাধীনতা-বৃত্তি কোথায় থাকে?

এই হট্টমন্দিরে যে সকল লোককে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া খরিদ্দার বা বিক্রেতাকে প্রতারিত করিতে সচেষ্ট দেখিলে, তাহারা কেবল তোমাদিগেরই আচরিত নীতির অনুসরণ করিতেছে মাত্র। অন্যের ধন আছে, বিষয় আছে, সুন্দরী রমণী আছে, তোমার তাহা নাই, তুমি তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য লালায়িত। তুমি চুরি করিতেছ, ডাকাতি করিতেছ, জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি কত কি কৌশল জাল বিস্তার করিয়া তাহা হস্তগত করিতে প্রয়াস পাইতেছ। পরস্বাপহরণই তোমাদিগের দিবারাত্র জপমালা এবং তাহাই তোমাদিগের ধ্যান জ্ঞান। চিন্তেপাগলার ধ্রুব বিশ্বাস যে, এই ধ্যানেই তোমাদিগের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে!

তোমরা কাচ, মৃন্ময় বা তদপেক্ষা অধিকতর অসার বস্তুকে নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত করিয়া তাহাকে অলৌকিক, মূল্যবান এবং সসার পদার্থ প্রমাণ করিবার জন্য কতই গলাবাজী করিয়া থাক এবং তদ্বিনিময়ে অপরের কাঞ্চন গ্রহণ করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান কর। তোমাদিগের ভিতরে কোন গুণ না থাকিলেও শুদ্ধ কেবল গলাবাজীর জোরেই তোমরা কেহ পরমধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতেছ, কেহ দেশ-হিতৈষী আখ্যা ধারণ করিতেছ, মহামূর্খ হইয়াও পণ্ডিত বলিয়া পূজিত হইতেছ, আয়ুর্ব্বেদানভিজ্ঞ হইয়াও ধন্বন্তরী বলিয়া আদৃত হইতেছ এবং নিজের ভবিষ্যদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়াও পরের জীবনের ভবিষ্যদ্ঘটনা স্পষ্টরূপে বিবৃত করিতেছ। গলাবাজীতে তোমাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। সংসারে যাহাদিগের গলার জোর নাই, তাহাদিগের প্রকৃত গুণ থাকিলেও তাহারা তোমাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইতে আরো নিম্নস্তরে পড়িয়া যাইতেছে। লোকের দৃষ্টি তাহাদিগের উপর আকৃষ্ট হইতেছে না। চিন্তেপাগলা তোমাদিগের গলাবাজীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইতেছে, তাহাকে গলাবাজীর কুহক হইতে মুক্তি প্রদান কর।

যাহারা সংসারে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা এই হাটের বালকগণের ন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত এবং ক্ষণিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর খেলনার সামগ্রী লইয়া উন্মত্ত। কিন্তু যখন সেই সমস্ত দ্র… উপভোগে বিষময় ফল উৎপাদন করে, তখন তাহাদিগের মনে পরিতাপ উপস্থিত হয় এবং তৎস… তৎসমূহের অসারতা উপলব্ধি হয়। তখন অনন্যো… পায় হইয়া রোগ-শোক-জর্জ্জরিত দেহে এবং অনুতাপ-তপ্ত হৃদয়ে কেবল হায় হায় করিয়া জীবন অতিবাহিত করে মাত্র।

হাটের মধ্যে বাজীকরের যেরূপ ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখিলাম, সংসারের মধ্যেও এরূপ বাজীকরের অপ্রতুল নাই। তোমার কিছু টাকা আছে, জানিতে পারিলেই তোমার নিকটে তাহারা অহরহঃ যাতায়াত করিতে থাকিবে এবং তোমার হাতে স্বর্গ আনিয়া দিতে প্রস্তুত হইবে। বলা বাহুল্য, এ সকল … তাহাদিগের বিলক্ষণ স্বার্থ আছে। যদি তুমি তাহাদিগের কথায় মুগ্ধ হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য কর, তাহা হইলে তুমি ধনেশ্বর না হইয়া যে পথের ভিখারী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হাটের ভিতর তোলা তুলিবার প্রথা যেমন প্রচলিত আছে, সংসার-হাটেও তোলা তুলিবার সেইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইনি ভূস্বামী, ইহাকে কর দাও,—ইনি যাজক, ইহার মর্য্যাদা রক্ষা কর,—ইনি সাধু, দ্বারে উপস্থিত, ইহাঁকে কিঞ্চিৎ দিয়া পূজা কর,—ইনি বারোয়ারির পাণ্ডা, ইনি তোমাদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া গ্রামে নৃত্য গীতাদির ব্যবস্থা করিবেন, ইহাঁর সম্মান রক্ষা কর ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রকারের যাচকগণ লোকের দ্বারে দ্বারে নিয়ত তোলা তুলিয়া বেড়াইতেছে। তোমার দিতে ইচ্ছা না থাকিলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই।

ভাই, তোমরা যখন হাট করিব বলিয়া ভবের হাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তখন চিন্তেপাগলার একটী কথা শুনিয়া রাখ, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। পাগলের কথা পাগলেরই শুনিবার যোগ্য বলিয়া উপহাস করিও না। তোমরা শুনিতে না চাহিলেও পাগল বলিতে ছাড়িবে না। পাগল যাহা বলিবে তাহা বলিবেই বলিবে, ইহাই পাগলের পাগলত্ব। এই ভবে আজি পর্য্যন্ত অনেক পাগল আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্তু কেহই পাগলামি করিতে ক্রটি করে নাই! তবে কি বলিতে চাও যে, যাহা সকলেই বলিয়াছে তাহা আবার নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা কি? ভাই, বল দেখি এই জগতে নূতন জিনিষ কি আছে? যাহা বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল তাহা ত আজিও রহিয়াছে—যে চাঁদামামাকে তোমার কত পুরুষ পূর্ব্বে দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিয়া ছিলেন, তুমিও আজি সেই চাঁদামামাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছ—তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ শয়ন ভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিতেন, তোমরাও ত আজি তাহাই করিতেছ—ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, তবে করিতেছ কেন? যদি ক্ষুধা পাইলেই আহার করিতে হইবে, নিদ্রা আসিলেই শয়ন করিতে হইবে, ইহা পুরাতন হইলেও কর্ত্তব্য মনে কর, তবে পাগলের দুইটা কথা নূতন না হইলেও শুনিতে ক্ষতি কি? দুইটা কথা শুনিতে বলিতেছি মাত্র, ইহাতে নূতন পুরাতনের কথা কেন? যে, সকল জিনিষকে নূতন ভাবে দেখিতে জানে—যে, সকল কথাকে নূতন ভাবে শুনিতে জানে, তাহার কাছে পুরাতন জিনিষও নূতন—নচেৎ কোন বস্তুই নূতন নয়। এই জগৎ অতি পুরাতন হইলেও নিত্য নূতন।

এই হাটের মধ্যে যতগুলি লোককে দেখিতেছ, ইহারা সকলেই স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইলেও পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। কারণ খরিদ্দার বিক্রেতার শরণাপন্ন এবং বিক্রেতারও খরিদ্দার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যখন সকলের সহিত সকলের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, কাহাকেও প্রতারণা করিয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইও না, তাহাতে অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। আর ভাবিয়া দেখ, যাহাদিগের সহিত অনেক কাল ধরিয়া একত্র বাস করিতে হইবে, তাহাদিগের সকলকেই আপনার লোক বলিয়া মনে করিতে হইবে। যদি আপনার লোককেই ঠকাইলাম, আপনার লোকের সঙ্গেই অসদ্ব্যবহার করিলাম, তাহা হইলে কাহাকে লইয়া সুখী হইব? জগতে কে আমাকে বিশ্বাস করিবে, কে আমার বিপদে সহায়তা করিবে,

কে আমাকে দুঃখের সময় শান্ত করিতে চেষ্টা করিবে, কে আমার সংশয়ে উপদেষ্টা হইবে? তাই বলি মনের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তিকে স্থান দিও না, অন্তরে বিদ্বেষানল প্রধূমিত করিয়া আপনি আপনাকে দগ্ধ করিও না। হৃদয়ের আবর্জ্জনা দূরীভূত করিলে হৃদয় বিস্তৃত হইবে। চিত্ত বিস্তার-লাভ করিলে সদ্‌গুণের বিকাশ হইবে, তখন ইহলোকেই স্বর্গসুখ অনুভূত হইবে। নচেৎ চিত্তকে যতই সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করিবে ততই সদ্‌গুণ সকলও অপসৃত হইতে আরম্ভ করিবে। সদ্‌গুণ সকল তিরোহিত হইলে মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। সংসার বিষময় হইয়া উঠিবে। চিন্তেপাগলা মানুষের সুখের দিন দেখিতে পাইবে না কি?

শ্রীউমাচবণ মিত্র।

কাশীধাম।

(২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর।)

মুক্তিমণ্ডপ।

মুক্তিমণ্ডপ—ইহা বিশ্বনাথ-মন্দিরের সমীপবর্ত্তী জ্ঞানবাপীসংলগ্ন প্রসিদ্ধ মণ্ডপগৃহ। ইহাকে নির্ব্বাণমণ্ডপ বলিয়াও অনেকে উল্লেখ করেন। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, ইহাই বিশ্বনাথের মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস নামক প্রাসাদের দক্ষিণস্থিত সভামণ্ডপ। সভামণ্ডপের অর্থ মূল মন্দিরের সংলগ্ন দালান, নাট্যমন্দির বা নাট্‌মন্দির। বোধ হয় পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বনাথমন্দির, অর্থাৎ অধুনা যাহা অওরঙ্গজেবমঙ্ক বলিয়া পরিচিত, এই মণ্ডপটী সেই প্রাচীন মন্দিরের দক্ষিণস্থিত নাট্য অথবা সভাগৃহে ছিল। এই স্থানটী কাশীপুরীর মধ্যে অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যময়। কথিত আছে, যে কেহ স্থিরচিত্তে পবিত্র হৃদয়ে ক্ষণমাত্রও এখানে উপবেশন করেন, তাঁহার শতবর্ষ যোগাভ্যাসের ফল হয়; যিনি একটীমাত্রও বেদমন্ত্র এখানে উচ্চারণ করেন, তাঁহার সমগ্র বেদ পাঠের অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং যে ভক্ত সাধক পূতচিত্তে বিশ্বনাথ মহাদেবের ষড়াক্ষর বীজ জপ করেন, তাঁহার কোটি রুদ্রজপসম পুণ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যোগী ঋষি সিদ্ধ সন্ন্যাসিগণ এই স্থানে বসিয়া নানা নিগূঢ় শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, বেদাদির শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন। কাশী-যাত্রীগণ এখনও এই স্থানে আসিয়াই প্রথমে সংকল্প করিয়া থাকেন।

তারকেশ্বর।

বিশ্বনাথমন্দিরের পূর্ব্বদিকে তারকেশ্বরের এক প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত। অন্তিমকালে এই তারকেশ্বরই প্রত্যেক কাশীবাসীকে তারকব্রহ্ম-মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। মণিকর্ণিকার সম্মুখেও আর একটী তারকেশ্বর মন্দির অবস্থিত আছে। এইটীই আদি তারকেশ্বর বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। অনেকে বলেন, মণিকর্ণিকা-ঘাটে একটী অন্তঃসলিলা প্রবাহ আছে, সেই হেতু শেষোক্ত তারকেশ্বরমন্দিরের কিয়দংশ ভূমিগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়, উর্দ্ধাংশ ক্রমেই বিকৃত হইতে থাকে। কাশীবাসী ভক্তমণ্ডলী তাহা দেখিয়া আশঙ্কিত হন ও সন ১৭৯০।৯১ খৃঃ অব্দে ঘাট হইতে কিঞ্চিৎ উপরে ও পূর্ব্ব মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ

...ক্ষিণে একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতেই ...রকেশ্বর-দেবকে স্থানান্তরিত করিয়া অভিষিক্ত ...রেন।

দণ্ডপাণি মহাদেব।

বর্ত্তমান বিশ্বনাথমন্দিরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে ... নাটমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় বা যাহার উপর ... যাইয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিতে হয়—তথায় এক ...লিঙ্গ আছেন। তিনি বৈকুণ্ঠনাথেশ্বর বলিয়া পরি...ত এবং তাঁহারই বামদিকে মন্দিরমধ্যে, যে মহাদেব ...তিষ্ঠিত তিনিই দণ্ডপাণিশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্ব...থ ...শনার্থী যাত্রীগণ যথাক্রমে এই সকল শিবদর্শন ...রিয়া প্রদক্ষিণ করেন।

...ণ্ঢিরাজ গণেশের সম্মুখ দিয়া বাহির হইলে দক্ষিণ ...কে অর্থাৎ অওরঙ্গজেব-মসজিদের দিকে যাইতে ...থে আর একটী দণ্ডপাণি দেখিতে পাওয়া যায়। ...নি দণ্ডপাণি-ভৈরব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অবিমুক্তেশ্বর।

...শ্বনাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়াই ...পার্শ্বে দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে একটী ... প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই অবিমুক্তে...র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই পার্শ্বে প্রত্যেক যাত্রী ...ক্ষণের জন্য একখানি পাথরের উপর বসিয়া ...চিত্তে নয়ন মুদিয়া শিব-চিন্তা করিয়া থাকেন। ...শীখণ্ডে লিখিত আছে:—দেবাদিদেব মহাদেব ...র অনুরোধে ও পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দারের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া কিয়দ্দিবসের জন্য তিনি সশক্তি কাশীপুরী পরিত্যাগ করিয়া মন্দারে অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহার পরম প্রীতিপ্রদ কাশীপুরী একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বা তাহার সংসর্গ বিমুক্ত হইয়া অন্যত্র গমন করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বর নিজেই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন। সেই কারণ ইঁহার নাম অবিমুক্তেশ্বর ও তখন হইতেই এই স্থানের নাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র। ইহার পূর্ব্বে জগতে আর কেহই শিবলিঙ্গের আকৃতি বা তাহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যাহা হউক এই অবিমুক্তেশ্বর জগতের আদি লিঙ্গ।

অপারনাথ।

পূর্ব্বোক্ত দণ্ডপাণি-ভৈরবের দক্ষিণ দিকে অপারনাথ মহাদেবের একটী বিস্তৃত মন্দির আছে। এটী একটী মঠের অনুরূপ। বহু সাধু সন্ন্যাসী সতত এখানে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করেন। প্রবাদ আছে, যখন দিল্লীপতি অওরঙ্গজেবের আদেশে সমস্ত কাশী বিধ্বস্ত হইতেছিল, সেই সময় অপারনাথকেও নষ্ট করিতে আসিলে, মন্দিরমধ্য হইতে সহসা এতাধিক ‘ভিমরুল’ বহির্গত হইতে লাগিল যে, কাহার সাধ্য তাহার মধ্যে অগ্রসর হয়! মন্দিরধ্বংসকারী যবনসৈন্যগণ বাধ্য হইয়া তখন সরিয়া গেল। অনন্তর স্বয়ং অওরঙ্গজেব বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সর্ব্বপ্রধান যবন-কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে আসিয়া স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়া ইহা বিনষ্ট করিতে বিরত হন ও স্মরণার্থ একটী প্রকাণ্ড ডঙ্কা

সেই মন্দির-দ্বারে রাখিয়া চলিয়া যান। সেই ডঙ্কা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক এত বড় ডঙ্কা আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার চর্ম্ম ফাটিয়া যাইলে সহসা ছাওয়াইবার উপায় নাই। বহু অনুসন্ধানে কোনও সুবৃহৎ উষ্ট্রের চর্ম্ম পাইলেই ইহা পুনরায় ছাওয়াইয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

মার্কণ্ডেশ।

অপারনাথের উত্তরদিকে মার্কণ্ডেশের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। পূর্ব্বে এখানে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কালে তাহা জীর্ণ হইরা যাইলে, মর্ম্মরপ্রস্তরে খোদিত একটী নূতন মার্কণ্ডেশ-প্রতিমূর্ত্তি এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাক্ষিবিনায়ক।

ঢুণ্ঢিরাজ হইয়া দশাশ্বমেধ যাইতে হইলে, সাক্ষি-বিনায়ক-পথের দক্ষিণ পার্শ্বে এই গণপতি মন্দির বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। সন ১৮২৭ সম্বতে বা ১৭৭০ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে একজন মহারাষ্ট্রীয় মহাত্মা কর্ত্তৃক এই মন্দিরটী পুনরায় সংস্কৃত বা নূতন করিয়াই বিনির্ম্মিত হইয়াছে। পঞ্চক্রোশী ও অন্যান্য যাত্রিগণ যাত্রার পর এই সাক্ষিবিনায়কের পূজা করিয়া থাকেন। অন্তিম-কালে ইনিই কাশীবাসীর সকল পাপ পুণ্যের পরিচয় বা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন।

কাশীকর্ব্বট।

কাশীকর্ব্বট, একটী অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ কূপ ইহা একটি মন্দিরের মধ্যে সযত্নে সুরক্ষিত, অ বিশ্বনাথের মন্দির হইতে পূর্ব্বদিকে কচুড়ির গলি যাইলেই নিকটে কাশীকর্ব্বটের ক্ষুদ্র দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই মধ্যে সেই কর্ব্বট কূপ এই স্থানের পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে তাহার মধ্যে লই যাইয়া কতকগুলি অসংলগ্ন সংস্কৃত মন্ত্রের স ও সময় সময় নানাপ্রকার ভয় ও উৎপীড়নদ্বা বহু অর্থদানের সঙ্কল্প করাইয়া লয়। ধর্ম্মপরায়ণ অন্ধবিশ্বাসী যাত্রির দল ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কাশীক্ষে মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া যথাসাধ্য সেই প্রতিশ্রুত অ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। কোন কোন প্রাচীন অধিবাসীর মুখে শুনা যায় যে, ৪০।৫০ বৎস পূর্ব্বে এই কর্ব্বটের পাণ্ডাগণ এমনই দুর্দ্দান্ত ছিল তখন ইহার মধ্যে বহু নিরীহ যাত্রীর জীবন-সং পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে, এই কর্ব্ব মধ্যে ডুব দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর তা পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই বিশ্বাসে অনেকে ইহা পড়িয়া ডুবিয়া মরিত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সক নৃশংস ব্যাপার অবগত হইয়া অধুনা উক্ত কূপের বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কেবল প্রতি সোমবারে এ বার করিয়া সেই মুখ খোলা হয়। এ পাণ্ডাদিগের নানাপ্রকার অত্যাচার দেখিয়া সরকা বাহাদুর সতত একজন পুলিশ-প্রহরী তথায় নি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিরীহ যাত্রীগণের ত নিস্তার নাই। কূপের মধ্যে কিয়দ্দূর নামিবার জ

একটী সোপান-শ্রেণী বর্ত্তমান আছে, তদবলম্বনে অবতরণ করিয়া নিম্নে একটী শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম কর্ব্বটেশ্বর মহাদেব। সকল যাত্রীই সেই শিবের পূজা করিতে যান। বহুদর্শী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, কর্ব্বটের যেস্থলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তাহাই কাশীপুরীর সুপ্রাচীন সমতল ভূমি বা ভূলক্ষেত্র। ক্রমে যুগ-যুগান্তরের মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি পতিত হইয়া কাশী-সহর এতাধিক উচ্চতা লাভ করিয়াছে। এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 'কর্ব্বট' এটী হিন্দী শব্দ, ইহার অর্থ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করা বা ভূলুণ্ঠিত হওয়া, সেই জন্য যাত্রিগণ এই স্থলে সাষ্টাঙ্গে পতিত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

কালভৈরব।

বিশ্বনাথের মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে কপালমোচন-তীর্থের সম্মুখে অথবা বেনারসের টেলিগ্রাফ আফিস ও টাউনহলের পশ্চাতে একটী গলির মধ্যে বিশ্বনাথ-পুরীর 'কোতোয়াল' কালভৈরবের প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির বহুদিন ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল, অনন্তর ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে পুনার বাজী রাও কর্ত্তৃক বর্ত্তমান আকারে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার গঠন-পারিপাট্য মন্দ নহে। দ্বারদেশে দুইটী দ্বারপাল-মূর্ত্তি ও প্রাচীরগাত্রে নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। মন্দিরের গৃহটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহারই একপার্শ্বে তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র-গর্ভ-গৃহমধ্যে প্রস্তরময় রজতানন চতুর্ভুজ ভৈরবনাথ বা কালভৈরব বিরাজিত। ইহাঁকে দর্শন করিলে, জীবের সকল পাপ দূর হয়। ইনি গাঢ় নীলবর্ণ ও সারমেয়বাহন। ইহাঁর অসীম প্রতাপ। ইনি কাশীরাজ্যের অধিবাসীবর্গের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। বিশ্বনাথ-আদেশে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ইনিই করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বিশ্বনাথ নিজ কোপাঙ্গ হইতে এক ভৈরব পুরুষের সৃষ্টি করেন, ইনিই সেই কালভৈরব। প্রত্যেক শিব-মন্দিরের সম্মুখে যেমন প্রস্তর-খোদিত বৃষ বা নন্দী দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরে প্রবেশ করিলেই বামদিকে সেইরূপ এক প্রস্তর-খোদিত প্রকাণ্ড সারমেয় বা কুক্কুর দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কালভৈরবের নিকট রাত্রি-জাগরণ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ভক্তি সহকারে কালভৈরবের পূজা করিয়া যে-কোনও কামনা করিলে অচিরে তাহা সিদ্ধ হয়। কথিত আছে, কাশীবাসাভিলাষী ভক্তগণকে প্রথম ছয় মাস কাল নানা বাধা বিঘ্ন ও অশেষ তাড়না সহ্য করিতে হয়। যিনি সেই সকল তাড়না সহ্য করিয়াও কোনরূপে একাগ্রচিত্তে ছয়মাসকাল অতিবাহিত করিতে পারেন, তিনিই জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্ব্বিঘ্নে কাশীবাস করিতে সমর্থ হন।

কাশীর দুর্গাবাড়ীতে যেমন অসংখ্য বানরের উপদ্রব, ভৈরবনাথের মন্দির-প্রাঙ্গনে সেইরূপ অসংখ্য কুক্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈরবানুচর বলিয়া যাত্রিগণ এই সকল কুক্কুরকে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য দিয়া থাকেন।

কালভৈরবের মন্দিরগাত্রে দশ-অবতারের চিত্র এবং মন্দির-চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে একটী শীতলার ক্ষুদ্র

মন্দির অবস্থিত। তাহার প্রাচীরগাত্রে সপ্তমাতৃকার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কালভৈরবের নিকটেই নবগ্রহ-দেবতার একটী প্রাচীন মন্দির আছে। ইহার মধ্যে আদিত্যাদি নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া এই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। যাত্রীরা সেই সময়েই সকলে দর্শন ও পূজাদি করিয়া থাকেন।

দণ্ডপাণি ও কালকূপ।

ইতিপূর্ব্বে দণ্ডপাণি-মহাদেব ও দণ্ডপাণি-ভৈরবের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে দণ্ডপাণি-বিনায়ক সম্বন্ধে বলিব।

কালভৈরবের মন্দিরের নিকটস্থিত একটী মন্দির মধ্যে কিঞ্চিদূন প্রায় ত্রিহস্ত পরিমিত বিনায়ক-মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার সকলে এই দণ্ডপাণির পূজা দিয়া থাকেন। ইনি 'কাশী-কোতোয়াল' কালভৈরবের সহচর ও সহকারী 'বরকন্দাজ' বলিয়া এখানে প্রসিদ্ধ। শিবের পরমভক্ত 'হরিকেশ' নামক জনৈক যক্ষ, বিশ্বনাথের কৃপায় এই দণ্ডপাণি বিনায়কের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামক দুইটী গণ ইহাঁর সহায়ক ও অনুগামী। কাশীবাসীর অন্তিম সময়ে ইনিই তাঁহাদের শিব-পরিচ্ছদ প্রদান করেন, অর্থাৎ গলে সুনীল রেখা, ভালে লোচন, হস্তে সর্পবলয়, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্রকলা ও বহনার্থ বৃষ প্রদান করেন্। ইনিই কাশীবাসীর প্রাণ, অন্ন, জ্ঞান, ও মোক্ষদাতা।

এই মন্দিরের সংলগ্নই প্রসিদ্ধ কালকূপ তীর্থ। এখানে মহাকাল ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। এই কূপের জলে স্নান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয় বলিয়া সকলের বিশ্বাস। কূপটী এমনই ভাবে প্রাচীর ও ছাদ দ্বারা আবৃত যে, ছাদস্থিত একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ঠিক দ্বিপ্রহর সময়ে সেই কূপমধ্যে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, সেই কূপস্থিত জলমধ্যে যে ব্যক্তি আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে না পায়, ছয়মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু অবধারিত। সেই কারণ অনেকেই নিজ নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ মধ্যাহ্নসময়ে কালকূপমধ্যে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিতে যান।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রস্তর-চিত্রণ।

(Art of Lithography.)

পেন্সিলদ্বারা প্রস্তরে চিত্র করিবার নিয়ম।

(Method of drawing on stone with chalk)

প্রস্তরচিত্রণের প্রথম অবস্থায় চিত্রকরগণের এইরূপ ধারণা ছিল যে, চিত্রের কৃষ্ণবর্ণযুক্ত অংশগুলি ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করিয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ না করিয়া একেবারে পেন্সিলের (Chalk) এক এক টানে অভিপ্রেত কৃষ্ণবর্ণ অঙ্কিত করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে সে ভ্রম দূর হইয়াছে। এক্ষণে রেখাসকল উপরে উপরে অঙ্কিত করিয়া চিত্রের কৃষ্ণবর্ণ স্থানগুলির অভীষ্ট বর্ণ অঙ্কিত করা হয়।

পেন্সিলের মোটা মুখদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিলে পেন্সিলের সূক্ষ্ম পরমাণু সকল গ্রেণ করা

Grained) প্রস্তরের উপরিভাগের সকল সূক্ষ্ম ...শ স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্ম মুখযুক্ত ...ন্সিলদ্বারা অঙ্কিত করিলে, প্রস্তরের ঐ সকল অংশ ...র্শ করাতে চিত্র অতিশয় সুন্দর ও পরিষ্কার হয়। ...ন্তু যদ্যপি বিশেষ পরিস্কার কৃষ্ণবর্ণের আবশ্যক না হয়, ...হা হইলে মোটা মুখ পেন্সিলদ্বারা চিত্র করিতে ...রা যায়। অতএব চিত্র-বিশেষে সূক্ষ্ম-মুখ বা স্থূল-...পেন্সিল ব্যবহার করা আবশ্যক।

প্রতিকৃতি, মুখ বা মনুষ্যদেহের অপর কোন ...শ চিত্র করিতে হইলে সূক্ষ্ম-মুখ-পেন্সিলের দ্বারা ...ত্র করা আবশ্যক। কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র, জামা ...ভৃতি দ্রব্য চিত্র করিতে হইলে মোটা-মুখ পেন্সিল ...বহার করা কর্ত্তব্য। উপরের বর্ণন দ্বারা ইহাই ...তীয়মান হয় যে, যে সকল চিত্রাংশ কোমল দৃশ্যযুক্ত ...হবে, তাহাদের চিত্র সূক্ষ্ম মুখ পেন্সিলদ্বারা অঙ্কিত ...রা আবশ্যক এবং যে সকল চিত্র কোমল-দৃশ্যযুক্ত ...হবে না, তাহাদের চিত্র স্থূলমুখ-পেন্সিলদ্বারা অঙ্কিত ...রিলে দোষাবহ হইবে না।

কখন কখন প্রস্তর এরূপ তৈলাক্ত (তেলাটে) ...য় যে, পুনঃপুনঃ পেন্সিল ব্যবহার করিয়াও ...ক ইচ্ছানুরূপ কৃষ্ণবর্ণ করা যায় না। এইরূপ ...হার দুইটী কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ—...র যদ্যপি ভিজা থাকে, দ্বিতীয় কারণ যদ্যপি প্রস্ত...র অতিশয় নিকটে নাসিকা রাখিয়া প্রস্তরে চিত্র ...রা হয়, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যদ্যপি—প্রস্তরকে ...ক্ত করা হয়। উপরোক্ত দুইটী কারণেরই প্রতি...র জন্য প্রস্তরে কিছুক্ষণ চিত্রকার্য্য বন্ধ করিয়া ...স্তরকে একটু উষ্ণস্থানে স্থাপন কর। কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যেন প্রস্তরকে প্রখর উত্তাপ দান করা না হয়। কারণ তাহা হইলে প্রস্তরের চিত্র দ্রবীভূত হইবে এবং ইহার ছাপা আদৌ সুন্দর হইবে না।

নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস হইতে প্রস্তরের চিত্রকে রক্ষা করিতে হইলে শিল্পী কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। ব্যক্তি-বিশেষের বা ব্যাধি-বিশেষে নাসিকা হইতে বহুপ্রকার স্রাব নির্গমন হইতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে যাহাতে ঐ সকল স্রাব প্রস্তরোপরে পতিত বা সংলগ্ন না হয়, তাহার জন্য প্রস্তরে কোনরূপ আচ্ছাদন বা নাসিকায় কোন প্রকার বস্ত্র বন্ধন প্রভৃতি দ্বারা প্রতিকার করা আবশ্যক।

চিত্র অর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ মধ্যমালোক (Half-tints) অঙ্কিত করিতে হইলে, পেন্সিল ধারণ করিবার বিশেষ প্রকরণ কিছু জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। অন্য সাধারণ চিত্রে যেরূপে পেন্সিল ধারণ করা হয়, এই চিত্রে সেরূপে পেন্সিল ধারণ করিলে চিত্রকার্য্য ভালরূপ হইবে না। এরূপ চিত্রে প্রস্তরের উপরিভাগে একটী ছড়ির উপর হস্ত রাখিয়া পেন্সিলের নিজের ভারে যে পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে, সেইরূপে পেন্সিল ধারণ করিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য পেন্সিল ৪• ইঞ্চি বা ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ করিলে কার্য্যকর হইতে পারিবে। পেন্সিলের মূলদেশ ধারণ করিয়া হস্তের অধিক বল প্রদান না করিয়া পেন্সিল ব্যবহার করিবে।

মেঘ প্রভৃতির দৃশ্য প্রস্তরে অঙ্কিত করিতে হইলে চিত্রের দুই পার্শ্বে মধ্যমালোক অর্দ্ধ-কৃষ্ণবর্ণ (Half-tints) করিয়া মধ্যস্থল অধিক কৃষ্ণবর্ণ করিতে হয়। এইরূপ চিত্র অধিক স্থানব্যাপী হইলে এক এক শ্রেণীর

সমান্তর রেখার পার্শ্বে অপর শ্রেণীর এইরূপ রেখা দ্বারা চিত্র সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই সকল রেখাশ্রেণী অঙ্কিত করিবার সময় দেখিতে হইবে, যেন তাহাদের মধ্যে ভেদ চিহ্ন দৃষ্ট না হয় অর্থাৎ এক শ্রেণীর রেখায় পার্শ্বে অপর শ্রেণীর রেখা এরূপভাবে অঙ্কিত করিতে হইবে, যাহাতে উভয় শ্রেণীর রেখা সকল পরে পরে যুক্ত হইলে যেন এক শ্রেণীর রেখা দেখায়। অধিক স্থান-ব্যাপী কৃষ্ণবর্ণ, ছায়া বা সেড্ অর্দ্ধকৃষ্ণবর্ণ মধ্যমালোক চিত্রাংশে সমান্তর রেখাসকলদ্বারা অঙ্কিত করিতে হয়। ইহা শিল্পিগণের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র পেন্সিল ঘর্ষণদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ছায়া বা অর্দ্ধকৃষ্ণবর্ণ মধ্যমা-লোকাংশ যেন অঙ্কিত করা না হয়।

প্রথম হইতে চিত্রকরদিগের একেবারে প্রস্তরে অর্দ্ধকৃষ্ণবর্ণের চিত্রসকল ইচ্ছামত কৃষ্ণবর্ণ করিয়া অঙ্কিত করা কিছু কঠিন হইবে। এ কারণ চিত্রের অভিপ্রেত কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা কিছু হালকা অর্থাৎ অর্দ্ধ-কৃষ্ণবর্ণ করিয়া চিত্র অঙ্কিত করা আবশ্যক। পরে আবশ্যক মত কিছু কিছু করিয়া অধিক কৃষ্ণবর্ণ করিতে হইবে।

সমান্তর রেখাসকলদ্বারা চিত্রের কোন কৃষ্ণবর্ণ ছায়াংশ অঙ্কিত করিতে হইলে, রেখাসকল এরূপভাবে অঙ্কিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা পরস্পর স্পর্শ না করে, অথচ তাহারা এরূপ নিকটে নিকটে অবস্থান করিবে যে, ছাপা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন বিকৃত বর্ণ দৃষ্ট না হয়।

এইরূপে অভিপ্রেত বর্ণের চিত্র প্রস্তরে অঙ্কিত হইলে পুনর্ব্বার কিছু কিছু দোষ সংশোধনার্থ পেন্সিল দ্বারা উক্ত চিত্রের উপরে ভিন্ন ভিন্ন পার্শ্ব হইতে আব-শ্যকমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া চিত্রকে সমাপ্ত করিতে হইবে। এইরূপে সংশোধন করিবার পরে যদ্যপি কিছু কিছু দোষ থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্ম মুখ পেন্সিল দ্বারা বিন্দু-চিত্র (stippling) করিয়া চিত্রকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইবে। এইরূপে বিন্দু চিত্রদ্বারা চিত্রের বর্ণ-বিন্যাসের ক্রম মিল (Variation in the tints) যথাক্রমে সংযোজিত হইলে ছাপায় অধিক দোষ দৃষ্ট হইবে না। অতি সূক্ষ্ম দোষ দেখি-বার জন্য চিত্রকর সময়ে সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিবে। দণ্ডায়মান হইয়া কিছুদূর হইতে চিত্রকে দেখিলে চিত্রের সূক্ষ্ম দোষসকল সহজে দৃষ্টিপথে পতিত হইবে।

যদ্যপি চিত্রের কোন স্থান অভিপ্রেত বর্ণ অপেক্ষা অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে সূচীর (Etching needle) দ্বারা চিত্রের কৃষ্ণবর্ণ অংশ সকল ঠুকরাইয়া সংশোধন করিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

আলোকচিত্রণ

বা

ফটোগ্রাফি শিক্ষা।—প্রথম ভাগ।

চতুর্থ সংস্করণ।

বর্দ্ধিতাকারে পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহাদের আবশ্যক এইবার পত্র লিখুন। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান্ আর্ট স্কুল, ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

The I. A. School, Calcutta

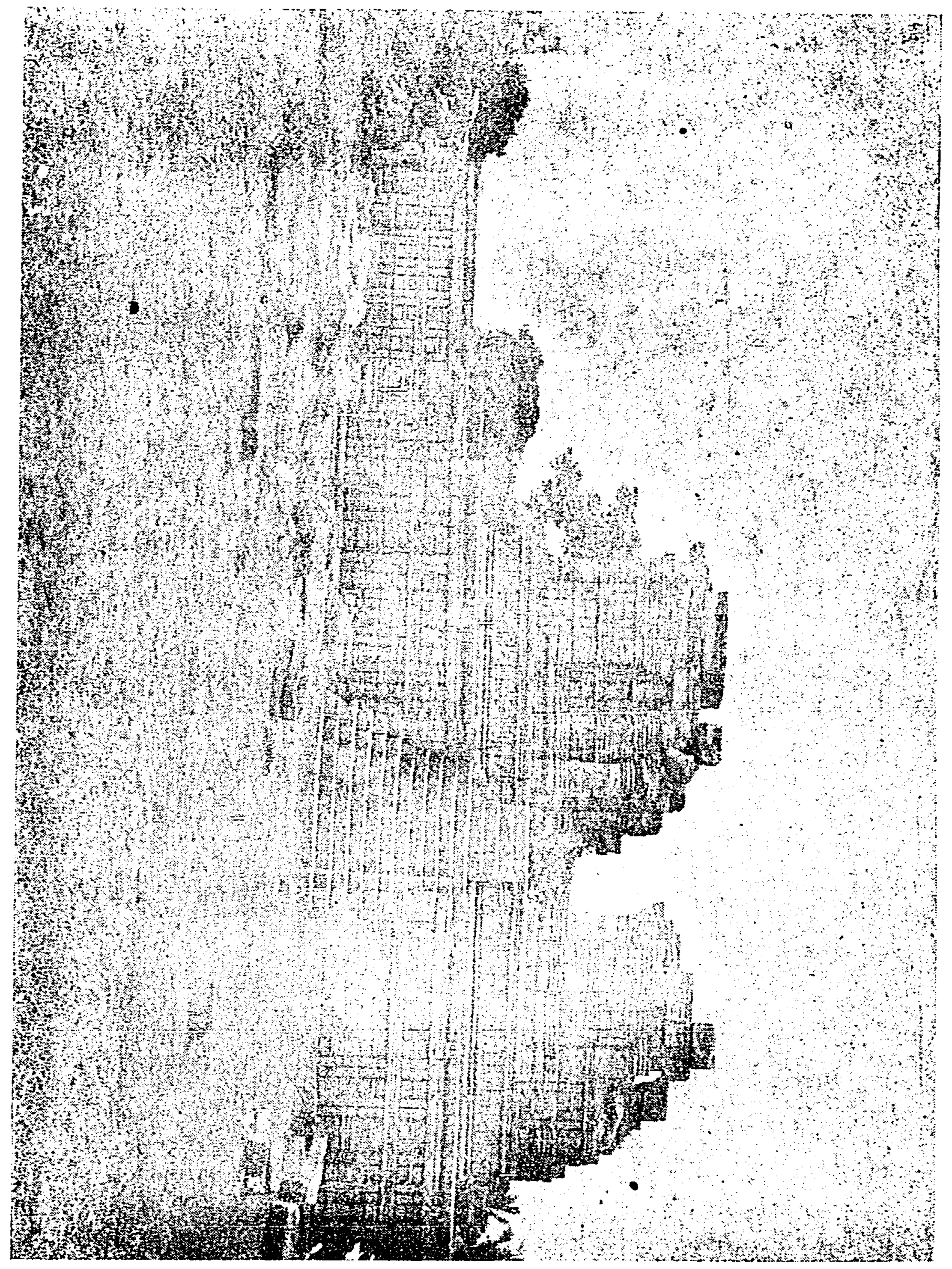

কোণার্কের জগমোহন।

কে তুমি।

কি গাহ, কে গাহ, তুমি, অন্তরে নিভৃত কোণে
নীরব নিনাদে সদা ; জাগরণে কি স্বপনে
মনে বাসি অনুকারি' তব নিত্য নব গান ;
সংসার মরুতে শুষ্ক কণ্ঠেতে ফোটে না তান ॥
সাধিতে সাধিতে তোরে আর কতকাল চলি
বড় তোরে ভালবাসি আমারে যেওনা ফেলি ॥

অমৃত কলসী কক্ষে, কে তুমি, মোহিনী, ঐ,
দে, লো, দে, পিপাসু আমি অমর হইয়ে রই ॥
জ্ঞানহারা হ'য়ে ছুটী, যেই তারে ধরি ধরি,
হাসিয়ে কুহক হাসি, মোহিনী পলায় সরি ॥
কত দূরে যাবি চল, যাব তোর পিছে পিছে,
আসিয়াছি বহুদূরে, ফিরে যাওয়া আরো মিছে ॥

পার্থিব তাড়নে যবে মোহ কাটি চক্ষু মেলি,
সঙ্গীরা গিয়েছে হেরি সুদূরে পশ্চাতে ফেলি ॥
ঘরে পরে নিন্দা গায় ; ক্ষিপ্ত বাণ অর্দ্ধপথে ॥
পারে কি বসিতে ফিরি পূর্ব্বমত ধনুকেতে
হৃদয় আবেগে ভুলি এবে কি বিলাপে ফল
বুভুক্ষায় পিপাসায় যতদূর পার চল ॥

সন্তাপ এসোনা মনে ; যদিও সময় গত
মরিয়ে জীবন পাবে পূর্ণ যদি মনোব্রত ॥
যদিও অদৃষ্ট-রজ্জু দুর্ণিবার আকর্ষণে
ক্রোশমাত্র অগ্রে গেলে যোজন পশ্চাতে আনে
যদিও রে পদে পদে আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে ;
জীবন রাখিতে দেহে বক্ষ ফাটি রক্ত ঝরে ॥
তবু যেন, হাস্যমুখি, যেন তোর দিব্য গান
শুনিতে শুনিতে মম দেহ হয় অবসান ॥

দেবশর্ম্মা।

কোণার্ক দর্শন।

(১২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর)

মন্দির দর্শন ও অভিমত।

আমরা কোণার্কে পৌছিয়া পাবলিক ওয়ার্কসের বাঙ্গালায় আসিয়া উঠিলাম। এই বাঙ্গালাটী মন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত। এখানে স্নান ও আহারাদি করিয়া বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার আশায় মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম—কোণার্কের ধ্বংসাবশেষ সমূহের দিকে তাকাইয়া আছে। প্রধান মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে, মাত্র অসমাংশ দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীতপ্রাধান্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন মিষ্টার ষ্টার্লিং কোণার্কে গিয়াছিলেন, তখন প্রধান মন্দিরের কতকাংশ বর্ত্তমান ছিল। তিনি তাহার উচ্চতা ১২০ ফুট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহার সম্মুখে জগমোহন (Audience Hall) অবস্থিত। এটীর প্রায় কোন অংশ ভগ্ন হয় নাই। সদাশয় গবর্ণমেন্ট এই প্রাচীন কীর্ত্তির অবশিষ্টাংশ রক্ষা করিবার সঙ্কল্পে এই মন্দিরটীর দরজা গাঁথিয়া দিয়া, উপর হইতে ছিদ্র করিয়া বালুকাদ্বারা মন্দিরটী পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। নচেৎ ইহাও যে প্রকার জীর্ণ অবস্থায় পরিণত, তাহাতে এতদিন এরূপভাবে থাকিত বলিয়া মনে হয় না। এই উভয় মন্দিরই একযোগে এক বিরাট রথাকারে নির্ম্মিত, ইহার পার্শ্বে ২৪ খানি চক্র ও সম্মুখে প্রস্তর

নির্ম্মিত কয়েকটী অশ্বমূর্ত্তি আছে। অশ্বগুলির অধিকাংশ একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহাদের সংখ্যা স্থিরীকরণের কোন উপায় নাই। প্রধান মন্দিরের ভগ্নাংশের ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য অধুনা ১টী সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা তদ্দ্বারা ভিতরে নামিয়া দেখিলাম—তথায় সিংহাসনাকারে পদ্মাঙ্কিত একটি বেদী এখনও ঠিক নূতন অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু তদুপরি কোন মূর্ত্তি নাই। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার পুস্তকে একস্থানে বলিয়াছেন যে, "সূর্য্য ও চন্দ্র-মূর্ত্তি যাহা কোণার্কের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া খ্যাত ছিল, সেই দুইটী মূর্ত্তি ১৬২৪ হইতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্য সময়ে রাজা নরসিংহ দেব পুরীতে লইয়া আসেন।" ঐ মূর্ত্তি দুইটী এক্ষণে জগন্নাথ-মন্দিরে চন্দ্রনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণ নামে খ্যাত। অনুমান হয় যে, পূর্ব্বোক্ত সূর্য্য মূর্ত্তিই প্রধান মন্দিরের এই বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবুলকাসেম প্রাচীর-বেষ্টিত মন্দিরে প্রবেশের জন্য তিনটী দ্বার ছিল বলিয়া গিয়াছেন. কিন্তু এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। তবে তিনি দ্বারের পার্শ্বে যে সমস্ত সিংহ, ঘোটক ও হস্তী-মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির কতক কতক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরে প্রবেশ করিবার প্রধান দ্বার খুব সম্ভব মন্দিরের সম্মুখভাগে পূর্ব্বদিকেই ছিল। মন্দিরের বেষ্টন (প্রাচীর) সম্বন্ধে মিষ্টার ষ্টার্লিং ঠিক আবুলকাসেমের মতের পোষণ করেন নাই। আবুলফজেল একটী প্রাচীরদ্বারা সমগ্র মন্দির বেষ্টিত বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ষ্টার্লিং বলিয়াছেন—"সমগ্র মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রথমতঃ একটী প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল, পরে ঐ বেষ্টনের মধ্যে আর একটী অল্পায়তন প্রাচীর ছিল, সেই দ্বিতীয় প্রাচীরের গাত্রে অশ্বদ্বার, হস্তীদ্বার ও সিংহদ্বার নামে তিনটী দ্বার ছিল। তাহার মধ্যে অশ্ব দ্বার দক্ষিণে ও হস্তীদ্বার উত্তরে।" দ্বারের মূর্ত্তিগুলির অবস্থানভূমি দেখিয়া, পরে আর একটী প্রাচীর ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কারণ মূর্ত্তিগুলি ও মন্দিরের মধ্যে যে বিস্তৃত স্থান পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে একটী প্রাচীর থাকা অসম্ভব নহে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র দ্বিতীয় প্রাচীরের কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "মূর্ত্তিগুলির অবস্থানভূমি জগমোহনের ঠিক প্রবেশদ্বারে; ইহাতে আর একটী দ্বিতীয় প্রাচীর ছিল বলিয়া অনুমান হয় না।" আমাদের মনে হয়, স্বর্গীয় মিত্রমহাশয় যে মূর্ত্তিগুলির কথা বলিয়াছেন, সেগুলি প্রাচীর সংলগ্ন দ্বারের পার্শ্বস্থ মূর্ত্তি নহে। তাঁহারা যে সময় কোণার্কে গিয়াছিলেন, সে সময় উহার অনেকাংশ বালুকাগর্ভে প্রোথিত ছিল। এক্ষণে ঐ সমস্ত অংশ মন্দির সংস্কারের সময় বাহির হইয়াছে। তাঁহারা বোধ হয়, এই সকল মূর্ত্তি তখন দেখিতেই পান নাই। ষ্টার্লিং সাহেব সিংহদ্বার কোন দিকে ছিল, তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। সম্ভবতঃ ঐ দ্বার পূর্ব্বদিকেই ছিল। সমগ্র মন্দিরের অন্তঃপ্রাঙ্গন দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৫০ ফুট ও প্রস্থে ৫০০ হইতে ৫৫০ ফুট।

পূর্ব্বে জগমোহনের সম্পূর্ণ অংশের স্থিতির বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্দিরটী সমচতুষ্কোণ, ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬৬ ফুট। ইহার

জগমোহন।

প্রত্যেক পার্শ্বে দুইটী করিয়া বহির্দ্বার আছে। ইহাতে এখানকার জগমোহন পুরীর জগমোহন হইতে কিছু বিভিন্ন প্রকারের বলিয়া বোধ হয়। কারণ পুরীর জগমোহন দেখিলে ঠিক সমচতুষ্কোণ বলিয়া বোধ হয় না। এই মন্দিরটীর পোঁতা bermএর আকারে প্রস্তুত ও ১০।১২ ফুট উচ্চ এবং তাহাতে নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরের কার্ণিষগুলি সমতল এবং দেওয়ালের গাত্র হইতে ৬।৭ ফুট বাহির হইয়া আছে। ঐগুলি অত্যন্ত পাতলা প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দেওয়ালের উপর মাত্র উহারই অবলম্বনে শোয়ান আছে। কার্ণিষগুলির বাহিরের দিকে জন্তু মূর্ত্তি খোদিত এবং উহা শলাকার ন্যায় সুন্দর ভাবে খোদিত শিখা দ্বারা অলঙ্কৃত। এই মন্দিরের ছাদ কার্ণিষের উপর হইতে পিরামিডের আকারে প্রস্তুত। ঐ ছাদের গাত্রে কয়েকটী স্তর আছে, উহার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে ৬টী করিয়া এবং তৃতীয় স্তরে ৫টী সোপানাকারে গ্রথিত ধাপ আছে। উহাতে যেখানে ধাপগুলি শেষ হইয়াছে, সেইস্থানে কতকগুলি ভাবপ্রবণ অতীব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি ও অন্যান্য সিংহ, হস্তী, হাঁস এবং সৈন্যমূর্ত্তি ও নানাবিধ কারুকার্য্য খোদিত আছে। এই মন্দিরগাত্রে কতকগুলি অশ্লীল মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরগাত্রের পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব ও গঠন-প্রণালী অতি উচ্চ আদর্শের এবং ঐগুলি শারীরতত্ত্বের (Anatomy) সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া প্রস্তুত। ঐগুলি দেখিলে, তখনকার শিল্পীরা প্রকৃতি-দৃষ্টে এই সমস্ত কার্য্য করিত বলিয়া বোধ হয় এবং সেই জন্যই হয়ত তাহারা ঐ সমস্ত অশ্লীল চিত্র মন্দিরগাত্রে খোদিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। মন্দিরগাত্রে খোদিত হস্তীগুলির মধ্যে কতকগুলি জীবিত অবস্থায় হস্তীরা যেরূপভাবে চলে সেইভাবে ও অপর কতকগুলি জীবদ্দশায় তাহারা যেরূপভাবে উপবেশন করে তদ্রূপভাবে প্রস্তুত। কতকগুলির কান খুব বড় এবং তাহাদের মুখ আধুনিক হিন্দু ভাস্কর্য্যের অনুরূপে প্রস্তুত। সিংহগুলি শিল্পীর মনোমত ভাবে প্রস্তুত বলিয়া অনুমান হয়। এই মন্দিরের পার্শ্বস্থ ভূমিতে ১৬।১৭ হাত লম্বা একটী লৌহের কড়ি পড়িয়া আছে। ঐটী দেখিলে এবং উড়িষ্যার পঞ্চম শতাব্দীর অন্যান্য স্থাপত্যবিদ্যা দেখিলে মনে হয়, সে সময়ে হিন্দুরা লৌহের কার্য্যেও খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান প্রবেশদ্বার পূর্ব্বমুখ। নীলাচলের প্রস্তরে নির্ম্মিত নানাপ্রকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট দ্বারের সৌন্দর্য্য এখনও সময়ের শক্রতাকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। হাণ্টার সাহেবের পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়—যে, ইহারই উপরে নবগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ মূর্ত্তি মন্দিরের সীমার বাহিরে প্রায় অর্দ্ধপোয়া রাস্তা দূরে প্রান্তরমধ্যে অবস্থান করিতেছে। মিঃ ষ্টার্লিং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরগাত্রের প্রতিমূর্ত্তির হস্তস্থিত বাদ্যযন্ত্র সেতার, নাগরা ও করতাল দেখিয়া তখনকার প্রচলিত ঐসমস্ত নামধেয় বাদ্যযন্ত্রের অনুরূপ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও এতদিন পরে যাইয়া ঐগুলিকে এখনকার বাদ্যযন্ত্রের অনুরূপই দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন মন্দিরের গাত্রে অনেকগুলি অরুণ-সারথি-বিশিষ্ট সপ্তাশ্বযুক্ত সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ইহার শিল্পীর প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রমে প্রস্তুত কারুকার্য্যাবলী দেখিলে মনে হয় যে, প্রধান মন্দিরের সৌন্দর্য্য কতই না অধিক ছিল।

কোণার্ক-নির্ম্মাতা এখানে তিনটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে দুটি মন্দিরের

পরিচয় দিয়াছি। অবশিষ্ট তৃতীয় সংখ্যক মন্দিরটীই "ভোগমণ্ডপ" (Hall of offerings) নামে খ্যাত। জগমোহনের সম্মুখভাগে এই মন্দিরটী অবস্থিত। এতদুভয়ের মধ্যস্থলে যে ভূমিখণ্ড পড়িয়া আছে, তাহার উপরে অনায়াসে আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন যে, "কোণার্কনির্ম্মাতা প্রধান মন্দির ও জগমোহন পর পর করিয়া' নাচঘর প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে, জগমোহনের সম্মুখের ভূমিখণ্ড ছাড়িয়া ভোগমণ্ডপটী কিছুদূরে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভোগমণ্ডপটী দূরে হওয়ায় বোধ হয় মন্দিরটী ইহার নামের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। সম্ভবতঃ এটী প্রথমে নাচঘর অথবা পুরীর ন্যায় মুক্তিমণ্ডপের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছিল; যদিও সাধারণতঃ মুক্তিমণ্ডপ প্রায়ই খোলা হয়, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিক আবৃত ছিল। পাঠক! কোণার্ক-চিত্রে বর্ত্তমান মন্দিরটীর সম্মুখভাগে যে ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইতেছেন উহাই সেই ভোগমণ্ডপ। গবর্ণমেণ্ট, মন্দিরসংস্কারকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি এখানে আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি; বর্ম্মাবৃত বক্ষঃ, হাস্য-বদন, অরুণ-সারথি ও সপ্তাশ্বযুক্ত সূর্য্যমূর্ত্তি এবং অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐগুলি দেখিলে এখানকার শিল্পীরা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়। প্রধান দ্বার দিয়া এই ভোগমণ্ডপে প্রবেশ করিলে, দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত "একটী রাজমূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিত রাজা ও মহিষী গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়াইয়া আছেন, ব্রাহ্মণেরা হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছে, মূর্ত্তিটী এইভাবে প্রস্তুত। অনুমান হয়, ইহাই মন্দিরনির্ম্মাতা লাঙ্গুলীয় নরপতি নরসিংহ দেব ও তাঁহার মহিষীর মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ সূর্য্য উপাসক, তাঁহাদের উপাস্য দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়ায়, তাঁহারা আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই ভোগমণ্ডপের সম্মুখেই পূর্ব্বদিক। ঐস্থানে প্রধান দ্বার ছিল—ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রস্তরাবৃত থাকায় ঐ দ্বারের বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্তঃপ্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। হাণ্টার সাহেব, প্রাচীরের প্রস্তরগুলি মহারাষ্ট্রীয়েরা পুরীতে লইয়া গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উহার দুই একখানি Battlementএর আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড দেখিলে মনে হয় যে, উহা প্রাকারে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অনুমানের সত্যাসত্য একমাত্র অখণ্ড-দণ্ডায়মান কালই স্থির করিতে সমর্থ।

কুম্ভ প্রস্তর।

গ্রামবাসীদের প্রমুখাৎ এখানে একটী কুম্ভপ্রস্তরের কথা শুনা যায়। তাহারা বলে প্রবাদ আছে যে, "কোণার্কের প্রধান মন্দিরের উপরে একটী বৃহৎ কুম্ভপ্রস্তর (Loadstone) বসান ছিল। ঐ প্রস্তরটী মন্দিরের উপর থাকাতে সে সময় গমনশীল জাহাজগুলি উহার আকর্ষণে তীরে আনীত হইত ও ভাঙ্গিয়া যাইত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে মোগলশাসন সময়ে একখানি পোতের কতকগুলি লোক কিছু দূরে তীরে অবতরণ করিয়া লুক্কায়িতভাবে

...রে ধারে আসিয়া মন্দির আক্রমণ করে ও ঐ ...থর লইয়া চলিয়া যায়। অনার্য্যেরা মন্দির স্পর্শ ...রায় মন্দির কলুষিত জ্ঞানে পুরোহিতেরা দেবমূর্ত্তি ...ইয়া এখান হইতে পুরীতে প্রস্থান করে।" মান্দলা ...জি বা উড়িষ্যার অন্য কোন ইতিহাসে আমরা এই ...ম্ভ-প্রস্তরের উল্লেখ দেখিতে পাই নাই; সুতরাং ...ই প্রবাদ-মূলক গল্পটীর উপরে আমাদের আস্থা ...য় না।

উপসংহার।

এই অতীতস্মৃতি দর্শনে মনে হয়, একদিন এই ...ক্ষেত্রে ভগবান বিভাবসুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দেশ-দেশান্তর হইতে কত বহুযাত্রীর সমাগম হইত, কত শত শত কুষ্ঠরোগী আরোগ্য ...মনায় এখানে আগমন করিত, নানাবিধ পর্ব্ব উপ...ক্ষে এই মন্দিরে কত উৎসবাদি হইত। কিন্তু হায়! কালবশে সেই মন্দির আজি শ্মশানে পরিণত, জনসমা...ম শূন্য। এক্ষণে সে সমস্ত উৎসবাদিও নাই। মাত্র ...বৎসরে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে একটী মেলা ...হইয়া থাকে; ঐ সময়ে লোকসমাগমে পূর্ব্ব সমা...রোহের কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র পরিলক্ষিত হয়।

এইরূপ মনোরম দৃশ্য দেখিলে, অতীতস্মৃতি ...পনা হইতে মনোমন্দিরে উদিত হয়; অতীত-...তিতে হৃদয় আকুল হয়। তখন অতীতের ...ত কথা মনে পড়ে, কত অতীত ঘটনার দৃশ্য ...সীরা-পাতের ন্যায় মানস-নেত্রের সম্মুখ দিয়া ...সারিত হইতে আরম্ভ হয়। কত মধুর ভাবস্রোতে ...দয় পরিপূর্ণ হয়। অতীতের সে মধুর বর্ণনার শক্তি আমাদের নাই। কালিদাসের ন্যায় যদি কোন মহাকবি তাঁহার বিশ্বব্যাপী হৃদয় লইয়া এই প্রকার মনোভিরাম স্থানে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনিই ইহার বর্ত্তমান ধ্বংশাবশিষ্ট রমণীয়তার সহিত অতীত সৌন্দর্য্যের স্মৃতি মিশ্রিত করিয়া বিশ্ববিমোহন চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন।

আমরা সংক্ষেপে কোণার্কের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও প্রবাদমূলক বিবরণ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম। যদিও আমরা এই মন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তথাপি নিম্নলিখিত পুস্তক কয়খানি * হইতে এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। একারণ ঐ সকল পুস্তকের রচয়িতা পূর্ব্বসূরিদিগের নিকট যথেষ্ট ঋণী। তাঁহারা বাক্যরূপ দ্বার করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আজ "মণৌ-বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।"

প্রকৃতির লীলানিকেতন উড়িষ্যায় ভ্রমণ করিলে এখনও তাহার অতীত গৌরবের অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কালের নির্ম্মম হস্তে যদিও ইহার অধিকাংশ গৌরবচিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, তথাপি আজিও যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অতীতের অনেক মনোমুগ্ধকর ছবি মানস-নেত্রে প্রতিভাত হয়।

অবশেষে আমরা সন্ধ্যাসমাগমে হিন্দু গৌরবের

* Gladwin's "Ain-i-Akbari."
W. W. Hunter's "Orissa."
Rajendra Lall Mittra's "Antiquities of Orissa."
Temple Annals—(মান্দলা পাঁজি।)
Fergusson's Researches

শ্মশানক্ষেত্রসম অর্কক্ষেত্রের নিকট বিদায় লইয়া গুরু-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরদিবস প্রাতে পুরীতে আসিয়া পৌছিলাম।

কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।

বর্ণ-চিত্রণ।

অষ্টম অধ্যায়।

(পৃষ্টায় প্রকাশিতাংশের পব)

বর্ণ-চিত্রের বিভিন্ন বিভাগ।

পূর্ব্বে সাধারণ চিত্রের যেমন সপ্তদশবিধ বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ 'বর্ণচিত্রণ' বলিলে রঞ্জিত চিত্রের এক সাধারণ অর্থই বুঝা যায়। সেই কারণ ইহার অন্তর্গত যে কয়েকটী প্রধান বিভাগ আছে, তাহাই এক্ষণে শিক্ষার্থির অবগতির জন্য নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

১ম। তৈলচিত্র বা 'অয়েলপেণ্টিং' (Oil Painting,) ; ২য়। মর্ম্মর চিত্র বা মোজেইক পেন্টিং (Mosaic Painting), ; ৩য়। ভিত্তিচিত্র ফ্রেস্কোপেণ্টিং (Fresco Painting), ৪র্থ। ক্রেয়ন পেন্টিং (Crayon Painting), ৫ম। অনুচিত্র মিনিয়েচার পেন্টিং (Miniatur Painting) ৬ষ্ঠ। মিনাচিত্র এনামেল বা পেন্টিং (Enamel Painting) ৭ম। মোম চিত্র Wax or Encastic Painting ৮ম। কাচচিত্র (Painting on glass), ৯ম। জল চিত্র (Water or Water colour Painting) ১০ম। সঙ্কর চিত্র বা এলিডোরিক পেণ্টিং (Eledoric Painting) এতদ্ব্যতীত বর্ণ চিত্রের আরও নানাবিধ বিভাগ হইতে পারে তবে এইগুলি প্রশস্ত।

তৈলচিত্র বা অয়েল পেন্টিং।—ইহাই বর্ণচিত্রণের শ্রেষ্ঠ প্রকরণ। ইহার স্থায়িত্ব ও বর্ণ-সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও উত্তম। এতদ্বিষয়েই পরে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা যাইবে, সুতরাং এস্থলে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

মর্ম্মর চিত্র বা মোজেইক পেণ্টিং।—ইহা বিভিন্ন বর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তর নানা আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া কোন দ্রব্যের অনুরূপে চূণ-সুরকিজাত মশলার সাহায্যে চিত্রবৎ সজ্জিত করণের নাম মর্ম্মর চিত্র। ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল, পরে পারস্যবাসিরা ইহার যথেষ্ট উন্নতি করেন। তদনন্তর ইতালীয়গণও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ইহার ঔৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই মর্ম্মর প্রস্তরজাত চিত্রের অনুকরণে কাগজ বা তদনুরূপ কোন সমতলক্ষেত্রের উপর অঙ্কিত বর্ণচিত্রকেও এক্ষণে মর্ম্মরচিত্র বলিয়া অনেকে ব্যাখ্যা করেন। প্রসিদ্ধ রোম নগরের সেণ্টপিটারচর্চ্চের মধ্যে ইহার অতি সুন্দর আদর্শ বর্ত্তমান আছে। ভারতে আগরা ও জয়পুর আদি স্থানে এই শিল্পের এখনও প্রচার ও আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিত্তিচিত্র।—গৃহভিত্তিতে নানাবর্ণ-সম্পাতে চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। প্রাচীন মন্দির ও গুহাভ্যন্তরে এইরূপ চিত্রের প্রচলন চিরকালই আছে। ইলোরা অজন্তা আদি বহুপ্রাচীন গুহার মধ্যেও যেরূপ ইহার প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতীচ্য প্রদেশমধ্যেও ইহার সেইরূপ বহুল প্রচার ও উন্নতির পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যায়। মোসলমান-আধিপত্য সময়েও যে ইহার প্রচলন বন্ধ ছিল না, তাহা আগ্রা, দিল্লী, ফতেপুর, শিকরি প্রভৃতি স্থানের মোসলমান নরপতিগণ নির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই শিল্প অনাদিকাল হইতে জগতের সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে।

ক্রেয়ন পেন্টিং।—নানাবিধবর্ণ সামান্য গঁদের জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ছোট ছোট পেন্সিলের আকারে প্রস্তুত করতঃ কাগজ বা পার্চমেণ্টের উপর চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়। বাজারে এইরূপ ক্রেয়ন কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা অঙ্কিত চিত্রও অতি সুন্দর দেখায়। ইহার আর একটী নাম প্যাষ্টল পেন্টিং।

অনুচিত্র, মিনিয়েচার পেন্টিং।—এটী আমাদের ভারতবর্ষের নিজস্ব শিল্প বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও কাশী, দিল্লী ও জয়পুরের মধ্যে ইহার যথেষ্ট প্রচলন আছে। পাশ্চাত্য শিল্পসমালোচকগণ এখনও ভারতের এই শিল্পের যথেষ্ট আদর ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। হস্তিদন্তের উপর, কাচের উপর, যন্ত্রের উপর বা কাগজের উপর এই চিত্র অতি ক্ষুদ্রাকারে চিত্রিত হয়। ইহার কার্য্যপ্রণালী অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নয়ন-মন-তৃপ্তিকর।

মিনাচিত্র।—ইহাও ভারতের অতি প্রাচীন শিল্প, পারস্য প্রভৃতি স্থানেও এক সময় ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ইহা স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর উপর নানাবিধ আকরিক বর্ণের সাহায্যে অগ্নিসন্তাপে চিত্রিত করিতে হয়। অনেক গহনা ও ঘড়ির কেস্ ইত্যাদির উপর এইরূপ মিনার কাজ এখনও দেখা যায়।

মোমচিত্র।—তৈলচিত্র বা জলচিত্রের ন্যায় নানাবিধ বর্ণ মোম ও বার্ণিষসহযোগে চিত্রিত হয়। ভাস্করশিল্পীরা ভাস্কর-প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গরাগ করিবার জন্য এই বর্ণের দ্বারা চিত্রিত করিয়া থাকে।

কাচচিত্র।— কাচের পশ্চাৎদিকে নানাবর্ণ সাহায্যে চিত্রিত করিতে হয়। আমাদিগের দেশে সাধারণ পটুয়াগণ এইরূপ চিত্র বিস্তর প্রস্তুত করিয়া হাটে বিক্রয় করিয়া থাকে। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে এই শিল্পের বহুল প্রচলন আছে। পাশ্চাত্য প্রদেশে এই জাতীয় চিত্রকে ক্রিষ্টালিয়ন পেণ্টিং (Cristalion Painting) বলিয়া উল্লেখ করে এবং সে দেশে ইহার যথেষ্ট আদর আছে।

জলচিত্র।—ইহা তৈলচিত্রের পরেই বা বর্ণ-চিত্রের দ্বিতীয় স্থানাভিষিক্ত বলিয়া ইহার যথেষ্ট সম্মান ও আদর আছে। তৈলচিত্রণের প্রক্রিয়ার সহিত ইহার প্রভেদ অতি সামান্য, কেবল তৈলের পরিবর্ত্তে জলের সহিত ইহার বর্ণ মিলিত করিয়া চিত্রিত করিতে হয়। সুতরাং স্বতন্ত্র করিয়া ইহার ব্যবহার প্রণালী বলিবার আবশ্যক নাই। তৈলচিত্রণের বিষয়-প্রসঙ্গেই ইহার উল্লেখ করিতে যত্ন করিব।

সঙ্করচিত্র বা এলিডোরিক পেন্টিং।—ইহার বর্ণ, তৈল ও জলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। আলোকচিত্রকরগণের তলপৃষ্ঠ বা ব্যাকগ্রাউণ্ড (Back ground) এই প্রথায় চিত্রিত হইয়া থাকে। এই নয়নতৃপ্তিকর দশবিধ বর্ণচিত্রণেরই বিস্তৃত কার্য্য-প্রণালী বর্ণনা করা এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, বিশেষ, তাহা এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপরও নহে। সেই কারণ সকল প্রকার বর্ণচিত্রণের সার ও শ্রেষ্ঠ প্রণালী

তৈলচিত্রণ প্রথাই শিক্ষার্থিগণের অবগতির জন্য এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। আশা করি—শিক্ষার্থিগণ মনোযোগ সহকারে ইহার অনুশীলন করিবেন।

নবম অধ্যায়।

তৈলচিত্রণ প্রণালী।

(The Art of Oil-Painting)

পূর্ব্বে বলিয়াছি তৈলচিত্রণই সমগ্র আলেখ্য-চিত্রণ-মধ্যে উৎকৃষ্টতম প্রকরণ। সভ্যতার অঙ্গরূপে ইহা সর্ব্বত্র এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, অধুনা এতদ্ সম্বন্ধে বিশেষত্ব দর্শাইবার কিছুই নাই বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ইহা স্থায়িত্বে ও মনোহারিত্বে সকল সভ্য জাতিকেই যেন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শিল্পির সিদ্ধ-তুলিকা এই তৈল-পেষিত বর্ণ-সহযোগে যেরূপ সহজে পরিচালিত হয়, সেরূপ অন্য কোন বর্ণেই যে পরিলক্ষিত হয় না, তাহা নূতন শিক্ষার্থিগণও অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারে। তৈলবর্ণের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, অন্যান্য বর্ণের ন্যায় ইহা বিলেপন মাত্রেই শুষ্ক হইয়া যায় না। সেই কারণ শিল্পী অতি সহজে তাহার ইচ্ছানুসারে আলেখ্যে যে কোন বর্ণের পরিবর্ত্তন, পরিমিশ্রণ ও সংশোধনদ্বারা ধীরে ধীরে স্ব স্ব চিত্র সুসম্পন্ন করিতে পারেন। বাস্তবিক তৈলবর্ণে বর্ণাবলীর অতি সুন্দর ক্রমমিল (Harmoney) সম্পন্ন হয় বলিয়াই চিত্রে সেই নয়নানন্দকর অতি কোমলভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়া থাকে। সেই কারণেই ইহা চিত্র-কলার অধীশ্বর বলিয়া এত সম্মানার্হ। যাহাহউক পাশ্চাত্য শিল্পিকুলই এক্ষণে জগতে ইহার শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও উপদেষ্টা, কিন্তু বহুপ্রাচীন সময় হইতেই তাঁহারা এ বিষয়ে আদৌ অভিজ্ঞ ছিলেন না, তৃতীয় অধ্যায়ে সে বিষয়ের কতক কতক উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও বলেন, বিগত চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে ইহার প্রথম আবিষ্কার হয়। তখন সমস্ত বর্ণ জলের পরিবর্ত্তে তৈলদ্বারা পেষণ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। প্রথম প্রথম নানাবিধ তৈল ইহাতে ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে পাপি অয়েল, নাট অয়েল ও লিনসিড্ অয়েলই ইহার জন্য প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই তৈলমিলিত বর্ণে কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বোর্ড বা কাষ্ঠফলক, পরে তাম্রফলক ব্যবহৃত হইত, অনন্তর বহুদিনের পরীক্ষান্তে লিনেন বা ছালটির কাপড়ের উপর জমি করিয়া তাহাতেই তৈলচিত্র বিন্যাস করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। এই জমি বা আস্তর করাকে ইংরাজি ভাষায় প্রিমিং (Priming) বলে; অর্থাৎ ফলক বা বস্ত্রখণ্ডের উপর মণ্ড বিলেপনাদি দ্বারা চিত্রোপযোগী মসৃণ স্তর প্রস্তুতকরণ। পাশ্চাত্য প্রদেশে পঞ্চদশ শতাব্দিতে এই আস্তরকরণ-প্রথা আবিষ্কৃত ও পরিগৃহীত হইলেও প্রাচ্য শিল্পিকুল পুরাকাল হইতেই ইহার ব্যবহার জানিতেন; সে কথা তৃতীয় অধ্যায়ে (৭ম বর্ষের শিল্প ও সাহিত্যে ২২৭-২৮ পৃষ্ঠায়) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই 'ধৌতোঘট্টিতশ্চ লাক্ষতোরঞ্জিতঃপটঃ।' প্রভৃতি বেদান্ত দর্শনের শ্লোকসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, তৈলচিত্রণ ভারতেরই আদি কলাসম্পদ, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাদির

য় ইহাও অধুনা পাশ্চাত্য গুরুর নিকটেই আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইতেছে। আনন্দের কথা কেহ কেহ এই বিষয় যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রথায় অভ্যাস করিবারও অবসর পাইয়াছেন, আশা করা যায়, কালে আমাদিগের সেই প্রাচীন পৈতৃক সম্পত্তির পুনরায় উদ্ধার হইবে, পুনরায় ইহা ভারতের সেই চতুঃষষ্টীকলার অন্তর্গত হইবে, কিন্তু তাহা কতকগুলি অপুষ্ট ও অপকৃষ্ট হীন চিত্র যাহা ভারতের অতি দুঃসময়ে কতিপয় নিরক্ষর হেয় পটুয়া কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহারই অন্ধ অনুকরণদ্বারা সিদ্ধ হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক প্রথায় ইহার অভ্যাস করিতে হইবে। বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইহা কখনও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বা (Oriental, Occidental) 'ওরিএন্টাল-অক্‌সিডেণ্টেল' ভেদে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। যে পার্শ্বে আলোক তাহার বিপরীতে ছায়া, কেহ কখনই ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পরেন না, দিবসের আলোক-জ্যোতিঃ, নিশার তামস; দেহতত্ত্ব ও আস্যরেখায় চিত্তবৃত্তির বিকাশ, নিকটবর্ত্তী বস্তু অপেক্ষা দূরস্থিত দ্রব্যের ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রানুভূতি; সূর্য্যালোক ও দীপালোকের বিভিন্নতা প্রভৃতি সকল তত্ত্বই সর্ব্বত্র সমান। এখন ইহার পরিবর্ত্তন করা বুঝি বিশ্বশ্রষ্টারও সাধ্যাতীত। শিক্ষার দোষে বা অনুভূতির অভাবে, কেহ যদি এরূপ প্রকৃতিদুষ্ট অপকর্ম্ম করে, তবে তাহা ক্ষমার্হ হইতে পারে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বা নিজ 'জেদ্' মাত্র বজায় রাখিবার ইচ্ছায়, প্রকৃততত্ত্বের আত্মকৃত্য করিলে, কোন্ সহৃদয়ের চিত্ত না ব্যথিত হয়? তাহাই বলিতেছিলাম বৈজ্ঞানিক বিধিসঙ্গত ভাবেই ইহার শিক্ষা করা বিধেয়। আমাদিগের আদিম প্রাচ্যশিল্পিকর-প্রসূত কোন সুপ্রাচীন চিত্রশিল্পের আদর্শ বিদ্যমান নাই, তবে সেই শিল্পঋষি ভরতের চিত্রপট-কল্পনা, অমর-কবি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতির অক্ষয় লেখনিমুখে তাহার যে সকল সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে, তাহা পাঠে ধ্বংসোন্মুখ বা মধ্যযুগের নিরক্ষর চিত্রজীবীর হেয় চিত্রাবলী আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তাহা বর্ত্তমান যুগের ঐ উন্নত পাশ্চাত্য চিত্রাবলীর রং ঢং ও পরিচ্ছদাদি যাহা আমাদিগের রুচিবিরুদ্ধ, মাত্র সেইগুলি বাদ দিলেই, উহার অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য আর্য্য-কবিরচিত সেই প্রাচ্য চিত্র-কলার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং র‍্যাফেল, টিসিয়ান, ভ্যাণ্ডায়িক ও রেম্‌ব্রাণ্ট প্রভৃতি শিল্পাচার্য্যগণের উন্নত কল্পনা-কৌশল আমাদিগের আদর্শ হওয়া বিধেয়। বিশেষতঃ শেষোক্ত দুইটী মহাত্মা যাঁহাদের বর্ণ-বিলেপনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমার শিক্ষক সর্ব্বদা যথেষ্টরূপ প্রশংসা করিতেন এবং তিনি নিজে ফ্রেঞ্চবিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ ছাত্র এবং শিক্ষক হইয়াও যাঁহাদের শিল্প-চাতুরি আয়ত্ব করিয়া নিজ অধিত বিদ্যার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, সেই মনীষী আচার্য্যদ্বয়ের যৌগীক প্রথাই আমি শিক্ষার্থিগণকে উপদেশ করিব। পরম শ্রদ্ধাস্পদ মদীয় শিক্ষক মহাশয় যেরূপ সহজ ও সুন্দর ভাবে এবং সুশৃঙ্খলারূপে শিক্ষা দিতেন, আমি ঠিক সেই ভাবেই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্তরে স্তরে বুঝাইতে যত্ন করিব। শিক্ষার্থিগণ এই উপদেশমত মনোযোগ দিয়া অভ্যাস করিলে তৈলচিত্রণের দুরায়ত্ত অতি কঠিন বিষয়ও সহজে আয়ত্ত করিয়া চিত্রের প্রকৃত মনোহারিত্ব সম্পাদন করিতে পারিবে।

শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য চিত্রে তৈলবর্ণের বিলেপন-কৌশল সম্বন্ধে যথাক্রমে দেহবর্ণ (Flesh colour), পরিচ্ছদ চিত্রণ (Painting of draperies), চিত্রের তলপৃষ্ঠ (Back grounds) এবং নিসর্গচিত্রণ (Landscape Painting) বর্ণন করিব। এক্ষেত্রে বর্ণাবলীর রাসয়নিক তত্ত্ব (The chemistry of colours) আদৌ আলোচনা করিবনা; তাহা আমার 'চিত্র-বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেই বিস্তৃত ভাবে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রান্তর্গত দেহবর্ণ বা ফ্লেশকলার অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থির বর্ণ-চিত্রণের আবশ্যকীয় বর্ণ-সম্পাত ও তদুপকরণ তুলিকা বা ব্রাস (Brush) এবং তাহাদের ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেই কারণ প্রথম শিক্ষার্থিগণকে সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। অবশ্য এস্থলে বলা বাহুল্য যে, যে সকল ছাত্র বর্ণচিত্রণ অভ্যাস করিতে সম্পূর্ণ কৃতসঙ্কল্প তাহারা নিশ্চয়ই ইতি পূর্ব্বে পরিপ্রেক্ষিত-বিজ্ঞান-সিদ্ধ সীমাঙ্কন ও ছায়ালোক আদিতে সম্পূর্ণ অভ্যাস লাভ করিয়াছে। যাহাদের সাধারণ অঙ্কনকার্য্যে সেরূপ উপযুক্ত জ্ঞান নাই, তাহারা কখনই বর্ণচিত্রণে উন্নতি-লাভ করিতে পারিবে না। সাধারণ অঙ্কনকার্য্যে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান লাভ করিলেও একেবারেই প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণ অভ্যাস করা, নিতান্ত সহজ সাধ্য নহে। তৎপূর্ব্বে কয়েক খানি জড়চিত্র (Still-life) অভ্যাস করিলে ভাল হয়। কারণ মনুষ্য বা অন্য কোনও জীব জন্তু কখনই নিশ্চল হইয়া বসিয়া বা স্থির থাকিতে পারে না, তাহাতে প্রথম শিক্ষার্থির বর্ণানুকরণ-কার্য্য বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে, এতদ্ব্যতীত একেবারে বহু বর্ণের মিলনজাত কোন অভিলষিত মিশ্রবর্ণের বিলেপনকার্য্য নিশ্চয়ই নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। সেই কারণ সর্ব্ব প্রথম কোন এক-বর্ণের বস্তু বা আদর্শদৃষ্টে চিত্র অভ্যাস করিলে আরও সুবিধা হয়। আশা করি শিক্ষার্থিগণ বর্ণ চিত্রণ কার্য্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই এক-বর্ণচিত্র বা মনোক্রোম পেণ্টিং (Mono-crome Painting) অভ্যাস করিবে। চীনামাটীর বাসন পেয়ালা, কড়িমাটীর খেলেনা, জার, বোয়েম, চূণারের ও দেশী মাটীর বাসন ও পুতুল প্রভৃতি এক-বর্ণচিত্রণের বেশ সুন্দর আদর্শ।

ইহার পরে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় যথা—তামা, পিতল আদি ধাতুময় আদর্শ দৃষ্টে বর্ণচিত্র অভ্যাস করা উচিত। অনন্তর মূলা, বেগুন, কুমড়া, কাঁচ-কলা; শশা, ফুটী, কাঁকুড়, কামরাঙ্গা; তাল, বেল, চালদা, নারিকেল ও আম জাম, লিচু, জামরুল আদি ফল মূলের চিত্র যথাযথ আদর্শের বর্ণে অনুকরণ করিতে যত্নকরা আবশ্যক। এইগুলি সমাপন হইলে কয়েকখানি ফুলের চিত্রও বর্ণানুকরণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

প্রথমে সহজ ও সামান্য সামান্য আদর্শ, পরে কঠিনতর আদর্শ হইতে এই সকল জড়চিত্র সুসম্পন্ন করিবে। আবশ্যকবোধে চিত্রগুলির তলপৃষ্ঠে বা ব্যাকগ্রাউণ্ডে গাঢ় পাটলবর্ণ বা গাঢ় হরিদ্বর্ণ অথবা কোনরূপ হালকাবর্ণের বস্ত্র দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিবে। যে কোনও চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় উত্তর দিকের আলোক বিশেষ উপযোগী। অর্থাৎ

কোনও গৃহের উত্তরদিকের দ্বার বা জানালা খুলিয়া অন্যান্য দিকের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া কর্ম্ম করিবে, কারণ উত্তর দিকের আলোকব্যতীত অন্য কোনও দিকের আলোক তেমন সুবিধা জনক বা নিরাপদ নহে—অন্যদিকের আলোক সকল সময় একরূপ থাকে না, কখন সেই আলোক যথেষ্ট উজ্জ্বল, কখনও বা সম্পূর্ণ অনুজ্জ্বল, তাহাতে আদর্শের ছায়ালোক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, কিন্তু গৃহের উত্তরের দ্বার বা জানালা হইতে যে আলোক পাওয়া যায়, তাহা কখনও ওরূপ হয় না, তাহা সকল সময়েই প্রায় একরূপ থাকে, তবে যদি সেই দ্বার বা জানালার সম্মুখে অন্য কোনও বাড়ীর প্রাচীর থাকে এবং তাহা হইতে কোন সময় সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে সে আলোকেও আদর্শাঙ্গে বিভিন্নরূপ ছায়ালোক পতিত হইবে, সুতরাং তখন উত্তরের সে আলোকও সুবিধা জনক নহে। সে ক্ষেত্রে কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন আলোকের তীব্রতা কম থাকিবে, অথবা যখন সম্মুখস্থিত দেওয়াল হইতে আলোক প্রতিফলিত হইবে না তখনই কার্য্য করা ভাল। যদি উত্তরের আলোক আদৌ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য যে কোনও আলোকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কার্য্য করিতে হইবে। পূর্ব্বদিকের আলোক বৈকালে, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমের আলোক প্রাতে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল থাকে, সেই সময়েই তাহাতে কার্য্য করা ভাল। তবে উত্তরের আলোকে যেমন নিশ্চিন্ত হইয়া সকল সময়েই কাজ করা যায়, অন্য দিকের আলোকে কিছুতেই সেরূপ হয় না। এই উত্তরের আলোকের জন্য প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য শিল্পিকুল বিবিধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কোনও চিত্রবিন্যাস করিবার সময় বা কোনচিত্র দেখিবার অথবা অন্য কাহাকেও দেখাইবার সময় কিংবা গৃহ-ভিত্তিতে তৈলচিত্র টানাইতে হইলেও উত্তরের আলোকই প্রশস্ত, বিশেষ তৈলচিত্রের পক্ষে ইহা না হইলেই চলে না। ইহা পাশ্চাত্য প্রদেশের একটী উন্নত বিজ্ঞান-সম্মত বিধি। ইহার পরিবর্ত্তন করা বোধ হয় এখন আর কাহারও সাধ্য নাই। যতদিন হইতে য়ুরোপখণ্ডে তৈলবর্ণচিত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, ততদিন হইতেই ইহার উপযোগীতা সম্পুর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন, এমন কি তৈলচিত্রের নূতন শিক্ষার্থীরাও তাহা এখন অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমাদের প্রাচ্যশিল্পিগুরুগণ যে এ তত্ত্ব মূলেই জানিতেন না বা বুঝিতেন না, তাহা নহে। আমি পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি, তৈলবর্ণচিত্র প্রাচ্যখণ্ডস্থিত এই আর্য্যভূমি হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং এই উত্তরালোক-তত্ত্বও যে সর্ব্বপ্রথমেই এই দেশীয় শিল্পী-ঋষিকুল-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তর্কপরদিগের সন্দেহ নিবারনার্থে অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের সেই প্রসিদ্ধ ও অতি প্রাচীন নীতিশাস্ত্রের একটী কথা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি সেই সুদূর অতীত যুগেই তাঁহার নীতি শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ববিধ গৃহাদির নির্ম্মাণ বিষয়ে যে স্থলে উপদেশ দিয়াছেন, সেই স্থলে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে ২২৮ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন, "শিল্পশালাং তুর্য্যাহুদগ্‌গৃহাৎ।" টীকাকার বলিয়াছেন "শিল্পশালাং শিল্পগৃহাং উদক্ উত্তরস্যান্দিশি কুর্য্যাৎ।"

অর্থাৎ শিল্পগৃহ উত্তরাস্য ভাবে নির্ম্মাণ করিবে। সুতরাং মোগল আধিপত্যসময়ের বিজ্ঞানবিহীন কতকগুলি অতি হীনচিত্রই যাঁহারা প্রাচীন আর্য্য-শিল্পের আদর্শ বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা বিজ্ঞানের কথায় কম্পিত হন, তাঁহারা এরূপ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত উত্তরমুখী প্রাচ্য শিল্পশালার কথা শুনিলে সামান্য বিচলিত হইবেন না কি? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচ্য-প্রতীচ্য বলিয়া কোনও বিভেদ নাই, তাহা সর্ব্বদেশে সকল সময়েই সমান, যদ্যপি অদৃষ্টবশে, শিক্ষার অভাবে বা কোন কারণে সেই রত্নস্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের অজ্ঞাত থাকে, তাহা অতি হেয় স্থানে পতিত থাকিলেও সাদরে উঠাইয়া লওয়া উচিত। যাহা হউক চিত্রবিন্যাস করিতে শিল্পশালা বা ষ্টুডিও উত্তরমুখী গৃহই প্রশস্ত। শিক্ষার্থির সুবিধা হইলে আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট প্রথায় নিজ নিজ শিল্পশালা প্রস্তুত করিয়া লইলে ভাল হয়। যাঁহারা সেরূপ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ তাঁহারা যে কোন গৃহ চিত্রকার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে পারেন, তবে গৃহটী নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলে চলিবে না, সম্ভবমত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হওয়া চাই, কারণ চিত্রকরকে সময় সময় চিত্র হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে হটিয়া চিত্র পরীক্ষা করিতে হয়।

চিত্রকর সর্ব্বদা নিজ বামপার্শ্ব হইতে আলোক লইয়া কার্য্য করিবে। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আলোক লইলে চিত্রে নিজ হস্তেরই ছায়া পড়ে। তাহাতে চিত্রান্তর্গত ছায়ালোকের সুস্পষ্ট অনুভূতি হয় না।

এতদ্ব্যতীত আলোকের একটী নির্দ্দিষ্ট গতি না থাকিলে, অথবা যে পার্শ্ব হইতে আলোক আসিতেছে তাহার বিপরীত পার্শ্ব হইতে দেখিলে বা চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিলে, তৈলচিত্র 'চক্‌চক্' করিবে, ফলে পরিষ্কারভাবে দেখা যাইবে না। সুতরাং যে স্থানে চিত্র রাখিলে চিত্র বেশ উজ্জ্বল দেখায় অথচ 'চক্‌চক্' না করে, সেই স্থলে রাখিয়াই কার্য্য করা উচিত।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

সূচী পত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
দীন সংগীত	(স্বামী দীনানন্দ)	১৩[illegible]
চিন্তে পাগলা	(শ্রীউমাচরণ মিত্র)	১৩৬
কাশীধাম	(শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী)	১৪৪
প্রস্তর চিত্রণ	(শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়)	১৪৮
কে তুমি	(দেবশর্ম্মা)	১৫[illegible]
কোণার্ক দর্শন	(কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন)	১৫[illegible]
বর্ণ-চিত্রণ	(শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী)	১৫[illegible]

ইণ্ডিয়ান্ আর্ট স্কুল।

৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রীষ্মাবকাশের পর স্কুল খুলিয়াছে। এখন হই[illegible] নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা হইতেছে। ড্রয়িং, পেন্টি[illegible] ফটোগ্রাফি, এন্‌গ্রেভিং, লিথোগ্রাফি, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান [illegible] আর্ট প্রিন্টিং আদি যাঁহারা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ভর্ত্তি হইবার এই উপযুক্ত সময়।

শ্রীগোপীকান্ত সেন—ম্যানেজার।

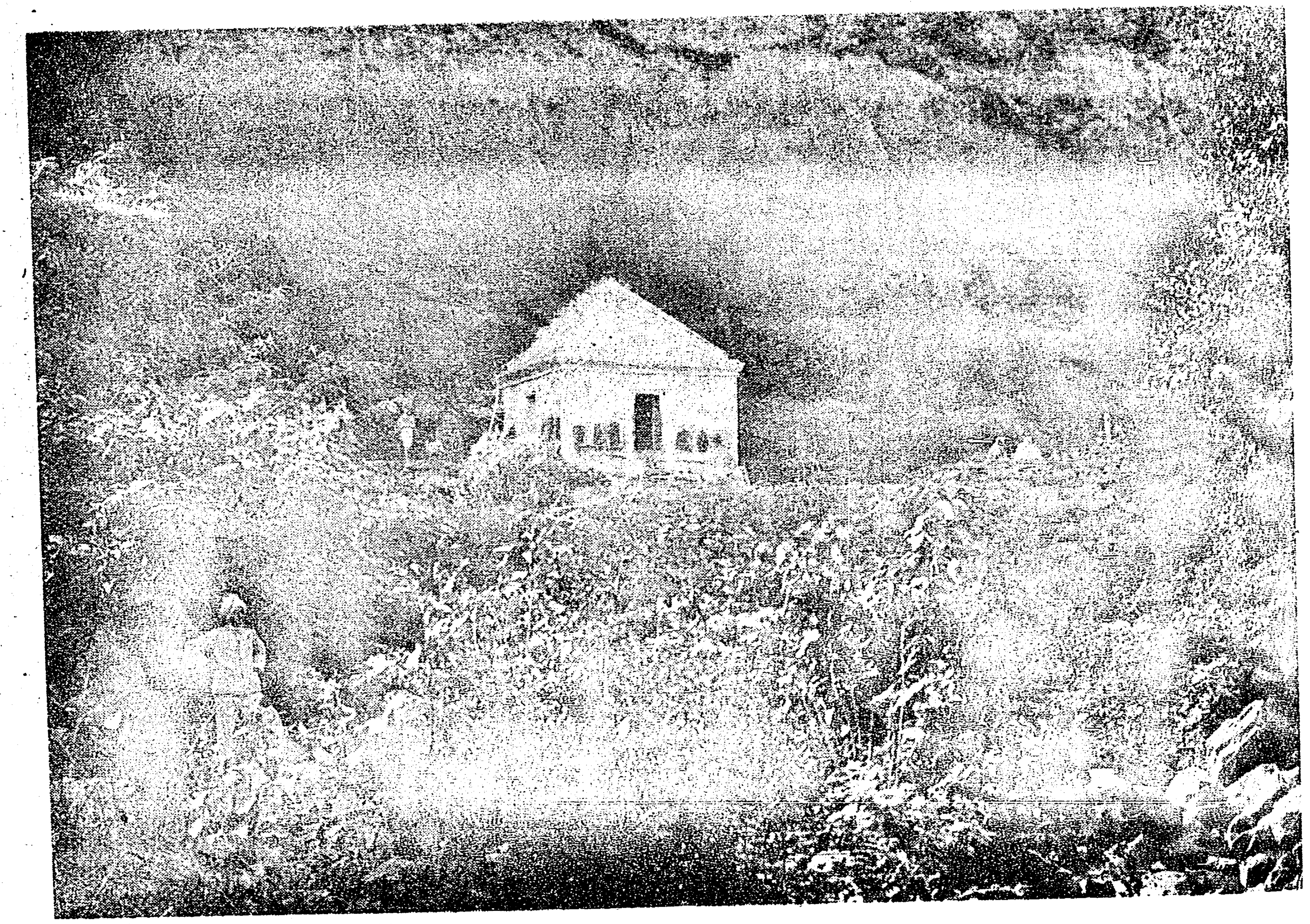

ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম।

ভগলপুর জেলার অন্তর্গত মাধীপুরা সবডিভিসনের এলাকায় সিংহেশ্বর নামক স্থানে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের এই আশ্রম অবস্থিত।

The Indian Art School, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ:;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৯ম খণ্ড } জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩১৭। { ৯ম সংখ্যা।

কাশীধাম।

(১৪৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর)

বৃদ্ধকালেশ্বর।

কালোদকের অনতিদূরে বেনারস মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের উত্তর-পূর্ব্বে বৃদ্ধকালের অতি প্রাচীন পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদগণ বলেন ইহার গঠন দৃষ্টে এই মন্দিরটী অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। অনেকের মতে এক্ষণে কাশীতে যতগুলি শিবালয় আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। 'কাশীখণ্ড' প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সুপ্রাচীন সত্যযুগে দক্ষিণ দেশস্থিত নন্দিবর্দ্ধক নামক প্রদেশে বৃদ্ধকাল নামে একজন নরপতি বাস করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসের ইচ্ছায় নিজ মহিষীসহ কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন ও অনতিকালমধ্যে এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই বৃদ্ধকালেশ্বর নামে এই প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের ইতিহাস যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে এই অট্টালিকা ও মন্দির দ্বাদশ-প্রাঙ্গণ বিশিষ্ট ছিল, এবং ক্রমে ধ্বংস হইতে হইতে উহার ছয়টী মাত্র প্রাঙ্গণ এক্ষণে অবশিষ্ট আছে। সেগুলিরও এরূপ শোচনীয় অবস্থা, কোন সময় যে তাহা সমভূমি হইযা যাইবে, তাহার ঠিক নাই। বৃদ্ধকালের মন্দিরান্তর্গত সিন্দুরশোভিত মহাবীরের একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে, দক্ষিণ পার্শ্বে কৃষ্ণ প্রস্তরবিনির্ম্মিত কালী-প্রতিমা এবং চতুরস্র প্রাঙ্গণ, সম্মুখে মহাদেবের নন্দী বা বৃষমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালী প্রতিমার দক্ষিণ দিকে গণেশ ও পার্ব্বতীমূর্ত্তি এবং বাম পার্শ্বে ভৈরবনাথ, হনুমানজী, সূর্য্য, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী-

মূর্ত্তি অবস্থিত। এই স্থলে একটী কূপ ও একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। কুণ্ডেরজল দুরারোগ্য বিবিধ রোগনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ। রোগীগণ এইকুণ্ডে অতি ভক্তি ভাবে স্নান করিয়া থাতেন। কূপের জলও অত্যন্ত পবিত্র ও নির্ম্মল, সকলেই তাহা পান করিয়া থাকেন।

মৃত্যুঞ্জয় বা অল্পমৃতেশ্বর।

বৃদ্ধকালেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই একটী ক্ষুদ্রমন্দির বা গৃহের মধ্যে অল্পমৃতেশ্বর বা অপমৃত্যুহরেশ্বরের শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভক্তগণের বিশ্বাস এই অল্পমৃতেশ্বর মহাদেব, অল্পায়ু মানবকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। সেই কারণ বহুতীর্থযাত্রী এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন। এই মহাদেবকে তণ্ডুলান্নের ভোগ দেওয়া হয় বলিয়া, নীচ শ্রেণীর গ্রাম্য লোকেরা 'ভাত খাউয়া' মহাদেব বলিয়া অভিহিত করে।

নাগেশ্বর।

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের নিকটেই নাগকুঁয়া মহল্লায় 'নাগকূপ' নামে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। কথিত আছে, নাগপঞ্চমীর দিবস এই স্থানে ভক্তিভরে নাগরাজের পূজাকরিলে জীবনে সর্পভয় থাকে না। প্রায় শতাধিকবর্ষ অতীত হইল, একজন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা এই কূপেয় চারিধার প্রস্তরদ্বারা সুন্দররূপে বাঁধাইয়া কূপের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। ইহার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। তাহারই অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র মন্দির বা গৃহমধ্যে সর্পবেষ্টিত নাগেশ্বর-লিঙ্গ অবস্থিত। বাহিরে সোপানপার্শ্বে স্বতন্ত্র তিনটী সর্পমূর্ত্তি আছে।

এই মহল্লাতেই মার্কণ্ডেশ্বর ও দক্ষেশ্বর নামে আরও দুইটী শিবলিঙ্গ আছেন। দক্ষেশ্বরমূর্ত্তি অধুনা বৃদ্ধকালের মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত।

আলমগির মসজিদ্।

অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে হিন্দু-বিদ্বেষী মোসলমানগণ আর্য্যদিগের সেই পবিত্র ও অতি প্রাচীন কৃত্তিবাসেশ্বর-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই ইষ্টক-প্রস্তরাদি উপাদান-সহযোগে এই আলমগির মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধকালের মন্দির হইতে ইহা প্রায় শতগজ মাত্র ব্যবধান হইবে। পুরাতত্ত্ববিদদিগের চক্ষে ইহার মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক। ইহার সেই অবিকৃত স্তম্ভ ও উপাদান সকল বাস্তবিকই কত প্রাচীন কথার পরিচয় দেয়। কোন কোন মহাত্মা বলেন, ইহা প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যের অতি উজ্জ্বল আদর্শ। সেই কারণ অনেকেই অনুমান করেন, ইহা কোনও প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্যাংসাবশেষ হইবে। বাস্তবিক এরূপ সরল কারুকার্য্য সমন্বিত স্তম্ভাদি দেখিয়া ভারতের অতি প্রাচীন স্থাপত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কেহই ইতস্ততঃ করেন নাই। যাহাহউক মসজিদ নির্ম্মিত হইবার পর ইহারই দক্ষিণদিকে পুনরায় নূতন মন্দিরে কৃত্তিবাসেশ্বর মহাদেবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ অন্ধ-বিশ্বাসী সাধারণ ব্যক্তিগণ মসজিদ-সংলগ্ন সেই অবিকৃত স্তম্ভ ও প্রস্তরাদি দর্শন করিয়া

এখনও সেই প্রাচীনমন্দিরের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা মসজিদমধ্যে প্রবেশাধিকার না পাইলেও, উহার প্রাঙ্গণান্তর্গত একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর স্তম্ভের উপর পুষ্প-চন্দনসহযোগে পূর্ব্বাধিষ্ঠিতের উদ্দেশ্যে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই স্তম্ভটী একটী ক্ষুদ্র জলকুণ্ডের মধ্যে রক্ষিত আছে।

কৃত্তিবাসেশ্বর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কৃত্তিবাসেশ্বর মহাদেবের সেই পূর্ব্বমন্দির নাই, তাহাই আলমগির-মসজিদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে। কাশীখণ্ডের বর্ণনানুসারে জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বকালে এই মন্দির অতি প্রকাণ্ড ছিল, বহুদূর হইতে ইহার চূড়া প্রত্যক্ষীভূত হইত। কথিত আছে, দর্শনাভিলাষ ভক্ত দুর হইতেই মন্দিরের সেই পবিত্র চূড়া দর্শন করিবামাত্র কৃত্তিবাসত্ব লাভ করিতেন।

সত্যযুগে অসুরশ্রেষ্ঠ প্রবল পরাক্রান্ত গজাসুর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হয় যে, কামপরাজিত স্ত্রী পুরুষ মাত্রেরই সে অবধ্য হইবে। সেই দর্পে জগৎ-সংসার তাহার নিকট তৃণতুল্য বোধ হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে; প্রকৃতই ত্রি-সংসারে তখন সে একপ্রকার অবধ্য হইল; কিন্তু মদনবিজয়ী শূলপাণি বিশ্বেশ্বর তাহা জানিয়া জগতের শান্তিস্থাপনার্থে তাহাকে ত্রিশূলবিদ্ধ করিলেন। অসুরপতি তখন অতি কাতরভাবে কত স্তবস্তুতি করিতে লাগিল, শঙ্কর তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন:—"তোমার এই শরীর অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তিবিধায়ক শ্রেষ্ঠতম লিঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মহাপাতকনাশক কৃত্তিবাসেশ্বর নামে ইহা পরিচিত হইবে।" দেবাদিদেব দিগম্বর মহাদেব গজাসুরের প্রার্থনা অনুসারে তখন হইতেই তাহার কৃত্তি বা চর্ম্ম চিরদিন উত্তরীয়রূপে পরিধান করিয়া আসিতেছেন। সেই কারণেই তাঁহাকে লোকে 'কৃত্তিবাস' বলিয়া পূজা করে।

বিধিপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সপ্তকোটি মহারুদ্রমন্ত্রজপ করিলে যে ফল, কাশীতে একবার মাত্র কৃত্তিবাসেশ্বর পূজা করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। মাঘীকৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি কাশীধামে এই মহালিঙ্গ সমীপে নিশাজাগরণ করিবে, নিঃসংশয়ে তাহার পরম-গতি-লাভ হইবে। চৈত্রীপূর্ণিমায় এই কৃত্তিবাসেশ্বরের সম্মুখে মহোৎসব করিলে আর তাহার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

যাহাহউক সেই পবিত্র মন্দির বিদ্ধস্ত হইবার পর তাহারই দক্ষিণদিকে রাস্তার উপর, সম্মুখে সামান্য পুষ্পোদ্যান সমন্বিত এই মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ভক্তমাত্রেরই কাশীতে আসিয়া কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজাকরা কর্ত্তব্য।

হংসতীর্থ।

উক্ত মন্দিরের অব্যবহিত পশ্চাতে হংসতীর্থ নামক এক প্রসিদ্ধ কুণ্ড অবস্থিত। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, পূর্ব্বকথিত গজাসুর ত্রিশূলাঘাতে যে স্থানে পতিত হয়, শূলোৎপাটনকালে সেই স্থানে এই কুণ্ড উৎখাত হয়। নরগণ এই স্থানে স্নান করিয়া কৃত-কৃতার্থ হয়।

কথিত আছে পুরাকালে একবার বার্ষিকী চৈত্রী-যাত্রা-উপলক্ষে রাশিকৃত অন্নপ্রস্তুত হয়, তদ্দর্শনে বায়সাদি পক্ষিকুল সমবেত হইলে, গগণমার্গে তাহাদের পরস্পরে যুদ্ধ লাগিয়া যায়, তাহাতে অনেকগুলি কাক বিনষ্ট হইয়া কুণ্ডে পতিত হয় ও কিয়ৎক্ষণ পরে হংসত্বলাভ করে। যাত্রিগণ এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া তদবধি এই কুণ্ডকে 'হংসতীর্থ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সাধারণের ধারণা কাকের সেই ঘোর কৃষ্ণ-মলিনবর্ণসম জীবের অনন্ত পাপকালিমারাশি এই কুণ্ড স্নানে বিধৌত হইয়া হংসবৎ শুভ্র ও নির্ম্মল হইয়া যাইবে।

কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে এই কুণ্ডটী রাশিকৃত আবর্জ্জনায় পূর্ণ ছিল, কতকগুলি ধর্ম্মপ্রাণ সদাশয় ব্যক্তির যত্নে ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে এবং তিন পার্শ্বে উচ্চ ইষ্টক প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যিকভাবে ইহা উত্তমরূপে সংস্কৃত হইলেও বহু কালের পুঞ্জিকৃত আবর্জ্জনার দুষিত বিষ এখনও বিনষ্ট হয় নাই। সেই কারণ কুণ্ডেরজল এখনও স্নানের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

রত্নেশ্বর।

আলমগির মসজিদ ও কৃত্তিবাসের মন্দিরের মধ্যে রাস্তার উপর দুইটী লোহিত বর্ণের মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে একটী রত্নেশ্বরের পবিত্র মন্দির। গিরিরাজ হিমালয় জামাতাকে অত্যন্ত দরিদ্র বিবেচনা করিয়া, বহু রত্নরাজী সমভিব্যাহারে নিজ কন্যা পার্ব্বতীকে দেখিতে আসেন, কিন্তু এখানে আসিয়া কাশীর তদপেক্ষা অসংখ্য ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করতঃ লজ্জায় হর-পার্ব্বতীর সহিত আর সাক্ষাৎ না করিয়া কালভৈরবের উত্তরভাগে সেই সকল রত্নরাজী রক্ষা করিয়া চলিয়া জান। পার্ব্বতী তাহা জানিতে পারিয়া পিতৃপরিত্যক্ত সেই সকল বহুমূল্য সুবর্ণ-রত্নাদিদ্বারা রত্নেশ্বরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। বহু গণকর্তৃক সেই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া ছিল। বিধর্ম্মী-অত্যাচারে সেই মন্দির বিনষ্ট হইলে, এই বর্ত্তমান মন্দির নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে যখন এই মন্দিরের ভিত্তি খোদিত হয়, তখন মৃত্তিকা হইতে বহু মণিরত্ন বাহির হইয়াছিল। এই মন্দিরটী রাস্তার মধ্যে এমন ভাবে বিনির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহাতে রাস্তার আয়তন ক্ষুদ্র ও তদ্সহ বক্র হইয়াগিয়াছে। শুনা যায়, কিছুকাল পূর্ব্বে কোন ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী ইহাকে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি কি এক অজানিত কারণে তিনি সে অভিলাষ পরে পরিত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় মন্দিরটীর মধ্যে হনুমানজী ও আর একটী শিবলিঙ্গ আছে।

গোপাল-মন্দির।

বেনারস টাউনহলের দক্ষিণদিকে গোপালজীর এই প্রকাণ্ড ও প্রসিদ্ধ মন্দির এবং অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত। সহরের মধ্যে এত বড় বড় প্রাঙ্গণ ও অসংখ্য গৃহাদি সমন্বিত প্রাসাদসম অট্টালিকা আর নাই বলিলেই হয়, ইহা 'গোপালমন্দির' বলিয়াই পরিচিত। ইহার চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন পথে সাবেকিধরণে সুবৃহৎ সিংহদ্বার

বল্লভাচারী গোস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন গোস্বামী এই মন্দিরের অধিকারী। তাঁহারা বংশপরম্পরায় স্ত্রী-পুত্র-কলত্রাদিসহ নানা বিলাসপরিপুষ্ট রাজ-পরিবারের ন্যায় সসম্মানে এই মন্দির বা পুরীমধ্যেই বাস করেন। ইঁহাদের ধন-ঐশ্বর্য্যও নিতান্ত কম নহে। ভূতপূর্ব্ব গোস্বামী মহারাজ বা 'লালবাবার' সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আমার পরিচয় ছিল। কাশীধামে যাইলেই তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিলে তিনি দুঃখিত হইতেন। তিনি যেমন সুপুরুষ তেমনি অমায়িক ও সুপণ্ডিত ছিলেন. সর্ব্ববিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় গুণগ্রাহী ব্যক্তি অধুনা সচরাচর দেখা যায় না। রাজসভার অনুকরণে তাঁহার একটী নাতিবিস্তৃত সভা-গৃহ ছিল। তথায় তিনি মকমলের সুকোমল গদির উপর রাজার ন্যায় অথবা নূতন বরের মত নানা রত্নমালা ও কিংথাপের বস্ত্রাদিতে বিভূষিত হইয়া উপবেশন করিতেন। সভাগৃহের সাজসজ্জাও সম্পূর্ণ রাজোচিত ছিল। সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সভাস্থল উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন। তিনি নিজে একজন অসাধারণ সুবাদক ছিলেন। কাশীর প্রধান প্রধান বৈশ্য, বেণীয়া ও জহুরীগণ গোপাল মন্দিরের শিষ্যমণ্ডলী। তাঁহার সম্মান ও আত্মমর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল। গায়কোবাড় প্রতীম ভারতের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গও তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। প্রায় দুই বৎসর গত হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় লালবাবা নিজেই গোপালজীর অর্চ্চনা করিয়া আরত্রিক করিতেছেন, বহু শিষ্যমণ্ডলী ভক্তিভরে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময় যেমন তিনি আরত্রিক বিধি সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন, অমনি তাঁহার শেষ বায়ু গোপালজীর চরণে বিলীন হইয়া গেল। এক্ষণে তাঁহার নাবালক সন্তান এই গোপালমন্দিরের অধিকারী। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া অন্যূন শত বৎসর বা তদপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। গোপালজীর নিত্য যে সমস্ত ভোগ হয়, তাহা মন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহ-প্রাঙ্গণে পুরী-জগন্নাথের প্রসাদের ন্যায় নিত্য বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। কাশীদর্শনাভিলাষী বিশেষ বিষ্ণু-উপাসকগণের এই মন্দির অতি অবশ্য দর্শন করা উচিত।

বড়গণেশ।

বেনারাস টাউনহলের উত্তর-পশ্চিম দিকে অথবা মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের ঠিক পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর যাইলেই 'বড়গণেশ-মহল্লা'। এই মহল্লার মধ্যে অনেকগুলি দেবমন্দির বা শিবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বড়গণেশের মন্দিরই প্রধান। এই মন্দিরমধ্যে সম্মুখেই প্রকাণ্ড গণেশমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকে অন্যান্য বহু দেববিগ্রহ ইতস্ততঃ রক্ষিত আছে। সভামণ্ডপে গণপতি-বাহন মুষিকের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর দিন এখানে একটী মহতী মেলা হইয়া থাকে।

কবির সাহেবের মন্দির।

বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল আফিসের নিকট 'কবির-চৌরা' মহাল্লায় একটী গলীর মধ্যে মহাত্মা কবির সাহেবের মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সেই গলির এক পার্শ্বে একটী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা ক্ষেত্র, চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি গৃহ অট্টালিকা অবস্থিত। এই স্থানই কবিরের গদি বা প্রধান আখড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের প্রধান মোহান্ত ও বহু কবিরপন্থী সাধুসন্ন্যাসী নানা স্থান হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রাঙ্গণমধ্যে পূর্ব্বগত মহান্তগণের কয়েকটী সমাধি-মন্দিরও আছে। উক্ত গলির অন্য প্রান্তে একটী পুষ্প বাটীকা আছে। এটী কবির-পন্থাবলম্বী গৃহস্থগণের জন্য অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হয়। গলির উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাদ্বয় গলির উপরস্থিত একটী ক্ষুদ্র সেতুদ্বারা সংযুক্ত থাকিলেও নিম্নে পরস্পরের স্বতন্ত্র দ্বার আছে।

এই মঠ হইতে কিয়দ্দূরে 'লহরতলাও' বা 'লহরতারা' মহল্লা পথ, উহারই দক্ষিণ পার্শ্বে এক উচ্চ ভূমি-খণ্ডের উপর একটী সুন্দর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্বে একটী বিস্তৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাই 'লহরতালাও' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহা বেনারাস হইতে এলাহাবাদ বা প্রয়াগ যাইবার পথে ৪২৩ সংখ্যক মাইল প্রস্তরের অতি নিকটেই। কথিত আছে, কবির সাহেব শৈশবাবস্থায় এই কুণ্ডে বা পুষ্করিণী মধ্যেই আভির্ভূত হন। এতদ্সম্বন্ধে 'কাশীর মহাত্মাগণ' অংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল। উক্ত মন্দির মধ্যে কবির সাহেবের পাদুকা চিহ্ন রক্ষিত আছে, ভক্ত ও শিষ্য-মণ্ডলী তাহাকেই সাক্ষাৎ কবির সাহেব বলিয়া পূজা-চর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন ইহাই কবির সাহেবের বৈঠক। এই স্থানে সততঃ একজন কবির শিষ্য বা কবিরদাসী অবস্থান করিয়া থাকেন। মন্দির সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে কয়েকটী সাধকের সামাধি আছে।

ঈশ্বরগাঙ্গীতলাও।

ঈশ্বরগাঙ্গীতলাও বা কুণ্ড অনাদিকাল হইতেই আছে, এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এতাধিক পুরাতন পুষ্করিণী এক্ষণে কাশীতে আর নাই। ইহার চারি কোণেও অন্যান্য দুই এক স্থানে অনেক দেব-বিগ্রহ পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে একটী মকরবাহনে গঙ্গমূর্ত্তি ও আর একটী সূর্য্যমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কয়েকটী গৃহে রামায়ৎ সন্ন্যাসীরা বাস করে এবং তাহারা নিত্য সন্ধ্যার সময় তথায় রামায়ণ গান করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাতৃতীয়ায় এই স্থানের হিন্দুস্থানী রমণীগণের একটী মেলা হয়, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া কাশীর সুপ্রসিদ্ধ 'কাজরী-গীত' ঐ দিবস গাইয়া থাকে।

ঈশ্বরগাঙ্গীর নিকটেই যাগেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরান্তর্গত যাগেশ্বর মহাদেব ব্যতীত বাহিরে অন্যান্য বহু প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

পাতাল-পুরিয়াস্থান।

উক্ত যাগেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বেই পাতাল পুরীয়া-স্থান। ইহার বাহিরে কয়েকটী মোসলমানী সমাধি-স্তুপ ও একটী বিকৃত শার্দ্দুলমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে একটী বাটীতে দশটী সাধু থাকিবার উপযুক্তস্থান আছে। দুই দশজন সাধু যাঁহারা সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুপাসক সন্ন্যাসী। শিব ও হনুমানজী প্রভৃতির কয়েকটী মূর্ত্তি ব্যতীত ইহার মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে—ভূমিতলে একটী গহ্বর আছে। কথিত আছে, এই গহ্বর পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার সীমা নাই। মর্ত্তলোক হইতে পাতালে যাইবার এই পথ, সেই কারণ ইহার নাম পাতালপুরীয়া স্থান। গহ্বরের মুখ সততঃ তালাবন্ধ থাকে, কেহই তাহার ভিতর দেখিতে পায় না, হয়ত বহুদুর বিস্তৃত কোনও সুড়ঙ্গ থাকিতে পারে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

সন্দেহ।

(১)

অনেকদিন হইতে সাধ ছিল উকিল হইব। প্রতিবেশী দেবীদাদা যখন নাকের উপর সোনার চস্মা লাগাইয়া চাপকানের উপর চোগা আঁটিয়া বুকে মোটা ঘড়ির চেন দুলাইয়া ও কেশবিরল মস্তকটি আধ ময়লা সাম্লা দ্বারা যথাসম্ভব ঢাকিয়া গর্ব্বোন্নত স্ফীতবক্ষে আদালতে যাইতেন, আমি ভাবিতাম কোন পূণ্যফলে মানুষ উকিল হয়। আবার আদালতের ফেরত গাড়ী হইতে নামিবার সময় তাঁহার পকেটস্থ রৌপ্যমুদ্রার ঝন্ ঝন্ শব্দে যখন আমার বৈকালিক পাঠাভ্যাস ভঙ্গ হইত, মনে মনে বলিতাম আর ২।৩ বছর পরে আমিও অমনি হইব। যোগাড় যন্ত্র করিয়া Lawrence Meyoর দোকান হইতে একটী চস্মাও খরিদ করা হইল, বাকি রইল কেবল ওকালতি করিবার চাপরাসটি। টোপর সংগ্রহ হইল, এখন শুভবিবাহের ঠিকৃঠিকানা হইলেই হয়। হায়! তখন জানিতাম না যে 'অদৃষ্টং ফলতি-সর্ব্বত্রং ন বিদ্যা ধন্যা নচ পৌরুষম্ দৈব্যকৃপাবতী মানুষে গড়ে দেবতায় ভাঙ্গে। আমার অত সাধের আশাতেও ছাই পড়িয়া ছিল। সেই দুঃখের কাহিনীই বলিতেছি।

উপর্য্যুপরি দুইবার বি, এল, পরীক্ষায় ফেল্ হইয়া ওকালতিরূপ দ্রাক্ষাফলে তিক্তরসের সঞ্চার সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম। তখনও পর্য্যন্ত প্রজা-পতি-দেবতা আমার ঘাড়ে চাপেন নাই; তবে আমার 'মেওয়া সবুরে ফলিবে' এইরূপ আশ্বাস-বাণী ভুক্তভোগী সতীর্থ-বর্গের নিকট হইতে অযাচিত ভাবে প্রায়ই পাইতাম। কিন্তু এবম্বিধ নিঃস্বার্থ সহানুভূতির জন্য আমি কায়মনোবাক্যে কৃতজ্ঞ রহিলেও অবস্থার অসচ্ছলতা-নিবন্ধন তাঁহা-দিগের মহাদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে পারি নাই। অক্ষম ব্যক্তির বিবাহ করা ও বাহিরের বিপদ ডাকিয়া গৃহে আনা উভয়ই সমান। মুরুব্বি কেহই ছিল না। King Coর মুছুদ্দি যোগীবাবু, ডন্‌ক্যান ব্রাদার্সের

cashiar ভুটীদাদা ইত্যাদির অনেক নিষ্ফল উমেদারী করার পর অবশেষে স্বচেষ্টায় বিদেশে একটী কর্ম্ম জুটিল। শুভযাত্রার দিন কাদামাখা কচ্ছপেরমত ক্রমে গুটি গুটি অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন জননীদেবীর স্নেহবাষ্পরুদ্ধ হৃদয়ের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে একাকী বিদেশ-যাত্রা করিলাম।

উত্তর পশ্চিমে মিরাট সহরের একপ্রান্তে একান্ত নিরালায় মল্লিক সাহেবের সুবৃহৎ বাটী অবস্থিত। তিনি একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তার। চেহারাটী নিতান্ত কাট্-খোট্টা রকমের। সাজ গোজ, চাল চলন, ধাঁজ ধরন সমস্তই বিলাতী। নামের পশ্চাতে Esquire না থাকিলে সে চিঠি তিনি accept করিতেন না। পয়সার অপ্রতুল ছিল না। পূর্ব্বে পসার প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল, কিন্তু পত্নী-বিয়োগের পর হইতে প্রাক্টিস একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিলেই হয়। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাতে একান্ত অনাসক্তি ও বৈষয়িক সকল কর্ম্মেই অমনোযোগীতা তাঁহাতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। এমনকি সংস্কারাভাবে বাড়ীখানির চতুর্দ্দিকে আগাছা জন্মিয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এই নির্জ্জন সহবাসে দুইটী প্রকাণ্ডকায় কুকুর তাঁহার নিত্য-সহচর।

তাঁহার পুত্র মাতৃহীন পঞ্চমবর্ষীয় ছোটুর whole-time private tutor স্বরূপ আমি নিযুক্ত হইলাম। প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের গৃহে দুই সন্ধ্যা দুই মুঠা আহার করিতে যাওয়া ব্যতীত অধিকাংশ সময়ই এই বাটীর বহির্ভাগের অল্পালোকোদ্ভাসিত নাতিবৃহৎ একটী কক্ষে শিক্ষকতা ও অবসরকাল আইনের পুস্তকগুলি নাড়াচাড়া করিয়া আমার সুদীর্ঘ অলস দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

(২)

রাত্রিতে কুকুর দুইটী লইয়া ডাক্তার সাহেব অন্দরের একাংশে থাকিতেন; অপরাংশে জনমানব-হীন। বোধ হয়, তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর স্মরণ-চিহ্নসকল এই অংশের সহিত জড়িত বলিয়া ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ লছমন ছোটুকে লইয়া বাহিরে আমার পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে শয়ন করিত।

একদিন রাত্রে শুনিলাম, লছমন ছোটুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ভুতের গল্প করিতেছে। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে ম্লান চিম্‌নির অস্পষ্ট আলোকে এইরূপ গল্প শুনিলে আমার ন্যায় পরিণত বয়স্কেরই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়—তা বালক ত দূরের কথা। ভাবিলাম, এই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খ চাকরটির সঙ্গ-দোষে হয়ত বালকের কোমল অন্তরে একটী কুসংস্কারের অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। ছোটু নিদ্রিত হইলে লছমনকে ডাকিয়া পুনরায় ওইরূপ গল্প করিতে নিষেধ করিলাম। অনবরত বাজে বকা বৃদ্ধের এক অভ্যাস। আমাকে পাইয়া বসিল। একথা সেকথার পর বলিল,—"মাষ্টার-বাবু, আপনি কি শোনেন নি এ বাড়ীটাতে ভূত আছে।"

"কি রকম?"

"রাত্রিতে মেম সাহেবের ছাওয়া যে বেড়াইয়া বেড়ায়, ছোটু কতদিন দেখেছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"ভুতের গল্প শুনে

ছেলেমানুষ যে ছাওয়া দেখে চম্‌কে উঠ্‌বে, এতে আর আশ্চর্য্য কি?"

"ছাওয়া নয়। আপনি কি শোনেননি তিন বছর আগে রেলের ঠোকাঠুকিতে ছোটুর মা মারা গিয়াছেন?"

"শুনেছি। তাতে কি হয়েছে?"

"সাহেবের বিশ্বাস—তাঁর স্ত্রীর চরিত্র ভাল ছিল না। আর সত্য কথা বলিতে কি, মেমসাহেব ললিত বাবু নামে তাঁর একজন বাপের বাড়ীর বন্ধুকে বেশী ভালবাসিতেন। শুনিয়াছি ললিত-বাবুর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হইত, কেবল টাকার লোভে মেমসাহেবের বাপ—"

আমি তাহার বক্তৃতা শেষ করিবার অবসর দিলাম না। এই সকল পারিবারিক দূষনীয় কথার কর্ণপাত করিবার আমার অধিকার নাই। ধমক খাইয়া বৃদ্ধ আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

সংসারের একমাত্র আকর্ষণ—নয়নের মণি ছোটুকে স্কুলে পাঠাইতে তাহার পিতার নিতান্ত অনিচ্ছা। বিপত্নীক হওয়া অবধি তিনি পুত্রকে কাছছাড়া করিতে নারাজ। তবে ছেলেটা পুরাতন ভৃত্যের বড় নেওটা বলিয়া রাত্রে তাহার কাছেই শয়ন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। শৈশবে মাতৃহারা সন্তানের প্রতি পিতৃস্নেহধারা প্রায়ই অজস্র পরিমাণে বর্ষিত হয়।

একদিন ডাক্তার সাহেবের নিজমুখেই শুনিলাম, মিসেস্ মল্লিক বিশেষ কার্য্যবশতঃ বৃদ্ধা দাইকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাইতে ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে hot-axle হইয়া ট্রেনে আগুন ধরিয়া যায়। অনেক তল্লাসের পর তাঁহার দেহ পাওয়া গেল বটে; কিন্তু সেটা একটী দগ্ধ মাংসপিণ্ড বিশেষ। সেই নিদারুণ দৃশ্যে উহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই কথা বলিবার সময় তিনি রুমালে মুখ আবৃত করিলেন। স্বর্গগতা পত্নীর প্রতি এবম্বিধ অকৃত্রিম অনুরাগের নিদর্শন পাইয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্ত্রী-বিয়োগের পর একমাস যাইতে না যাইতে হাতে সুতা বাঁধিয়া বসেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমি শ্রদ্ধার চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনও সুজি (সুহাসিনী—তাঁহার স্ত্রী) আমার সহিত কথা কয়।"

আমার মস্তকের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। পথিমধ্যে পথিক সহসা উন্নতফণা বিষধর দর্শন করিলেও বুঝি এত চমকিত হয় না। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ আকুলনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার স্বর স্থির ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ,—নয়নে তীক্ষ্ণ অবিচল দৃষ্টি। তিনি তখন ডিনারে বসিতেছিলেন। টেবিলে খাদ্য-দ্রব্যাদি দুইজনোপযোগী ও যথোপযুক্ত পৃথকভাবে সজ্জিত। একখানি চেয়ারে তিনি বসিয়া আছেন; কিন্তু অপরটি কাহার উদ্দেশে? আমি স্থির করিলাম, মর্ম্মান্তিক শোকে লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

"সে প্রত্যহ ওইখানে বসিয়া আমার সহিত একত্রে আহার করে"—শূন্য আসনখানির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক স্বরে এইকথা বলিয়া তিনি কুকুর দুটীকে আদর করিতে লাগিলেন।

আমি ত অবাক। "ন যযৌ ন তস্থৌ।" খানিক আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, মনিবের আদেশমত দুইজনের উপযুক্ত ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রত্যহ টেবিলে সাজাইয়া রাখা হয়। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী কখনও ফিরিয়া আসে না। বুঝিলাম ওই কুকুর দুটো উহা খাইয়া ফেলে।

একজন প্রেততত্ত্ববিদ্ লিখিয়াছিলেন—'মৃত্যুর পর দেহ-বিমুক্ত আত্মা প্রিয়জনের ইষ্ট ও অপ্রিয়জনের অনিষ্ট সাধনে সক্ষম। মুখে যাহাই বলিনা কেন, আন্তরিক ভুতের অস্তিত্ব বিলক্ষণ স্বীকার করিতাম। সে রাত্রি ভালরূপ নিদ্রা হইল না। কেবল ওই চিন্তায় মন চঞ্চল হইতে লাগিল। গরিবের কথা বাসি হইলে মিষ্ট হয় শুনিয়াছি, কিন্তু ভৃত্য লছমনের কথা বাসি হইয়া হইয়া আজ প্রাণে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার করিল।

(৪)

লছমন প্রায়ই ছোটুর মার সুখ্যাতি করিত। এক দিন কথায় কথায় সেই কথা উঠাতে ছোটু বলিল —"আমি মাকে বড্ড ভালবাসি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মাতাকে তাহার এখনও মনে পড়ে কি না? "পড়ে বই কি—আপনি দেখবেন আসুন" হিড়্ হিড়্ করিয়া বালক আমায় বাড়ীর মধ্যে লইয়া চলিল। রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে চারিদিক নিস্তব্ধ প্রায়। প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে পাখীরা পত্রাচ্ছন্ন নীড়ে লুকাইয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটা সাথীহারা ঘুঘুর করুণ তান মৌনমুগ্ধ মধ্যাহ্নের সজীবতার সাক্ষী দিতেছিল। ডাক্তার তখন বাড়ীতে ছিলেন না। আমি জানিতাম, তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভিতরে যাওয়া নিষিদ্ধ, তথাপি বালকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া আমি তাহাকে বাধা দিলাম না। নিজেরও যে কৌতূহল ছিল না, সে কথাও বলিতে পারি না। আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল অন্ধ এবং চিন্তাশূন্য। যখন তাহারা আবেগ-প্রণোদিত হয়, তখন কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে।

আমরা অন্দরের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বাটীর পশ্চিমদিকে উপস্থিত হইলাম। ছোটুর মার মৃত্যুকাল হইতে এই দিকের কক্ষগুলি অব্যবহৃত। কবাট বদ্ধ ছিল না, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটী কক্ষে উপনীত হইলাম। কক্ষগাত্র কারুকার্য্য খচিত এবং খাঁটী ইংরাজী ফ্যাসানে সজ্জিত। মেহগনি-কাষ্ঠনির্ম্মিত বহুমূল্য গৃহসজ্জার উপকরণাদি গৃহস্বামীর সামর্থ্য ও রুচির পরিচায়ক। কিন্তু রাশীকৃত ধূলা ও আবর্জ্জনায় ঘরটী পরিপূর্ণ—নিশ্চয়ই বহুকালাবধি কেহই এ কক্ষমধ্যে বাস করে নাই। এই সুন্দর কক্ষটীর প্রতি গৃহস্বামীর অমনোযোগিতার কারণ অনুমান করিয়া অন্তরে বিষাদের এক অব্যক্ত-অননুভূত ছায়া-স্পর্শ অনুভব করিলাম। বোধ হয় মিসেস মল্লিকের শেষ যাত্রার সময় ঘরটী যেমন সাজান ছিল, এখনও ঠিক সেই রকম আছে।

লছমন বলিল, সে একবার ব্যতীত আর কখনও এই কক্ষে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু ছোটু বলিয়া উঠিল,—"আমি অনেকবার এসেছি।" আমি লছমনের অর্থসূচক চাহনির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বালকের নির্দ্দেশমত গ্রীণ ভেলভেট দিয়া বাঁধান একখানি আলোকচিত্র গৃহগাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

হাঁ—দেখিবার জিনিস বটে। ভ্রমর কৃষ্ণ নিবিড় কুঞ্চিত অলকারাশিতে ঘেরা একটী সুন্দরী মোহিনী মূর্ত্তি। বালেন্দুবৎ কৃষ্ণ ভ্রূযুগ্মসমন্বিত আয়ত লোচনদ্বয়ে হাসিরাশি খেলিয়া বেড়াইতেছিল। সেই তন্বঙ্গীর মুখে চোখে লাবণ্য যেন উছলিয়া উঠিতেছিল। ছোটুর সহিত এই মুখের সাদৃশ্য স্পষ্টই অনুভূত হয়। হায়! যৌবনের পরিপূর্ণ বসন্তে এই প্রফুল্ল কোরকটী নিয়তির করাল করস্পর্শে অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। অযাচিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার অন্তরের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া অন্তরেই বিলীন হইল।

আমি যতক্ষণ বালকের হাত ধরিয়া সজল-নয়নে তাহার মাতৃ-প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, লছমন ডেস্কের ভিতরের কাগজগুলা নাড়াচাড়া করিতে করিতে আপন মনেই বলিয়া যাইতেছিল—"ছোটুর মা আমাদের বড়ই ভাল বাসিতেন। আহা কি কুক্ষণেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলেন। সাহেব তখন বাড়ীতে ছিলেন না, নইলে—"

সহসা তাহার করুণ-রসাত্মক বক্তৃতা স্রোত রুদ্ধগতি হইল দেখিয়া আমি তাহার প্রতি চাহিলাম। তাহার হস্তে সমচতুষ্কোণ সাদা খামে বন্ধ করা একখানি চিঠি। এমন কি ডাকের টিকিটখানি পর্য্যন্ত দেওয়া রহিয়াছে। উপরিভাগের লিখিত ঠিকানা ঈষদুচ্চস্বরে পড়িলাম—

"ললিতকুমার রায়,
...নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লছমন ব্যগ্রস্বরে বলিল—"আমি এরই কথা বলিয়াছিলাম। ইনি বাড়ীতে আসিতেন বলিয়া সাহেব মেমে প্রায়ই কেজিয়া চলিত।"

আবার কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হয় দেখিয়া বৃদ্ধকে এক ধমক দিলাম। তারপর ছোটুর হাত ধরিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিলাম।

রাত্রে লছমন বলিল—সে চিঠিখানি পোষ্ট করিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন চিঠি?" "সেই ললিত বাবুর চিঠি। বোধ হয় কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে মেমসাহেব লিখিয়া ডাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন যাঁহার নামের চিঠি তিনি পাইবেন।"

বৃদ্ধের এই খাম খেয়ালী দেখিয়া আমার হাসি আসিল। আবার ভাবিলাম, মৃতের অভিলাষ অপূর্ণ রাখিতে নাই। পোষ্ট করিয়া ভালই হইয়াছে। তথাপি একটু গম্ভীরভাবে বলিলাম—"পত্রখানি ছোটুর বাপের হাতে দেওয়া তোমার উচিত ছিল।"

"তা হ'লে আর আমাকে বাঁচিতে হইত না। তিনি দুচক্ষে ললিতবাবুকে দেখিতে পারিতেন না। ছোটুর মা মারা যাইবার দিন দশেক পূর্ব্বে তিনি এখানে আসিয়া ছিলেন, সাহেব তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বাড়ী ঢুকিতে দেন নাই।"

"সে কতদিনের কথা?"

"বছর তিনেক হবে, হোলির দিন ওই দুর্ঘটনা ঘটে। তার তিন দিন পরে সাহেব তাঁর মৃতদেহ আনেন। উঃ! সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গিয়ে দেখিতে কি ভয়ানকই হইয়াছিল!"

সেই সময়ে ছোটু আসিতে কথাটা চাপা পড়িল। তার মুখখানি শুষ্ক—চোখ দুটী ছলছল করিতেছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম—বিলক্ষণ উত্তপ্ত। যাহা হউক, তখন আমি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম।

ছোটুকে লছমন শয্যায় শয়ন করিতে লইয়া গেল।

জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ডাক্তার সাহেব নিজেই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন —কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া consult করিবার জন্য আর একজন ইংরাজ ডাক্তার আনা হইল। আমরা প্রাণপণ করিয়া সেবা করিতে লাগিলাম। সন্তানবৎসল পিতাও দিবারাত্রি রোগীর শয্যায় বসিয়া সজলনয়নে পীড়া-কাতর পুত্রের শীর্ণ ও বিবর্ণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু বালক কেবল তাহার মাতার জন্য অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিত। পিতা আদর করিতে গেলে সে তাহার রোগ ক্লিষ্ট নবনীত শুভ্র কচি হাত দুটী দিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া দিত। সে তাহার মাতাকে চাহে। বালকের কাতরোক্তি যেন সহস্র বেদনার মত ডাক্তারের বুকের মধ্যে বিদ্ধ হইতেছিল। অতৃপ্ত স্নেহের সহস্র তরঙ্গ বুঝি প্লাবনের মত তাঁহার বুকের মধ্যে ওতঃপ্রোত হইতেছিল। অসহ্য যন্ত্রনায় তিনি উন্মত্তের মত গৃহমধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আজ ২১শ দিন। জর কিছুতেই কমিতেছে না। দিন দিন রোগী আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। সুতীব্র নিখাদে বাঁধা জীবন-তন্ত্রী যেন ক্রমশঃ সকরুণ কড়ি-মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতেছে। শিশুর হৃদয়-ভেদী "মা" "মা" স্বরে আমার অন্তর্দগ্ধ হইত। হায়! যাহা যায়, তাহা কি ফিরাইবার? জগদীশ! কি অপরাধে ননীর পুতলীর সুকোমল হৃদয়ে এ দারুণ শেলাঘাত!

রোগীর সম্মুখে ডাক্তার অসামান্য ধৈর্য্য সহকারে চুপ করিয়া থাকিতেন, কিন্তু ঘরের বাহিরে গিয়া তাঁহার মূর্ত্তি ভয়ানক হইত। অপরিমেয় বাৎসল্য সত্ত্বেও তিনি সন্তানের দুর্দ্দমনীয় মাতৃস্নেহাকাঙ্ক্ষা পূরণে অসমর্থ, এটা বুঝি তাঁহার অসহ্য হইত।

ভুবন ভুলান হাসিমুখে হেমাম্বুদ-কিরিটীনী উষাদেবী উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন। কয়দিনের অতিরিক্ত রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত ও অবশ দেহটার হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার মানসে ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থিত মহীরুহদলের নবোদ্গত পত্রাবলী সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে জলজ্বলায়মান ও শীতল প্রভাতানিলের সংঘাতে মৃদু স্পন্দিত হইতেছে। একটি ভদ্রলোক আসিয়া পরিচয় দিলেন,—তিনি ললিত বাবু; আরও বলিলেন, একখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার বিশুষ্ক বদনে কি যেন এক ব্যাকুল আগ্রহ দেখিলাম।

আমি পত্র সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বিবৃত করিয়া বলিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে তিনি সহসা দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়, অপরাহ্ণে সেই স্থানে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্ধ্যানের কারণ জানিবার জন্য চারিদিকে চাহিলাম। দূরে ডাক্তার সাহেবের কুকুর দুইটীকে দেখিয়া ব্যাপার সুস্পষ্ট অনুভূত হইল। "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ"। পরক্ষণেই মিঃ মল্লিকের সুদীর্ঘ দেহ-যষ্টি নয়নগোচর হইল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম ছোটু আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। সে চুপি চুপি বলিল—"মাষ্টার

মশায়, আমি কাল রাত্রে মাকে দেখিয়াছি। তিনি আমায় এক 'জিনিস' দিয়াছেন, কিন্তু বাবাকে দেখাইতে বারণ করিয়াছেন।" আমি ভাবিলাম 'delirium' কিন্তু, অন্যান্য সমস্ত কথা বালক ঠিক কহিতেছিল। সুতরাং বলিলাম, সে বোধ হয় স্বপ্নে তাহার মাকে দেখিয়াছে। "না আমি সত্যই দেখিয়াছি", বালক জেদ্ করিয়া প্রতিবারই এই কথা বলিতে লাগিল। আমি তখন সেই "জিনিস" টা দেখিতে চাহিলাম। কিন্তু তাহার ছোট্টো মাথাটী নাড়িয়া সে আমায় জানাইল যে, সে কিছুতেই দেখাইবে না। অবশ্য এ সমস্ত আমি বিশ্বাসযোগ্য মনে করিলাম না।

অপরাহ্ণে ললিতবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রথমেই চিঠিখানি আমায় দেখিতে দিলেন। উহার সারমর্ম্ম—

"যতশীঘ্র পার আসিও। ভয়ানক ষড়যন্ত্র—রেল-দুর্ঘটনায় আমি হতচেতন হইয়াছিলাম মাত্র; আমার স্বামী গোপনে আমায় গৃহে আনিয়াছেন।"

আমার পদতলস্থ ভূমি যেন কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। আমি নির্নিমেষ বিস্ময়-বিস্ফারিতচক্ষে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। একি স্বপ্ন দেখিতেছি! তিনি রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"'সুজি' বাঁচিয়াছিল। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাহাকে এখানে লইয়া আসিবার পর এই পত্র লিখিত হইয়াছে।" ডাক্তার কি তবে স্ত্রী-হন্তা? এমন সময়ে লছমন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল। তাহার হস্তে কাগজের মত একটা সাদা পদার্থ। বৃদ্ধ এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—"এই দেখুন মেমসাহেবের ভুতের নিকট হইতে ছোটু কি পাইয়াছে।" বলিতে ভুলিয়াছি, ললিতবাবুর সহিত সাক্ষাতের কথা আমি লছমনকে বলিয়াছিলাম।

একখানা সাদা রুমালের এককোণে লাল রেশমী সুতায় লেখা—"পশ্চিমের ঘর—চোরা দরজা—আমায় বাঁচাও—সুহাসিনী।" এই তবে সেই 'জিনিস' ছোটু তাহার মাতার নিকট পাইয়াছে, এবং তাহার পিতাকে ইহা দেখাইতে সে নিষিদ্ধ। ললিতবাবু বলিলেন—"সে নিশ্চয় বাঁচিয়া আছে—মল্লিক তাহাকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

লছমন বলিল—"সেকি কথা? আমি যে তাঁহার মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

ললিত। তুমি কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলে?

লছমন তখন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"না, তা পারি নাই—পুড়ে সে কেমন একরকম হইয়া গিয়াছিল।"

তখন সমস্ত ঘটনা নখদর্পণবৎ আমার চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। এতদিনে বুঝিলাম, দুইজনের উপযোগী আহার কেন প্রত্যহ ডাক্তারের কক্ষে রক্ষিত হইত।

ললিতবাবুর ইচ্ছা তখনই পুলিসে খবর দেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। একটা সোরগোল করিলে কথাটা শীঘ্রই ডাক্তারের কাণে উঠা সম্ভব। তখন ছোটুর মাতাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা কঠিন হইবে। পরামর্শ ঠিক হইল—রাত্রি ১১টার সময় তিনি পুলিশ লইয়া আসিবেন।

আমি পশ্চাতের দরজা খুলিয়া তাঁহাদিগকে গুপ্তভাবে চোরা কামরায় লইয়া যাইব। অগ্রে সুহাসিনীকে উদ্ধার করিয়া পরে ডাক্তারকে 'arrest' করা যাইবে।

রাত্রে ললিতবাবু দুইজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও পাহারাওলা লইয়া তস্করের ন্যায় পশ্চাতের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী—যেন এক-খানি দিগন্তবিস্তৃত নীলিমা-রঞ্জিত চন্দ্রাতপকোলে একত্রে শত কোহিনুর জ্বলিতেছে। চন্দ্রকর-প্লাবিত আরণ্য-কুঞ্জ হইতে দুই একটি সুপ্তোত্থিত বিহগের অলস হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যতীত নিখিল বিশ্ব যেন সুপ্তিময় হইয়া পড়িয়াছিল। ইনস্‌পেক্‌টার দ্বয়ের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি চোরা লণ্ঠন ও পিস্তল ছিল।

চাতালে লছমনের মুখে শুনিলাম, ছোটুর পিতা সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি লছমনকে কক্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়া ছোটুকে কি সব প্রশ্ন করিতেছেন। সুতরাং আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা উচিত নয়। আমরা অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সকলেই নগ্নপদে ধীরে—অতি ধীরে—যেন মাটির সহিত পা মিশাইয়া চলিতে লাগিলাম। আমরা নির্ব্বিঘ্নে ডাক্তার সাহেবের কক্ষপার্শ্বস্থ দালানে উপ-স্থিত হইলাম। সহসা নীরব সুপ্তপল্লী কাঁপাইয়া কুকুরের উচ্চ চীৎকারধ্বনি ও তৎসঙ্গে শৃঙ্খলের ঝন্ ঝন্ শব্দে চাহিয়া দেখিলাম,—কুকুর দুটির বগলস্ ধরিয়া ডাঃ মল্লিক দূরে দণ্ডায়মান। তাঁহার নয়নে অগ্নি জ্বলিতেছিল। তীব্রস্বরে প্রশ্ন করিলেন—"কে তোমরা? এত রাত্রে আমার বাড়ীর মধ্যে কি উদ্দেশ্যে?"

ললিতবাবু বলিলেন—"আমরা তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি"।

শ্লেষ ব্যঞ্জক স্বরে উত্তর হইল—"তুমি? এখন বুঝিতেছি সত্যই দুঃশ্চারিণী ছলনা করিয়াছে। তাই তুমি—তার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ দিয়া সন্তুষ্ট হও নাই!—আবার এখন তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছ?"

"আমি? কখনও না—জগদীশ্বর সাক্ষী"

"হাঁ-তুমি। Liar! at him-at him Nero".

মুক্ত কুকুরদ্বয় ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া ভীষণ-বেগে ছুটিয়া আসিল। পরক্ষণেই একটি পিস্তলের আওয়াজ। দেখিলাম, একটী কুকুর অর্দ্ধ-পথে মৃত্যু-যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে; কিন্তু অপরটী কর্ত্তৃক ললিতবাবু ভীষণ রূপে আক্রান্ত। সকলেই তাঁহার উদ্ধারের জন্য ছুটিলাম। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে আহত কুকুরটার আর্ত্তনাদ ও প্রতিহিংসাপ্রদীপ্ত ডাক্তারের অট্টহাসের সংমিশ্রণে সমস্ত পল্লী আলো-ড়িত করিয়া তুলিল। মল্লিকের হস্তেও একটি পিস্তল ছিল, কিন্তু তিনি উহা ব্যবহার করিলেন না—বিদ্যুদ্বেগে পশ্চিমস্থ কক্ষটির প্রতি ধাবমান হইলেন। ললিত বাবু উদ্বেগ-ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন—"শীঘ্র যাউন, নচেৎ রক্ষা করিতে পারি-বেন না।" ইনস্পেক্টর ও আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম—কনষ্টেবল কুকুরটাকে ধরিতে গেল।

আমরা প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তলস্থ কার্পেট একদিকে উল্টান—মধ্যভাগে অবস্থিত চোরা-দরজার ছিদ্র দিয়া অস্পষ্ট আলোক-রশ্মি আসিতেছে। তন্মুহূর্ত্তেই শুনা গেল—অতি ক্ষীণস্বরে কে যেন প্রাণভিক্ষা করিতেছে। পরক্ষণেই একটি পিস্তলের শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যথিতের আর্ত্তনাদে আমরা দুইজনে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেলাম। ঠিক সেই সময়ে ললিত বাবু তড়িদ্গতিতে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া চোরা-দরজা ঠেলিয়া উন্মত্তের ন্যায় নীচে লাফাইয়া পড়িলেন-তৎ-পশ্চাৎ ইনস্পেক্টর ও আমি। দেখিলাম—ললিত বাবু ডাক্তারকে প্রাণপণে আক্রমণ করিয়া তাঁহার হস্তস্থিত পিস্তলটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। ঘরের কোণে শীর্ণকায় এক রমণী-মূর্ত্তি রক্তাক্ত কলে-বরে ছটফট করিতেছে। সেই ধূল্যবলুণ্ঠিতার রক্তহীন বিবর্ণ মুখমণ্ডলে এমন একটি বিষাদ-ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে তাহাতে নিতান্ত হৃদয়-হীনের হৃদয়েও করুণা জাগিয়া উঠে।

ইনস্পেক্টরদ্বয়ও তখন ললিতবাবুর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কি যেন এক অমানুষিক বলে ডাক্তার সকলকে ঠেলিয়া দিয়া পিস্তলটি স্বঃবক্ষ প্রতি লক্ষ্য করিলেন। উপর্য্যুপরি দুইটি আওয়াজ হইল—হতভাগ্য ডাক্তার মল্লিকের মৃতদেহ ধরাতলে লুণ্ঠিত।

সৌভাগ্যবশতঃ ছোটুর মা সাংঘাতিকরূপে আহত হন নাই। সুচিকিৎসার গুণে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার বাল্য-বন্ধু বহু-দিনের জন্য বিদেশযাত্রা করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত একবার শেষ দেখা করিবার জন্য স্বামীর অজ্ঞাতসারে কলিকাতায় যাইতে ছিলেন। সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি ডাক্তার পরের ট্রেনে স্ত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। রেল দুর্ঘটনায় মিসেস মল্লিকের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল মাত্র। ডাক্তার গভীর রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে স্ত্রীকে গৃহে লইয়া আসেন, এবং সেই দাইটার অগ্নি-দগ্ধ বিকৃত মৃতদেহটীকে স্ত্রীর বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দেন।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করি-লাম—"বাস্তবিকই কি ছোটু আপনাকে দেখিয়া-ছিল?" তিনি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হাঁ, সে আমার জন্য বড় কাঁদিতেছিল বলিয়া তিনি কৌশলে তাহার চক্ষু আবৃত করিয়া রাত্রে আমার কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। রুমালখানি বহুপূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। আমি চুপি চুপি উহা ছোটুর হস্তে দিয়া তাহার পিতাকে দেখাইতে নিষেধ করিয়া-ছিলাম। ইহা ব্যতীত আমার উদ্ধারের আর কোন উপায় ছিল না। বিষয়াদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য ললিতবাবু কিছুদিন সেখানে রহিলেন। আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

উপরোক্ত ঘটনার পর প্রায় ৬ মাস অতীত হইয়াছে। আবার আইন পড়িতেছি। একদিন প্রাতে চা খাইতে খাইতে সংবাদপত্রে ললিতবাবুর সহিত সুহাসিনীর বিবাহ-সংবাদ পাঠ করিলুাম। আমার মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তবে কি বাস্তবিকই ডাক্তার মল্লিক ভ্রান্ত ছিলেন না? পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইবার কারণ কি তাঁহার যথেষ্ট ছিল না?

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তর চিত্রণ।

(১৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর।)

অৰ্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ (Half-tints) চিত্রসকলের পরবর্ত্তী শুক্লবর্ণ অংশ অর্থাৎ আলোকময় অংশসকল চক্‌-পেন্সিল (chalk) চালনাদ্বারা নির্দ্দোষ ভাবে চিত্র করা অতিশয় কঠিন। এ জন্য ঐ সকল আলোকময় স্থান, প্রস্তরে চাঁচিবার ছুরি (Mezzotints scraper) দ্বারা চাচিয়া উৎপাদন করিতে হইবে। চিত্রকর এই উপায়দ্বারা সহজে ও সুন্দররূপে আলোকময় স্থানসকল প্রস্তরে চিত্র করিতে সমর্থ হইবে। ছুরিকা (scraper) ব্যবহার করিবার সময় দেখিতে হইবে, যেন প্রস্তরগাত্রে অতি গভীর ক্ষত না হয় এবং ক্ষত যথাস্থানে হয় অর্থাৎ যে স্থান আলোকময় করিতে হইবে, কৃষ্ণবর্ণের ক্রম রক্ষা করিয়া সেই স্থান কেবল যেন চাঁচিয়া লওয়া হয়। ছুরিকা ব্যবহার করিবার সময় আরও দেখিতে হইবে যে, আলোকময় স্থান সকল যদ্যপি অসম্পূর্ণভাবে চাঁচিয়া লওয়া হয়, অর্থাৎ যদ্যপি উক্ত স্থানে প্রস্তরের গ্রেণ করা অংশ সম্পূর্ণ-ভাবে চাঁচিয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে আলোকময় স্থানগুলি ছাপা হইলে শুক্লবর্ণ না হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে। চিত্রের যে অংশ ছুরিকা দ্বারা প্রস্তরে চাঁচিয়া ফেলা হয়, আবশ্যক হইলে সে স্থানে পুনর্ব্বার চিত্রকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করা অসম্ভব। কারণ ঐ স্থানের প্রস্তরের গ্রেণ করা অংশ চাঁচিয়া ফেলিবার কারণ তথাকার চিত্র অভিপ্রেত ক্রমের বর্ণ উৎপাদন করিতে পারে না। ফলতঃ ঐ স্থানের চিত্রে বর্ণ-বিকার উপস্থিত হয়।

সকল প্রস্তর সম্পূর্ণ শুক্লবর্ণের না হওয়াতে কখন কখন অনভিজ্ঞ চিত্রকরগণ ভ্রমে পতিত হয়; অর্থাৎ প্রস্তরেরবর্ণ অৰ্দ্ধকৃষ্ণবর্ণ (Half tints) মনে ধারনা করিয়া চিত্রের অৰ্দ্ধকৃষ্ণবর্ণ অংশসকল উত্তমরূপে অঙ্কিত করে না; ফলতঃ ইহাদের ছাপা উত্তমরূপ হয় না। এ কারণ প্রস্তরে কৃষ্ণবর্ণ ও অৰ্দ্ধকৃষ্ণবর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, প্রথমে উক্ত স্থানে অৰ্দ্ধ-কৃষ্ণবর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে আবশ্যক-মত অধিক কৃষ্ণবর্ণ অংশ উহার উপরে চিত্র করিলে চিত্রের বর্ণক্রম সুন্দর হইবে, এবং ইহার ছাপাও দোষশূন্য হইবে।

প্রস্তরে পেন্সিল দ্বারা গভীর কৃষ্ণবর্ণ পরিষ্কার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, ইহা মনে রাখিতে হইবে, যেন গ্রেণের গহ্বরসকল পেন্সিল ঘর্ষণদ্বারা পূর্ণ হইয়া না যায়।

প্রস্তরের গ্রেণ সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উচ্চ স্থানগুলি ছাপা হইবার সময় কাগজে চিত্র প্রদান করে, এবং গ্রেণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গহ্বরগুলিতে ছাপার কালি স্পর্শ না হওয়াতে ইহাদের ছাপা কাগজে উঠে না।

প্রস্তরে গভীর কৃষ্ণবর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, উপরে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেই নিয়ম সর্ব্বদা আবশ্যক নহে। কেবল চিত্রের যখন পরিষ্কার ছাপা আবশ্যক তখন অতি ঘর্ষণ অনাবশ্যক। কিন্তু চিত্র বিশেষে কখন কখন আবশ্যকমত পেন্সিলের অতি-ঘর্ষণ দ্বারা গ্রেণ-গহ্বরসকল পূর্ণ করিলে চিত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইবে।

এইরূপে চিত্র সম্পূর্ণ করিয়া প্রস্তরের চিত্র এক-বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যদ্যপি ছোট ছোট

কৃষ্ণবর্ণ দাগ প্রস্তরে দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সূচিকা-যন্ত্রের (Etching needle) দ্বারা তাহাদিগকে ঠুকরা-ইয়া উঠাইতে হইবে; আর যদ্যপি শুক্লবর্ণ দাগ সকল দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পেন্সিলের সূক্ষ্মমুখ দ্বারা উহাদের যথোচিত কৃষ্ণবর্ণ প্রদান করিয়া চিত্রকে যথাসাধ্য সংশোধন ও সুন্দর করিতে হইবে।

পেন্সিল-চিত্র (chalk drawing) প্রস্তরে অঙ্কিত করিবার সময় চিত্রের উপর যেন কোন প্রকারে জল বা জলবৎ পদার্থ পতিত হইয়া চিত্রকে সিক্ত করিতে না পারে। কারণ চিত্র জলদ্বারা সিক্ত হইলে পেন্সিল-রেখা প্রভৃতি আর্দ্রীভূত হইয়া গ্রেণ-গহ্বরে প্রবেশ করে এবং চিত্রের বর্ণক্রম নষ্ট হয়। যদ্যপি অল্প জল পতিত হয়, প্রস্তর শুষ্ক করিয়া ও সূচিকা-দ্বারা ঠুক্‌রাইয়া চিত্রকে সংশোধন করিবে। কিন্তু অধিক জল পতিত হইলে চিত্র-সহ প্রস্তরকে ত্যাগ করিবে। তৎপরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তর লইবে, অথবা সেই প্রস্তরকে পুনরায় নূতন করিয়া গ্রেণ করিয়া লইবে। চিত্র সম্পূর্ণ হইলে ইহাকে এচ্ (Etch) করিতে হইবে, অর্থাৎ এসিড্ (acid) বা অম্লদ্বারা প্রস্তরগাত্র ক্ষয় করিয়া চিত্রকে কিছু উচ্চ করিতে হইবে। অম্লজল মিশ্রিত অবস্থায় চক্ পেন্সিল (Litho chalk) দ্বারা চিত্রিত চিত্রকে ক্ষয় করিতে পারে না, কিন্তু প্রস্তরের অপর অপর অংশ ক্ষয় করিতে সমর্থ হয়। নিম্নে এচ্ করিবার নিয়ম বলা হইতেছে। একভাগ নাই-ট্রিক এসিড (Nitric acid) যবক্ষারাম্ল একশত ভাগ জলে মিশ্রিত করিবে। প্রস্তর একটু হেলাইয়া (বক্র করিয়া) উক্ত জল ইহার উপর ঢালিয়া দিবে। এসিডযুক্ত জল দ্বারা চিত্রের কোন ক্ষতি করিবে না। প্রস্তরের সকল স্থান যেন উক্ত জলে সিক্ত হয়। প্রস্তরের জল শুষ্ক হইলে গঁদের জল (Solution of gum-arabic in water) তরল অবস্থায় প্রস্তরোপরি কোমল তুলিকাদ্বারা লেপন করিবে। এসিড-জলদ্বারা প্রস্তর ধৌত করিবার উদ্দেশ্য যে প্রস্তর-চিত্রণের পেন্সিলমধ্যে যে ক্ষার পদার্থ থাকে, তাহাকে নষ্ট করিয়া দেয় ও ছাপা হইবার সময় ছাপার কালি ইহার চিত্রের উপর উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়। গঁদের জল প্রস্তরে মাখাইলে প্রস্তরস্থিত চিত্রের রেখা-সকলকে বিস্তৃত হইতে দেয় না।

উপরে এচ্ (Etch) করিবার জন্য যে জল ও এসিডের পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, সময়ে সময়ে চিত্র বিশেষে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে। গভীর কৃষ্ণ-বর্ণ চিত্রে এসিডের পরিমাণ কিছু অধিক ও অৰ্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ (half tints) এবং আলোকময় চিত্রে জলের পরিমাণ অধিক হওয়া আবশ্যক।

উপরে যে এসিড্-জলদ্বারা প্রস্তর ধৌত করিয়া পরে গঁদের জল মাখাইবার কথা বলা হইয়াছে, ইহা-দিগকে ঐরূপে পৃথকভাবে ব্যবহার না করিয়া একত্র গঁদের জল ও এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে। এরূপ করিলে পরিশ্রম লাঘব হইবে ও সময় নষ্ট হইবে না। গঁদের জল ও এসিডের অনুপাতে স্থির করিতে হইলে কিছু গঁদের জল মিশ্রিত এসিড তুলিকাদ্বারা প্রস্তরের একপার্শ্বে মাখাইয়া দিবে। যদ্যপি প্রস্তরে অধিক বুদ্‌বুদ্ উঠে, তবে গঁদের জল আরও কিছু যোগ করিতে হইবে, আবার যদ্যপি বুদ্‌বুদ্ অতিশয় ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে আরও কিছু পরিমাণ এসিড্ (acid) মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপে দুই এক-

বার পরীক্ষা করিলে চিত্রকর ইহাদের পরিমাণ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে। কেবলমাত্র জল ও এসিড ব্যবহার করিলেও উপরোক্ত নিয়মে ইহাদের পরিমাণ পরীক্ষা করিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

শ্যামা-সঙ্গীত।

রাগিণী বিভাষ—তাল যৎ।

কেন কর বিড়ম্বনা, ওমা শ্যামা ত্রিনয়না।
বারে বারে কত দুঃখ সব মাগো শবাসনা॥
কত বার আসিনু ভবে, কে তার পরিচয় দিবে,
এবার কৃপা কর শিবে, এ জনম যেন বৃথা যায় না॥
নাহি কিছু জ্ঞানযোগ, তাই করি গো কর্ম্মভোগ,
ঘুচেনা তাই ভবরোগ, যাওয়া আসা তাইঘুচেনা;—
বিষয় কুপথ্য ভোজন, করি শ্যামা করি যতন,
গুরুদত্ত ঔষধ সেবন, ভ্রমেও ত কভু করি না॥
সুমতি কুমতি তুমি, (কেবল) নিমিত্তের ভাগী আমি,
বৃথা কাজে ভবে ভ্রমি, তোমারই মায়ায় মা;—
দে মা জ্ঞান আঁখি খুলে, দেখি তোরে সহস্র-দলে,
'শ্যামায়' রেখে চরণতলে, শম্ভু বামে বস্ মা শ্যামা॥

শ্যামানন্দ।

শিক্ষারহস্য।

(৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর)

সাহেব বলিলেন "এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ এক জলেরই কত রকম আকার হ'তে পারে?

রামেশ্বর। "আজ্ঞে হাঁ।"

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন "মনোরঞ্জন ব'ল্তে পার কি, জল কি কারণে কি আকার পায়?"

মনোরঞ্জন। "জল যখন গরম হয় তখন বাষ্প হয়, বাষ্প ঠাণ্ডা হ'লে জল হয়—জল ঠাণ্ডা হ'লে বরফ হয়—বরফ গরম হ'লে গ'লে জল হয়, জল বাষ্প হ'য়ে মেঘ হয়, মেঘ ঠাণ্ডা হ'য়ে বৃষ্টি হয়।

সাহেব। "হাঁ ঠিক বলেছ। এখন ভেবে দেখ দেখি, ভগবান পৃথিবীর সব স্থানে জল পাবার কেমন কৌশল করেছেন? রৌদ্রে জল শুকাল, কিন্তু সেই জল হ'তে মেঘরূপ ধারণ ক'রে আবার জল হ'চ্ছে। যদি রৌদ্রদ্বারা জল না শুকিয়ে যেমন তেমনি থাকতো, তা হ'লে পৃথিবীর জল কমতো না বটে, কিন্তু জলের অভাবে ধান্য আদি শস্য হওয়া কঠিন হতো। ছেঁচা জলে শস্য হ'লেও তত ভাল হয় না। আচ্ছা—শস্য না হ'লে কি হয় বল দেখি?"

রামেশ্বর। "দুর্ভিক্ষ হয়, লোকে না খেতে পেয়ে মরে যায়।"

সাহেব। "তা ছাড়া, বরং খাদ্য না পেলে দু দশ দিন বাঁচা সম্ভব, কিন্তু জল না পেলে দু দিন বাঁচা যায় না! এই জন্য এদেশের পণ্ডিতেরা জলের আর একটী নাম দিয়েছেন 'জীবন।' এখন ভেবে দেখ দেখি, যে ভগবান আমাদের জন্য জলের এমন সুব্যবস্থা ক'রে-

ছন—যাঁর কৃপায় আমরা সব জীবিত রয়েছি তাঁর প্রতি কতদূর নির্ভর করা কর্ত্তব্য?"

রামেশ্বর। "সর্ব্বদাই তাঁকে ভক্তি করা চাই। বাবা বলেছিলেন, সর্ব্বদা ভাবতে হবে যে, আমি ভগবানের কাজ করবার জন্যেই এসেছি। বাপ মার সেবা করা, গুরুজনের সেবা করা, তাঁদের কথা শোনা আমাদের একান্ত দরকার। এই পৃথিবীর সব জিনিসই ভগবানের, জীব জন্তু কীট পতঙ্গ সবই তাঁর। সেই জন্য এই সকলের প্রতি সর্ব্বদা দয়া করা কর্ত্তব্য। আপনিও সেদিন আমায় ঐ কথা ব'লেছিলেন। "যা করতে হবে তা যথাসাধ্য যত্ন করে করতে হবে, তার পর তাঁর ইচ্ছা হয়, সে কাজ সফল হবে, না ইচ্ছা হয় নিস্ফল হবে। তাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই।"

সাহেব। "ঠিক ব'লেছ, তাঁর কাজ তিনিই করান, আমরা উপলক্ষ মাত্র, এরই নাম আত্মনিবেদন। ভগবানে আত্মনিবেদন করতে পারলে, মানুষের আর কোনও কষ্ট থাকে না। আমাদের সর্ব্বদাই মনে থাকা উচিত, যে আমরা তাঁর নিত্য দাস। তাঁর প্রিয় কার্য্য করাই আমাদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। শুধু তিনি আছেন, এই কথাটা স্বীকার করলেই তাঁকে মানা হয় না। অথবা আমাদের গুরুজনকে মানি, এজন্য তাঁদের সমক্ষে, কথনও একটি কুবাক্যও উচ্চারণ করতে পারি না। ভগবান "সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন" একথা জেনেও আমরা কত না অকার্য্য তাঁর সম্মুখে করচি! জানি "আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান। আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন।" তবুও কুকার্য্য, কুচিন্তা একদণ্ডও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। পৃথিবীর মানুষকে লুকান যায়, কিন্তু তাঁরে লুকিয়ে ত কোন কাজ করা যায় না, সুতরাং তাঁরে মান্‌তে গেলে, কুকার্য্য দূরে থাকুক কুচিন্তাটি পর্য্যন্ত ছাড়া চাই। এস আমরা সবাই এই রকম করে ভগবানকে মান্‌তে অভ্যাস করি, অভ্যাসের অসাধ্য কি আছে? ভগবানকে মান্‌লে তাঁর উপর বেশ একটু ভালবাসা জন্মাবে, তখন বুঝতে পারা যাবে, এ সংসারের সামান্য কীট পতঙ্গটি পর্য্যন্ত সবই তাঁরই, সুতরাং এদের কারুকে আর অযত্ন করতে ইচ্ছা হবে না, সকল পদার্থই তখন প্রিয়তমের প্রিয় পদার্থ ব'লে মনে হ'তে থাক্‌বে। পরের কষ্টে প্রাণ কাঁদবে, নিজের কষ্টতে কষ্ট বলে মনে হবে না। এইরূপ লোককে লোকে "ঈশ্বরপরায়ণ" বলে। আজ আমি একটি ঈশ্বরপরায়ণ লোকের কথা বল্‌বো।

"কোনও দেশে 'জব' নামে একজন ঈশ্বরপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করতেন বলে, তাঁর হৃদয় থেকে কুচিন্তা দূর হয়ে গিয়েছিল। আবার কোনও অন্যায় কার্য্য করবে দেখ্‌লে তিনি ভগবানের পদে তার মঙ্গলের জন্য—সুমতির জন্য প্রার্থনা করতেন।

"ভক্ত 'জব' ভগবানের বড়ই প্রিয়। যাঁর যে জিনিসটি বড় প্রিয়—তিনি সেটি সকলকে দেখাতে ভালবাসেন। ভগবান একদিন তাঁর অনুচরগণের সমক্ষে জবের প্রশংসা করবেন, তাই শুনে একজন অনুচর বল্লেন "যে আপনার প্রসাদে, নিরন্তর সুখে আছে, যার ধন জন প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল নাই, সে যে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাতে আর

আশ্চর্য্য কি? দুঃখের দারুণ পীড়নে পীড়িত হয়েও যদি সে আপনাকে না ভোলে, তবেই ত তার নির্ভর বুঝতে পারা যায়।

"ভগবান বল্লেন "বেশ্ কথা,' তুমি তা'কে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রতে পার, তা'তে আমার কিছু আপত্তি নাই, কিন্তু তা'কে প্রাণে মার্‌তে চেষ্টা ক'রো না, সে আমার বড় প্রিয়ভক্ত।"

'জব' যেমন ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন, তেমনি, ধনে পুত্রে লক্ষীমন্তও ছিলেন, তার কিছুরই অভাব ছিল না। সেকালের লোকদের টাকা ছিল না, তখন ধন বল্‌লে অন্য রকম বুঝাত।

"জবের ছিল, সাত হাজার ভেড়া, তিন হাজার উট, পাঁচ শত জোড়া চাস কর্‌বার বলদ। পাঁচ শত দুগ্ধবতী গর্দ্দভী, এবং এই সকল রক্ষা কর্‌বার উপযুক্ত পরিচারক। তা ছাড়া ছিল সাতটি পুত্র আর তিনটি কন্যা।

"একদিন তাঁর পুত্র-কন্যাগণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ করিতে গেল। 'জব' বাটীতে ব'সে কাজ কর্ম্ম দেখ্‌চেন, এমন সময়ে খবর এলো, যে মাঠে চাস দেওয়া হচ্ছিল, কতকগুলা ডাকাত এসে তাঁর চাকরগুলিকে মেরে ফেলে বলদগুলি নিয়েগেছে। তিনি বল্লেন, 'ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।' তার আর একটু পরে একটি লোক এসে বল্লে, "ভেড়ার গোয়ালে আগুণ লেগে ছিল, চাকরেরা নিবাতে চেষ্টা করে ছিল, কিন্তু সে ভীষণ আগুণে সব ভেড়া, আর সমস্ত চাকর পুড়ে গেছে। জব বলিলেন "ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" আর একটু পরে আর একজন লোক এসে খবর দিলে "তিন দল দস্যু এসে পণ্যবাহী উটগুলি আক্রম করে ছিল, চাকরেরা উটগুলি রক্ষা করবার জন্য প্রাণ পণে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেচে। দস্যুরা বোঝাই উটগুলি নিয়ে পালিয়েছে, আমি একা কোনও গতিকে প্রাণ বাঁচিয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি।" জব বলিলেন "ভগবানর ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" একটু পরে আর একজন এসে খবর দিলে, আপনার পুত্র কন্যাগণ আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রে বাড়ীতে আনন্দ ভোজে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ ঘরখান ভেঙ্গে প'ড়ে তা'রা সব মারা গিয়াছে।" জ বলিলেন "ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" এই কথ ব'লে তিনি নিজের বহুমূল্য বস্ত্র ত্যাগ ক'রে, ছিন্ন বস্ত্র পর্‌লেন এবং নিজের মস্তক মুণ্ডণ ক'রে, বল্লে যখন পৃথিবীতে এসেছিলাম, পরিধেয় বস্ত্র পর্যা ছিল না—যখন যাব তখন এক কপর্দ্দক নিয়ে যেতে পার্‌বো না। তিনি দিয়ে ছিলেন, তিনি নিয়েছেন তাতে কষ্ট কি? তোমরা দুঃখ করো না, অন্য কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখ। ভগবান আজ আমায় সংসার-চিন্তা থেকে মুক্ত করেছেন, এখন তাঁ চরণ চিন্তা বই আমার আর কোনও কাজ নাই।

সেই দিন থেকে জব, ভগবানের নাম গান ক'রে ভ্রমন কর্‌তে লাগ্‌লেন, কোনও চিন্তা নাই আনন্দময়ের অধিষ্ঠানে হৃদয় সদাই আনন্দে পূ

ক্রমে জবের সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া হ'তে লাগ্‌লো,— ফোড়া হ'তে পূয রক্ত বের হ'তে লাগ্‌লো, তখ তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর্‌তে না পেরে, একটা ছা গাদার উপর ব'সে ভগবানের নাম গান কর লাগ্‌লেন।

জবের পত্নী তাদৃশ ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন না। তিনি স্বামীর এইরূপ দুর্দ্দশা দেখে একদিন স্বামীর সমক্ষে বল্লেন "ঈশ্বর কি নির্দ্দয়।" এইকথা শোনবামাত্র 'জব' নিজ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে বল্লেন" ছি, ছি! অমন কথা বলো না। তিনি নির্দ্দয়! এমন কথা একবারও মুখে এনো না! যখন আমার বাড়ী ঘর ধন জনে পূর্ণ ছিল, তখন সময় সময় তার কথা হয়ত ভুলে যেতাম, এখন তাঁর মধুময় নাম গান করে দিন রাত আনন্দে কাটাচ্ছি, এর পর আর তাঁর অপার দয়ার কি পরিচয় পাব? 'শরীর থাকিলেই শরীরে পীড়া অবশ্যই হইবে। হ্রাস বৃদ্ধি তাঁর জগতের নিয়ম। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সকল জিনিসেরই উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পুষ্টি, ক্ষয়, লয়, অবশ্য আছে। কোন্ জিনিস চিরস্থায়ী যে, আমাদের ধন জন চিরস্থায়ী হবে? তাঁর দয়া—যে দয়ার গুণে আজো আমি তাঁরে ভুলি নি, দয়াময়ের সেই অপার দয়াই চিরস্থায়ী। তা তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

জবের তিনটী বন্ধু ছিল; তাঁরা জবের এই দুঃসময়ে, তারে দেখতে এলেন। কিন্তু জবকে আর চেনা যায় না। তাঁদের যে সব কথোপকথন হয়েছিল, সে সব যদি তোমাদের জানবার ইচ্ছা হয়, তবে বড় হয়ে 'বাইবেলের' "বুক অব জব" নামক অংশটি পড়ো, সে সব কথা এখন ব'ল্‌তে গেলে অনেক সময় যাবে, তা ছাড়া এখন সে সব কথা তোমরা বুঝতেও পারবে না।

কিন্তু এত কষ্টের পর জবের কি হ'লো সে কথা শুন্‌তে তোমাদের ইচ্ছা হ'তে পারে, তাই সে কথা বলছি।

অবশেষে ভগবান তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। সত্য বটে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। কিন্তু তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন তাঁর দেখা দেবার শক্তিও আছে। তাঁর চিন্ময় মূর্ত্তি ভক্তে প্রত্যক্ষ করেন। কেমন করে, সেকথা ত বলে বোঝান যায় না, তাঁকে প্রাণ মন সমর্পণ কর, তিনি দেখা দেবেন, তখন আনন্দে প্রাণ বিভোর হবে। ধ্রুব দেখেছিলেন, প্রহ্লাদ দেখেছিলেন, তোমরাও কায়মনে চেষ্টা করলে কেন না দেখতে পাবে? তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তায় অবিশ্বাস ক'রো না।

জবকে তিনি দেখা দিলেন। অনেক তত্ত্বকথা ব'ল্লেন, সে সব তোমরা বড় হয়ে সেই বইয়ে পড়ো, কিন্তু কোন ভাল লোকের কাছে বুঝিয়ে নিও, নইলে ঠিক বুঝতে পার্‌বে না। বাইবেলের গূঢ় অর্থ আছে।

ভগবানের ইচ্ছায় জব আবার ধন সম্পদ পুত্র কন্যাদি লাভ করেছিলেন, এবং সুদীর্ঘ কাল জীবিত থেকে নাতির নাতি দেখে তার পর স্বর্গে গিয়েছিলেন। এখন যাও, জলযোগ করগে।" তখন রামেশ্বর ও মনোরঞ্জন আবার তাদের পিসিমার কাছে গমন করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

শান্তি।

কুসুম সৌরভসম তাপদগ্ধে হিম-বাষ্প,—
রসনায় মিষ্টস্বাদ স্বর্গসুখ কল্পনায়।
অমিয় অনিন্দ যার তৃপ্তিকর উপাদান,
রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ নাহি মান অপমান।
রূপ নাই গন্ধ নাই বিমল আনন্দ যাহা,
ত্রিদিব বাঞ্ছিত—যার তিল নাহি কোন স্পৃহা—
সেই সে পবিত্র নিধি মন প্রাণারামময়,
জগতে অতুলনীয় তাহাকেই শান্তি কয়।

কেন প্রাণ চাহেনা তোমায়।

হে বিধাতঃ! কেন প্রাণ চাহেনা তোমায়?
তোমার বিশাল বিশ্বে আমিও সৃজিত।
সমুদ্র সলিলে যথা শিশির কণিকা,
এত ক্ষুদ্র; কিন্তু প্রভু তুমি যে মহান্,
নিখিল সংসার মাঝে আছ বিরাজিত।
তোমার করুণা-কণা লভিতে পারিলে—
ক্ষুদ্র, তুচ্ছ—সসাগরা ধরণী মাঝারে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গফল—
করে করতলগত বিনা সাধনায়।
পুরাণে বা বর্ত্তমানে শত সে প্রমাণ—
দেখায়েছ দেখাতেছ এ মর জগতে।
জানি আমি তুমি হও সর্ব্বশক্তিমান্—
তথাপি জানিনা প্রভু কোন মোহ বশে,
ভুলেও এ ক্ষুদ্র প্রাণ চাহেনা তোমায়।

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

A Manual of Bengali Composition and Model Essays বা বাঙ্গালা পদ্ধতি। কলিকাতা এথিনিয়ান ইনষ্টিটিউসনের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল কবিরত্ন কর্ত্তৃক লিখিত। আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। কবিরত্ন মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে, মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণ বাঙ্গালা রচনা ও ভাষাশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

জাতক কৌমুদী।

বি এ, উপাধিধারী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কর্ত্তৃক লিখিত। পুস্তকখানি প্রথম জ্যোতিষ-শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সহজ ভাষায় জ্যোতিষের দুরূহ বিষয়গুলি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। কেবল এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে সাধারণ কোষ্ঠী বিচার ও গণনা করা যাইতে পারিবে।

সাধনতত্ত্ব।

সাধক শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় পদ্যে লিখিত। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ-পরায়ণ সাধকগণ এই পুস্তক পাঠে নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
কাশীধাম	(শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী)	৬৩
সন্দেহ	(শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়)	১৬৯
প্রস্তর-চিত্রণ	(শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়)	১৭৮
শ্যামাসঙ্গীত	(শ্যামানন্দ)	১৮০
শিক্ষারহস্য	(শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব)	১৮০
শান্তি	(শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী)	১৮২
কেন প্রাণ চাহেনা তোমায় (ঐ)		১৮২
সমালোচনা		১৮৪

The Indian Art School, Calcutta

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

ম খণ্ড } আষাঢ় ও শ্রাবণ, সন ১৩১৭। { ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

শ্যামা-সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ-খাম্বাজ ;—তাল ঠুংরি।

কোথা আছ শ্যামা ত্রিগুণধারিণি
ত্রিতাপনাশিনি যমভয় বারিণি।
অধম সন্তানে, অভয় চরণে
স্থান দেমা নিজগুণে ওমা অধমতারিণি॥
মা মা রবে ডাকিগোমা তোমায়ে দিবা নিশি,
কোথা লুকায়ে আছ শ্যামা ওমা এলোকেশি ;—
ভবক্ষুধায় প্রাণ যায়, কে আছে মা এ ধরায়,
মা বিনে সন্তান ক্ষুধা, নিরারিতে ও জননি॥
অবোধ সন্তান আমি, মায়ামোহমদে মাতি,
ভুলিয়ে ছিলাম তোমা, না ছিল চরণে মতি ;
তাই কি পাতকি জনে, ত্যজিয়ে আছ গোপনে,
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ, ওমা পাষাণনন্দিনি॥
অজ্ঞান শিশুতে যদি ফণী ধরিবারে যায়,
বারণ কি করে না মা জননী তখনি তায় ;—
বিপরীত তব ধারা, কি বলিব বল তারা,
সন্তানে বিপন্ন দেখি দূরে পলাও আপনি॥
করমের ফল যদি সকলি হবে ঘটন—
বিপদবারিণী নাম কেন মা কর ধারণ,
মা তোর নামের গুণে দূরে পলাবে শমনে
দিতে হবে ও চরণ থাক না লুকায়ে তুমি॥
(গুরু) ব্রহ্মানন্দ বলেন, 'শ্যামা', বুঝেছিস্ রে সরোৎসার,
তারা তারা তারা তারা মুখে বল অনিবার,
হোক্ না পাষাণী মেয়ে, আপনি আসিবে ধেয়ে,
তোরে তরাবে অভয়ে, দিয়ে চরণ তরণী॥

শ্যামানন্দ।

ঠাকুরমা।

(২৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিতাংশের পর)

সপ্তম সোপান।

অনেক দিনপর বিমলা বাপেরবাড়ী গিয়াছে, তাহাকে পাইয়া তাহার ঠাকুরমা দুই গাঁঠরি পুরাতন কাপড় বাহির করিয়াছেন। কাপড়গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধোপারবাড়ীর পাটকরা, তবে কোন খানির একপাশ সামান্য একটু মচকাইয়াছে, কোন খানির মাঝটা ফালা হইয়া গিয়াছে; মোটের উপর কাপড়গুলি জীর্ণ; হয়ত আর দুই এক ধোপ কোনরূপে চলিতে পারিত, কিন্তু সেকালের গিন্নী-বান্নীরা তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহা একেবারে ন্যাকড়ায় পরিণত হইবার পূর্ব্বেই কাচাইয়া তুলিয়া রাখিতেন—উদ্দেশ্য তাহাতে দুইএক খানি বেশ ভাল কাঁথা হইবে। আজকালকার বৌ-ঝিরা বিশেষ কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতারা শুনিলে হয়ত অতি কষ্টে হাস্য-সম্বরণ করিবেন; কিন্তু এখনও যে যে বাড়ীতে দুই একটী বৃদ্ধা ঠাকুরমা সংসারের মায়া-মমতা ভুলিতে না পারিয়া, তিনমাথা এক করিতে করিতেও, বাড়ীর বৌ-ঝি, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী, প্রত্যেকের প্রতি কাজটীর উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন, আর অবিশ্রামে তাহার খুঁটি নাটির সুতীব্র সমালোচনা করিতেছেন, অনেক সময় তাহাতে বিরক্ত হইলেও, নবাবি-আমলের নবাব কি বাদসাহের উপর যেমন কাহারও প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা থাকিত না, এক্ষেত্রেও বৃদ্ধা ঠাকুরমাদের সেই অপ্রিয়-সত্য-নীতিকথার প্রতিবাদ করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। তাঁহাদের নূতন কাঁথার জন্য এই পুরাতন বস্ত্রসংগ্রহ দেখিয়া সেই সেই বাড়ীর কোন নূতন বৌকেও গোপনে হাসির বেগ সম্বরণ করিবার কথা শুনি নাই। তবে ঠাকুরমা-বর্জ্জিত নূতন বড় লোকের বৌ-ঝিদের কথা স্বতন্ত্র! যাহা হউক আমাদের বিমলা ত সে ধরণের নয়? বিমলা সেই কাপড়ের গাঁঠরি পাইয়া আনন্দে এক এক থানি করিয়া দেখিতেছে কোন্‌থানি বেশীনরম, কোন্‌থানি অপেক্ষাকৃত শক্ত আছে, কোন্‌থানি বা বেশী ছেঁড়া, কোন্ থানিতে অল্প কি আদবেই ছেঁড়া নাই; উহার মধ্যে যেগুলি উপরে বসাইবার উপযুক্ত, সেগুলি আলাহিদা করিয়া পাট করিয়া রাখিতেছে, আর বাকিগুলি ভিতরে বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। আবার সেই কাপড়-গুলির লাল কাল নানা রংএর পাড় ছিঁড়িয়া ঠাকুর-মাকে দিতেছে—ঠাকুরমা পা ছড়াইয়া তাহাহইতে ধীরে ধীরে সূতা বাহির করিয়া পাক দিতেছেন ও বাঁ হাতের চারিটী আঙ্গুলে জড়াইয়া এক পাশে জড় করিতেছেন। ঠাকুরমা কাঁথা খানির দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থির করিয়া দিয়া ঘরের মেজেয় পাড়িয়া তাহাতে সূত্রপাত করিয়া দিলেন। বিমলার মা ছেলে মেয়ে লইয়া সাংসারিক কাজেই দিনরাত ব্যস্ত, তবু অবসর মত আসিয়া তাহার উপর দুইটী ফোড় দিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মায়ের সঙ্গে বসিয়া বিমলা সিলাই করিতে লাগিল। প্রথমে ডাঁড়াসূতেয় চৌবন্দি করিয়া পুকুরে সিলাই, তার মাঝে ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর চৌখুপ্পি ঘর বাঁধিয়া সেলাই করিতে লাগিল। তাহারপর পীঁড়ায় আল্‌পনার মত চারিদিকে লাল কাল ও হল্‌দে রংএর সূতায় লতা পাতার আকারে সেলাই করিতে লাগিল। ঠাকুরমা ও মা মাঝে মাঝে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সে খানি সারা হইয়া গেল। এগুলি সাধারণ কাঁথা, তাই এত শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে, নতুবা ভাল করিয়া কাঁথা সেলাই করিতে হইলে, এক খানাতেই দুইতিন মাস সময় লাগিয়া যায়। বিমলা তাহাও শিখিয়াছে। তাহাতে পিঁপ্‌ড়ের সার, সাগরের ঢেউ আরও কত কি বিচিত্র বিচিত্র সেলাই হইয়া থাকে, বিমলা এর আগের বারে আসিয়া সেইরূপ এক খানি সুন্দর কাঁথা সেলাই করিয়াছিল। সে সব কাঁথা দেখিলে, আজ কাল অনেককেই বিস্মিত হইতে হয়। দূর হইতে তাহা যেন শালের কাজ বলিয়া ভ্রম হয়। ঠাকুরমা বলেন "এমন কাঁথা পূর্ব্বে বড় বড় লোক্‌কেও উপঢৌকন দেওয়া যাইত—তাহা দেখিয়া কত লোকে কত তারিফ্ করিত।"

কাপড়ের যে সব টুকরা টাকরা বাঁচিয়াছিল, ঠাকুরমা সেই সকল দিয়া এইবার কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেকাঁথা সেলাই করিতে বলিলেন। 'ছেলেকাঁথা' শুনিয়াই বিমলা কি মনে করিয়া যেন একটু লজ্জিতা হইল, তাহার কাণ লাল হইয়া উঠিল। বিমলার কোমর দেখিয়া, দেহের পূর্ণতা ও ভার দেখিয়া, ঠাকুরমার মনে সন্দেহ হয়, তাহার পর স্তনের মুখে ভেলা পড়া প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বিমলার প্রথম গর্ভলক্ষণ তিনি বুঝিতে পারেন। নূতন গর্ভিনীরা প্রথম প্রথম নিজেরা তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না, কিন্তু বহুদর্শী বৃদ্ধাদিগের নিকট তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হয়। ঠাকুরমা বুঝিতে পারিয়াই আনন্দে বিমলার মাকে তাহা বলিলেন। মার আর আনন্দ ধরে না—সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী এমন সব আপনার জন আসিলেই তাহাকে বিমলার গর্ভের কথা বলিয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন। গিন্নি-বান্নী প্রৌঢ়া আত্মীয়ারা—"আহা, তা হোক্ হোক্—ক'মাস হলো? তা যেমন হ'য়েছে, তেমনি সু-ভালাভালি এক ঠেঙ্গের মানুষ দুই ঠেঙ্গে হ'য়ে মায়ে পোয়ে দীর্ঘজীবি হোক" বলিয়া আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বিমলা নিতান্ত লজ্জাসত্বেও মনে মনে আনন্দিত হইয়া ঠাকুরমার আদেশমত সেই ছোট ছোট কাঁথাগুলি ক্রমে সিলাই করিতে লাগিল। একটা ভবিষ্যৎ কল্পনার-বসে মনের সহিত তাহা করাতে কাঁথাগুলি দেখিতে শুনিতে মন্দ হইল না। যাহা হউক এতে গৃহস্থের অনেক সাশ্রয় হয়। বাস্তবিক আজ কালকার বৌ ঝিরা বিলাতি উল কিনিয়া মোজা, গেঞ্জি, গলাবন্ধ আদি তৈয়ার করে, তাহাতে কেবল উল কিনিতেই যেরূপ খরচ পড়ে, সেই দামেই কি বোধ হয় তার চেয়ে ঢের কম দামেই ভাল জিনিস তৈয়ারিই কিনিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাহা হইলে সংসারের আর সাশ্রয় বা লাভ হইল কি? ওতে কেবল নিজেদের বাহাদুরি আর সখ মেটান ছাড়া আর কিছুই ত হয় না! তবে সকল রকম কাজ জেনে রাখা অবশ্যই খুব ভাল। তা আমাদের বিমলা ওসব কাজ ত আগে থেকেই খুব ভাল শিখিয়াছে! বস্তুতঃ ঠাকুরমার এই সব কাজে যেমন অবসর মত একটা বিষয়ে লিপ্ত থাকা চলে, সেই রকম বিনা খরচায় এক একটা খুব দর-

কারি কাজের জিনিসও তৈয়ার হইয়া যায়। ছেলেদের লেপ, কাঁথা আজকাল অনেক বাড়িতেই দরজির দোকান হ'তে তৈয়ার করিয়া আনে, সেকালে কিন্তু এমন ব্যবস্থা ছিল না, সাধারণ গৃহস্থ রমণীরা ঘরে ঘরে নিজেদের ব্যবহারের অনেক জিনিস স্বহস্তেই তৈয়ার করিয়া লইতেন। এখনও অনেক বাড়ীতে বিশেষ পল্লীগ্রামের মধ্যে এমন সুন্দর সুন্দর ছেলে-কাঁথা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা ফ্রেম দিয়া বাঁধাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, তার কারিকুরিই বা কত? দেখিলে মোহিত না হইয়া থাকা যায় না। সে বারের মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনীতে কয়েকখানা ছেলে-কাঁথা দেখিয়া কত বড় বড় মেম্-সাহেবও কত প্রশংসা করিয়া ছিলেন। একখানা কাঁথা নাকি কোন্ জায়গার কালেক্টার সাহেবের মেম ৩৫৲ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তাহা নাকি তিনি বিলাত লইয়া যাইবেন। বাস্তবিক সামান্য কাঁথার ভিতরেও বিস্তর কারিকুরি করা যায়!

ক্রমশঃ—

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

ভাস্কর্য্য।

(১৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর)

রথ,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি রথ আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন যান। রামায়ণ মহাভারত আদি সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই রথের বিষয় জানিতে পারা যায়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার গ্রন্থে অতি প্রাচীন কালের একখানি রথ-চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, সেটী খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৪৯৫ অব্দের একটী চিত্র হইতে গৃহীত। তিনি বলেন "The oldest Indian car of which we have a drawing occurs among the paintings of the reign of Thothmes III (B. C. 1495.) It is said to have been a present from a vanquished people of the name of *Rat-n-no* Sanskrit *Rathina* or '*Charioteers*,' who have been indentified by the late Henry Torrens, author of the *Scope and Use of Military Literature* with the Vedic Aryans of the Punjab" যাহা হউক আমরা এস্থলে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করণাভিলাষে পূর্ব্বোক্ত রথের অনুরূপ আর একটী প্রাচীন রথের চিত্র প্রদান করিলাম। এটী কলিকাতা মিউজিয়মে সংরক্ষিত শাঁচির ভাস্কর্য্য হইতে সংগৃহীত। ইহা একখানি প্রস্তরের উপর স্বল্পোন্নত ভাবে খোদিত আছে। এই চিত্র তাহারই প্রতিলিপি। ইহার নির্ম্মাণকালও অত্যন্ত প্রাচীন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অতি ন্যূনকল্পে খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৫০ অব্দে খোদিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

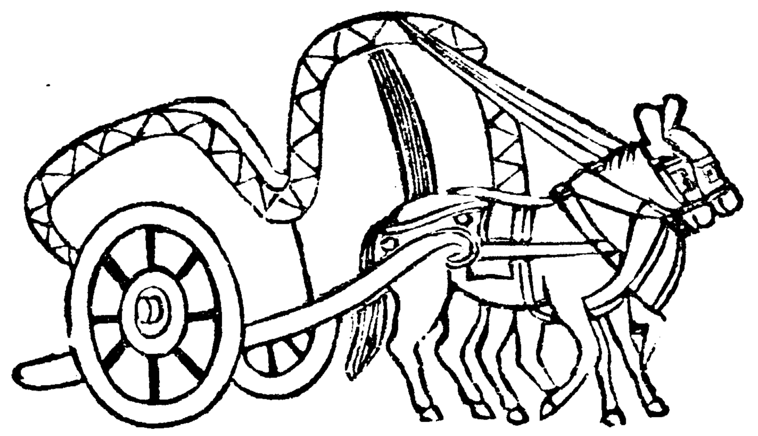

এই রথটী দ্বিচক্রবিশিষ্ট ও দুইটী অশ্বদ্বারা পরিচালিত, এবং ইহার পশ্চাদ্দিক আবরণবিহীন বা মুক্ত।

আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রাদির মধ্যে বিবিধ প্রকার রথের কথা লিখিত আছে, যথা—ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, একচক্র, দ্বিচক্র, বা বহুচক্র; ছত্র বিশিষ্ট, ধ্বজ বিশিষ্ট; এক-অশ্ব, দ্বিঅশ্ব ও ত্রিঅশ্ব-চালিত প্রভৃতি নানাবিধ রথের উল্লেখ আছে। সেই সমস্ত রথ সাধারণতঃ কাষ্ঠের দ্বারাই নির্ম্মিত হইত এবং সেই প্রাচীন ঋগ্বেদের সময় হইতেই আধুনিক 'টমটমের' ন্যায় আচ্ছাদন বিহীন রথ অধিক প্রচলিত ছিল, সেই সকল রথে বসিবার আসন চর্ম্মের দ্বারা গদির মত করিয়া প্রস্তুত হইত। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে এখন যেরূপ এক্কা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কালে সাধারণ রথের গঠন প্রায় ঐরূপই ছিল। মহাভারতের রথবর্ণনা পড়িলে সেইরূপই অনুমান হয়। এতদ্ব্যতীত সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট রথের বিবরণও রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে। পূর্ব্বোক্ত সাধারণ রথে আধুনিক এক্কার ন্যায় সারথি-ব্যতীত দুইজন ব্যক্তিই কোনরূপে বসিতে পারিত, ঋগ্বেদের মধ্যে অনেক-স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই অতীত যুগেও বৃহৎ বৃহৎ রথের ব্যবহার ছিল; সেগুলির বর্ণনা হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, তাহা বর্ত্তমান রথযাত্রার রথের ন্যায় আকারেই বিশাল দর্শন ছিল না। সেগুলি পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগামী ছিল এবং বহুব্যক্তির বসিবার জন্য তাহার মধ্যে বেঞ্চের ন্যায় তিনখানি দীর্ঘ আসন থাকিত। এই সকল রথ তখন প্রায়ই ত্রি-চক্র বিশিষ্ট হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যেও বৃহৎ রথের বর্ণনা আছে, তাহা মহারথদিগের বিবিধ আয়ুধপূর্ণ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইত।

বর্ত্তমান জগন্নাথের রথের ন্যায় সুমহান পর্ব্বত-প্রতিম বা সমুচ্চ মন্দিরসম রথের ব্যবহার আদৌ ছিল না। বাস্তবিক এরূপ রথ যুদ্ধক্ষেত্রে কখনই ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না; ইহা কেবল দেখিবার ও পূজা করিবারই উপযুক্ত। তবে বৈদিক্ কাল হইতে ক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধোপযোগী রথী ও মহারথগণের রথসমূহ বিবিধ বহুমূল্য উপাদানে গঠিত হইত। বৈদিক বা সত্যযুগে সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রময় রথের ব্যবহার ছিল, রামায়ণের সময় ত্রেতাযুগে পূর্ব্বোক্ত ধাতুর সহিত মণিমুক্তাও রথে খচিত হইত। দ্বাপরের শেষে মহাভারতের সময়ও রথী ও মহারথদিগের স্বাতন্ত্রতাসূচক বিবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট নানা উপাদানমূলক রথের প্রচলন ছিল।

ঋগ্বেদের মধ্যে সুবর্ণচক্র বিশিষ্ট যে সকল রথের উল্লেখ আছে, তাহাদের চক্রে সাধারণতঃ পাচটী করিয়া পাখী থাকিত, ক্রমে উহার সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, শাঁচীর প্রস্তর খোদিত রথে ১৬টী পাখী দেখা-গিয়াছে।

শুক্রনীতির মধ্যে রাজাদিগের রথলক্ষণ অংশে লিখিত আছেঃ—

লৌহসারময়শ্চক্র সুগমোমঞ্চকাসনঃ।৯২।
স্বাদোলায়িত রুঢ়স্ত মধ্যমাসন সারথিঃ।
শস্ত্রাস্ত্র সন্ধার্য্যদর ইষ্টচ্ছায়ো মনোরমঃ॥
এবংবিধোরথো রাজ্ঞা রক্ষ্যোনিত্যংসদশ্বকঃ।

সুগম লৌহসারময় চক্রযুক্ত, ও মঞ্চক আসন বিশিষ্ট, যাহা দোলায়িত অর্থাৎ কামানি বা স্প্রিং বিশিষ্ট এবং যাহাতে সারথি বসিবার জন্য মধ্যমাকৃতি আসন

আছে, যাহার মধ্যে শস্ত্রাস্ত্র রক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে, এবং উত্তম ছায়া প্রদায়ক চন্দ্রাতপ বা ছত্র আছে এবং দেখিতে অতীব মনোরম, রাজন্যবর্গ এইরূপ রথ উৎকৃষ্ট অশ্বসহ সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন।

রামায়ণ পাঠে জানিতে পারা যায়, সে কালে অশ্বের পরিবর্ত্তে গর্দ্দভদ্বারাও রথ পরিচালিত হইত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত ভগবান বিষ্ণুর রথ-বর্ণনায় অবগত হওয়া যায়—সুবর্ণনির্ম্মিত অতি সুন্দর রথ, চারিদিকে স্ফটিকনির্ম্মিত দর্পণে যেন সজ্জিত, তাহারও চতুর্দ্দিকে বিবিধ রত্নরাজি শোভিত, বহুমুল্য প্রস্তরময় স্তম্ভশীর্ষে মণিরত্নখচিত কলস, বিভিন্ন স্থানে সুন্দর শ্বেত চামর বিলম্বিত, শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত ও পারিজাত মাল্য ভূষিত সমানাকৃতি শত চক্রবিশিষ্ট অতি দ্রুত-গামী মনোহর রথ ছিল।

দেবীপুরাণের মধ্যেও এইরূপ রথের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক পুরাণাদি পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সে কালে নানা বিচিত্র বিধানে বহুমূল্য সামগ্রীনিচয়ে রথ নির্ম্মিত হইত। অনেকে বলেন পৌরাণিক অথবা সংস্কৃত কাব্যের অধিকাংশ বর্ণনাই সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত হইতে পারে, তথাপি সেই সকল বর্ণনার মধ্যে যে প্রাচীন কালের অনেক সত্য নিহিত আছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত নানা বিচিত্র বিধানে ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে যথেষ্টরূপ সজ্জিত না হইলেও মূলতঃ কিয়ৎপরিমাণেও যে তাহা নির্ম্মিত হইত তাহা নিশ্চিত। ভারতের অতি প্রাচীন সময়ে সেই সুস্থ আর্য্যগণের পক্ষে কোন কার্য্যই ত অসাধ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ যাহা পড়িয়া আছে, তাহার অনুসরণ করিবার শক্তিও যে আমাদের নাই!

আমরা এক্ষণে রথযাত্রা পর্ব্বোপলক্ষে যে সকল রথের আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা দেখিতে প্রায় একই ধরণের। কিন্তু সংস্কৃত প্রাচীন কোষসমূহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রথ ব্যবহৃত হইত তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামের উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ অমরকোষ অভিধানে দ্বৈপার রথের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র কৃত প্রাচীন শব্দাভিধানে অষ্টবিধ রথের উল্লেখ আছে এবং তাহা কোন্ কোন্ কার্য্যোপলক্ষে ব্যবহৃত হইত পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

১। শতাঙ্গ, ২। স্যন্দন বা স্যন্দনী রথ,—এই দুই প্রকার রথই সমরপ্রাঙ্গণে যুদ্ধার্থে ব্যবহৃত হইত; ৩। পুষ্পরথ,—ইহা বিহার বা ক্রীড়ার্থে প্রচলিত ছিল; ৪। মরুদ্রথ,—ইহা দেবযাত্রায় নিয়োজিত হইত; ৫। যোগ্যরথ বা বৈনয়িক নামক রথ একই প্রকার; এই রথে বিচারপতিরা আরোহণ করিতেন; ৬। পরিঘাতিক,—এই রথ পর্য্যাটনার্থে নিয়োজিত হইত; ৭। কর্ণীরথ,—ইহা প্রহরণার্থে এবং ৮। রথগর্ভক,—ব্যোমপথে বিচরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার রথের উল্লেখ আছে।

এই রথনির্ম্মাণ বিদ্যাকে বেদে অশ্বি-বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বাৎস্য বেদার্থী মহাশয় সাহিত্য-সংহিতামধ্যে এ সম্বন্ধে যেরূপ গভীর গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসার্হ। পাঠকগণের অবগতির জন্য

তাঁহার গবেষণালব্ধ বিষয়টী কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়তন হইলেও এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন আমি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

আচার্য্য যাস্কোদ্ধৃত নিরুক্তি-চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম আচার্য্যপ্রবর ঔর্ণবাভের নিরুক্তি, যথা:—"অথাতো দ্যুস্থানা দেবতাস্তাসামশ্বিনৌ প্রথমগামিনৌ ভবতোঽশ্বিনৌ যদ্ ব্যশ্নুবাতে—সর্ব্বং রসেনান্যো জ্যোতিষাঽন্যোঽশ্বৈরশ্বিনাবিত্যৌর্ণবাভস্তত্ কাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকেঽহোরাত্রা বিত্যেকে সূর্য্যচন্দ্রমসাবিত্যেকে ॥ নিঃ ১২।১ ॥"

অর্থাৎ বায়ু ও অগ্নিকে অশ্বি বলে, কারণ বায়ু ধনঞ্জয়রূপ ও অগ্নি বিদ্যুৎরূপ ধারণপূর্ব্বক সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত আছে। এইরূপে জল ও অগ্নিকেও অশ্বি বলা যায়, কেন না অগ্নি জ্যোতিঃরূপে এবং জল রসরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। (অশ্বৈঃ) অর্থাৎ ইহার বেগাদিগুণবিশিষ্ট। যাঁহার বিমানাদি যানসিদ্ধির ইচ্ছা হইবে, তাঁহার বায়ু, অগ্নি ও জলদ্বারা উহা সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য, ইহাই আচার্য্য ঔর্ণবাভের মত। অপর কোনও ঋষি বলেন—অগ্নির জ্বালা ও পৃথিবীকে অশ্বি বলা যায়; কারণ পৃথিবীর বিকারস্বরূপ অলাতশিলা (Coal), কাষ্ঠ ও লৌহাদি দ্বারা কলাযন্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চালাইলেও অনেক প্রকার বেগবান্ যান চালিত হয় এবং আরও বিবিধ শিল্পকার্য্য সাধিত হইতে পারে। পুনশ্চ অন্য কতিপয় বিদ্বানের মত এইরূপ (অহোরা০০) দিবস ও রাত্রিকে "অশ্বি" বলে, যেহেতু দিবা রাত্রেই উক্ত পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে এবং এই সংযোগ ও বিয়োগ হইতে বেগ উৎপন্ন হয়। আবার কোনও শিল্পবিদ্যাবিশারদ বলেন—(সূর্য্যচন্দ্রমসৌ) সূর্য্য ও চন্দ্রমাই "অশ্বি", কারণ উহাদেরই আকর্ষণাদি গুণের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি সংযোগ, বিয়োগ, ক্ষয়, বৃদ্ধি ইত্যাদিরূপ বিবিধ শ্রেষ্ঠগুণ উৎপন্ন হয়।

তথাশ্বিনৌ চাপিভর্ত্তারৌ জর্ভরীভর্ত্তারাবিত্যর্থস্তুর্ফরীতু হন্তারৌ ॥ উদন্যজেবেত্যুদকজে ইব রত্নে সামুদ্রে ॥ নিরু অ ৩, খ ৫ ॥

এবম্ জর্ভরী ও তুর্ফরী অর্থেও অশ্বি শব্দ ব্যবহৃত হয়। কারণ জর্ভরী অর্থে বিমানাদি যানের ভর্ত্তা ধারণকারী; এবং তুর্ফরী অর্থে কলাযন্ত্রের হন্তা—ইহা দ্বারা বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর বিকারাদিকে যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, বিমানাদি যানের ধারণ, পোষণ ও গমনবেগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেরূপ ঘোটক ও বলীবর্দ্দকে কশাঘাত করিলে, সে বেগে ধাবিত হয়, তদ্রূপ কলা-কৌশলদ্বারা বায়ু, জল ও অগ্নি আদিকে কলাযন্ত্রে প্রেরণা করিলে, বিবিধ শিল্পবিদ্যা সিদ্ধ হইয়া থাকে। (উদন্যজে) অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি ও জলের প্রয়োগদ্বারা সুখে সমুদ্রে গমনাগমন করা যায়। অতঃ অশ্বি—বায়ু, স্থূল-অগ্নি ও সূক্ষ্ম-অগ্নি = বিদ্যুৎ, জল, অগ্নি-জ্বালা, পৃথিবীর বিকার, দিবারাত্রি, সূর্য্যচন্দ্র, জর্ভরী তুর্ফরী। ইহাদের আরও অর্থ আছে, তাহা অত্র প্রকাশ অনাবশ্যক। এক্ষণে দেখা যাউক, মূল বেদ অশ্বি-বিদ্যার বিষয় কি বলেন—

১ম, মণ্ডল, ৩য় সূক্ত, ১৯শ মন্ত্র;—"অশ্বিনৌ দেবতে" মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ—

অশ্বিনা যর্জরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী পুরুভুজা চনস্যতম্ ॥১৯॥

অন্বয় :—হে বিদ্বাসো যুস্মাভির্দ্রবৎপাণী শুভস্পতী পুরুভুজাবশ্বিনৌ যজ্বরীরিষশ্চ চনস্ততম্॥

হে বিদ্বদ্বর্গ (দ্রবৎপাণী) শীঘ্র বেগোৎপাদক ও বিবিধ ব্যবহারসিদ্ধিকারী (শুভস্পতী) বিবিধ কল্যাণকর শিল্পসাধক (পুরুভুজা) বহুবিধ খাদ্য-পেয়দাতা এবং বহুহস্তবৎ কার্য্যক্ষম (অশ্বিনৌ) জল ও অগ্নি তথা (যজ্বরী) শিল্পবিদ্যাসম্পাদক (ইষঃ) কার্য্য (চনস্ততম্) অন্নের তুল্য প্রীতিসহকারে সেবন কর।

এই মন্ত্রে অশ্বি-বিদ্যা এবং অন্যবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা যে, বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তথা "অশ্বিনৌ"কে শীঘ্র বেগোৎপাদক, বিবিধ ব্যবহারসিদ্ধিকারী শিল্পসাধক এবং খাদ্যাদি-দাতা ও অসংখ্যহস্তবৎ কার্য্যকারী বলা হইয়াছে। ইহার গুণ যন্ত্রে (Engine) নিযুক্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ হয়॥

২০শ মন্ত্র—অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া। ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ॥

হে মনুষ্য! তোমরা (পুরুদংসসা) বিবিধশিল্প-বিত্থাসিদ্ধক (বিষ্ণ্যা) যানাদির তীব্র বেগোৎপাদক (নরা) শিল্পবিত্থা ফলপ্রপাক (শবীরয়া) বেগবতী (ধিয়া) ক্রিয়া দ্বারা শিল্পে নিয়োগযোগ্য যে অগ্নি ও জল উহা (গিরঃ) শিল্পবিত্থাপ্রচারিণী বাণী দ্বারা (বনতম্) সেবন কর।

এই মন্ত্রে—শিল্পবিত্থা অধ্যাপন, অধ্যয়ন ও শ্রবণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং অশ্বিনৌকে "পুরুদংসসা"—শিল্পসাধক, "ধিষ্ণ্যা"—তীব্র বেগোৎপাদক বলা হইয়াছে।

২১শ মন্ত্রঃ—দস্রৌ যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ। আ যাতং রুদ্রবর্ত্তনী॥

হে (যুবাকবঃ) সম্পাদিত, মিশ্রিত ও অমিশ্রিত ক্রিয়াসিদ্ধিকারী, (সুতাঃ) পদার্থবিদ্যাসার-প্রকাশক (বৃক্তবর্হিষঃ) শিল্পফলনিষ্পাদক ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা (রুদ্রবর্ত্তনী) প্রাণমার্গগামী (দস্রা) গমনাদিদুঃখনাশক (নাসত্যা) সত্যকর্ম্মগুণবান্ (আয়াতম্) অশ্বিকে ব্যবহারে আনিয়া সুখী হও। এই মন্ত্রস্থ "দস্রৌ" পদ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উহা চালনাদির কষ্টনাশক। বিশেষতঃ জগদীশ্বর অশ্বিকে ব্যবহারে আনিতে উপদেশ দিয়াছেন।

১ম। ২২ সূক্ত—১মন্ত্র—কাণ্বোমেধাতিথিঋষিঃ
অশ্বিনৌ দেবতে—

প্রাতর্যুজা বিবোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্।
অস্য সোমস্য পীতয়ে॥

হে বিদ্বন্! (প্রাতর্যুজা) শিল্পসিদ্ধ যন্ত্রকলায় প্রথম বলদায়ক (অশ্বিনৌ) অগ্নি ও জল (ইহ) এই শিল্পব্যবহারে (গচ্ছতাম্) প্রাপ্ত হইতেছে, এই হেতু উহাদিগকে (অস্য সোমস্য) উৎপন্নকরণ-যোগ্য সুখ সমূহের (পীতয়ে) লাভের জন্য আমাদিগকে (বিবোধয়) বিশেষরূপে বিদিত করান।

এই মন্ত্রে অশ্বিকে "প্রাতর্যুজা" অর্থাৎ যন্ত্রের প্রথম বেগ-উৎপাদক বলা হইল। অশ্বিবিদ্যাবিদের নিকট তদুপদেশ গ্রহণও অনুশিষ্ট হইয়াছে।

২য় মন্ত্র—যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা। অশ্বিনা তা হবামোহে॥

আমরা (যা) যে (দিবিস্পৃশা) আকাশমার্গে বিমানাদি যানদ্বারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে

শীঘ্রগামী (রথীতমা) নিরন্তর বিবিধ প্রশংসনীয় রথ-সিদ্ধিকারী (সুরথা) উত্তম রথচালনসহায় (দেবা) দিব্য-প্রকাশাদি গুণবান্ (অশ্বিনৌ) জল ও অগ্নি (উভয়) এক অন্যের সহিত সংযোজ্য এই দুইটীকে (হবামহে) গ্রহণ করি। অত্র অশ্বিনৌকে "দিবিস্পৃশা" "রথীতমা" "সুরথী" "দেবা" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করায় উহার অর্থ স্বয়ং বেদই সুপ্রকাশিত করিয়াছেন। অতঃ "অশ্বিনৌ" যে রথচালনসহায় এবং আকাশগামী পোতবাহী তাহাও বুঝা গেল।

৪র্থ মন্ত্র—নহি বামস্তি রকে দূরকে যত্রারথেন গচ্ছথঃ অশ্বিনা সোমিনো গৃহম্॥

হে রথচালক ও পালক! তোমরা যদি (যত্র) (অশ্বিনা—রথেন) অগ্নি ও জল এই দুইটীর সংযোগে বাষ্পপরিচালিত রথে (সোমিনঃ) পদার্থবিত্থাবিদের (গৃহম্) গৃহে (গচ্ছথঃ) যাও, তাহা হইলে উহা দূরবর্ত্তী হইলেও (বাম্) তোমাদের পক্ষে (দূরকে নহি) দূর বলিয়া বোধ হইবে না।

এই মন্ত্রে অশ্বি-রথের গুণ স্তুত হইয়াছে। ১মণ্ডল, ২৯ সূক্ত, ১৭ মন্ত্র অশ্বিনৌ দেবতে।

অজীগর্ত্তিঃশুনঃশেফ ঋষিঃ—

অশ্বিনাবশ্বাবত্যেষ যাতং শবীরয়া!
গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ।

হে (দস্রা) দারিদ্র্য নাশক (অশ্বিনৌ) ক্রিয়াকুশল-শিল্পি! তোমরা (ইষা) ইচ্ছিত (অশ্ববত্যা) বেগাদি-গুণযুক্ত (শবীরয়া) দেশান্তরপ্রাপিকা গতিসহ (হিরণ্যবৎ) লোহাদি বিবিধসাধননির্ম্মিত (গোমৎ) ধন ও সুখপ্রাপক বহু ক্রিয়াপূর্ণ রথ (আযাতম) উত্তমরূপে দেশান্তরে পঁহুছাও।

অত্র আদিষ্ট হইয়াছে যে, যন্ত্র (Engine) হিরণ্য-লোহাদি দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে; এবং তৎসাহায্যে "শবীরয়া" দেশান্তরে গমন করিতে হইবে; তাহা হইলে উহা-দ্বারা "গোমৎ" ধন ও সুখ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

১৮শ মন্ত্র :—সমান যোজনো হি বাং রথো দস্রাবমর্ত্ত্যঃ সমুদ্রে অশ্বিনেয়তে॥

হে (দস্রৌ) জীবের পথশ্রান্তিহারক (অশ্বিনা) অশ্বতুল্য শিল্পি! তোমাদের (বাম্) উভয়ের সিদ্ধ (সমযোজনঃ) সমান শক্তিযুক্ত বা চালিত (অমর্ত্ত্যঃ, রথঃ) অশ্বনামক মর্ত্ত্যপ্রাণীবিরহিত অমর অশ্বচালিত যে রথ (সমুদ্রে) জলপূর্ণ সাগরে বা অন্তরীক্ষে (ঈয়তে) গমন করে, তাহা (অশ্বভ্যা) বেগাদিগুণযুক্ত (শবীরয়া) দেশান্তরপ্রাপিকা গতির সহিত সাগর-পার গমনের জন্য সিদ্ধ কর।

অত্র অশ্বিরথকে পথঃক্লেশহারক, অমর্ত্ত্য অশ্ব-চালিত "অমর্ত্ত্যরথ" বলা হইল।

১৯শ মন্ত্র :—ন্য ১ ঘ্নাস্য মূর্ধান চক্রং রথস্য যেমথুঃ। পরিদ্যামন্যদীয়তে।

হে (অশ্বিনৌ) শিল্পবিত্থাবিদ্ তোমরা (অঘ্নস্য-রথস্য) অবিনাশ্য রথের (মূর্দ্ধনি) উত্তমাঙ্গ অগ্রভাগে একটী ও (অন্যৎ) নিম্নে এক একটী কলাযন্ত্র নির্ম্মাণ কর; সমুদ্রে (দ্যাম্) আকাশে (নিযেমথুঃ) ও দেশান্তরে উক্ত কলাচক্রযুক্ত রথ (ঈয়তে) পঁহুছায়!

এখানে "অঘ্ন্যরথঃ" অর্থাৎ অশ্বিরথকে বিশেষরূপে রক্ষার উপদেশ রহিয়াছে এবং উহা যে আকাশ ও সমুদ্রে ভ্রমণ বিষয়ে সহায়ক তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ যন্ত্র (Engine)এর পরিচালন জন্য উহার

মূর্দ্ধা ও নিম্নে "কলা" স্থাপনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত, ১মন্ত্র; হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস ঋষিঃ অশ্বিনৌ দেবতে।

ত্রিশ্চিন্নো অদ্যা ভবতং নবেদসা বিভুর্বাং যাম উত রাতিরশ্বিনা। যুবোর্হি যন্ত্রং হিম্যেব বাসসো ইভ্যায়ং সেন্যা ভবতং মনীষিভিঃ।

এই মন্ত্রের অর্থ এই যে—বিদ্বান্‌গণ যেরূপ পৃথিবীর বিকার হইতে যান, কলা, কীলক, চক্র, যন্ত্রাদি রচনাপূর্ব্বক উহাতে অগ্নি ও জল সংযোগদ্বারা জল-স্থল-নভোমণ্ডলে গমনাগমন করেন, আমাদেরও তদ্রূপ করা কর্ত্তব্য। কারণ অশ্বিবিদ্যাই দারিদ্র্যনাশক ও শ্রীবর্দ্ধক। সুতরাং (হিম্যেব বাসসা) হেমন্তে লোকে বস্ত্র ব্যবহার যেরূপ উত্তম করে, যানকেও তদ্রূপ সর্ব্বদা যন্ত্র, কলা, কীলক, চক্র, অশ্বি আদি দ্বারা সুযুক্ত করা চাই। এখানে 'যন্ত্রম্" যন্ত্রাতে যন্ত্রয়ন্তি সংকোচয়ন্তি বিলিখন্তি চালয়ন্তি বা যেন তৎ, যদ্দ্বারা রথ অগ্রে ও পশ্চাতে চালিত, স্তম্ভিত আদি হয়; সুতরাং যন্ত্র অর্থে "এঞ্জিন।" এই যন্ত্র-চালিত রথ কেমন? উঃ—"বিভুঃ" সুবৃহৎ এবং ভু, খ ও জলচর।

২য় মন্ত্র—ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমসঃ বেনামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ। ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ স্কম্ভিতাস আরভে ত্রির্নক্তং যাথস্ত্রির্বশ্বিনা দিবা।

এক্ষণে অশ্বিরথ নির্ম্মাণের বিষয় কথিত হইতেছে—(ত্রয় পবয়ো মধু) এই অশ্বিরথে তিনটী চক্র বা নেমি থাকিবে, যদ্দ্বারা উহা জল ও পৃথিবীর উপর দিয়া গতায়াত করিতে পারে, এবং উহা যেন প্রচুর বেগশালী হয়। উহার সমান অঙ্গগুলি বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হইবে, কলাযন্ত্রও সুদৃঢ় হইবে, তাহা হইলে উহা শীঘ্র গমনে সমর্থ হইবে। (ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ) পুনশ্চ উহাতে তিন তিনটী স্তম্ভ এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহার আধারে সমস্ত কলাযন্ত্রগুলি সংযুক্ত থাকিতে পারে; এবং (স্কভিতাসং) ঐ স্তম্ভ পুনঃ অপর কাষ্ঠ বা লৌহের সহিত সংলগ্ন থাকিবে (আরা) আরা অর্থাৎ যা নাভীর সমান মধ্যকাষ্ঠ, তাহাতেই সমস্ত কলাযন্ত্র সংযুক্ত থাকিবে, কারণ এই নাভীযন্ত্র সাহায্যে ভ্রামিত হইয়াই রথ চালিত হইবে। (বিশ্বে) সকল শিল্পী ও বিদ্বানেরই এই অশ্বি-যান সিদ্ধি বা প্রস্তুতের বিষয় অবশ্য জ্ঞাত হওয়া দরকার। (সোমস্য বেনাম্) এই রথদ্বারা সুন্দর সুখকামনা সিদ্ধ হয়, (রথে) এবং এই রথ-আরোহণে বিবিধ ক্রীড়াসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (আরভে) এরূপ রথের আরম্ভণে (প্রস্তুত করণে) অশ্বি অর্থাৎ অগ্নি ও জলই মুখ্য বস্তু। (ত্রির্নক্তং যামেস্ত্রির্বশ্বিনাদিবা) এবং এই যানদ্বারা তিন দিবা ও তিন রাত্রে লোকে দ্বীপ-দ্বীপান্তরে যাইতে সমর্থ হইবে।

এই মন্ত্রে এঞ্জিন ও রথ নির্ম্মাণের প্রণালী সুন্দর সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এবং এই মন্ত্রস্থ "ত্রয়ঃ পাবয়ঃ" "মধুবাহনে রথে" "ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ" "স্কভিতাস" "ত্রির্নক্তং যাথস্ত্রির্বাশ্বনা দিবা" এই অংশ কয়টীর অর্থ দর্শন করিলে, বাষ্পযান-বিদ্যা যে বৈদিক, তদ্বিষয়ে কণামাত্রও সন্দেহ থাকিবার উপায় নাই।

৪র্থ মন্ত্র—"ত্রিধেব শিক্ষতম্"—যান চালন, স্তম্ভন ও রচন শিক্ষা দাও॥

৫ম মন্ত্র—"ত্রির্নোরয়িং বহতমশ্বিনা" "ত্রিরুত-

প্রবাংস" "আরুহদ্রথম্" এই কয় অংশ চিন্তনীয়। ইহাদের অর্থ—(১) হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের পদার্থ-রূপ ধন বহন কর; (২) সদ্‌গ্রন্থ ও রত্নাদি ধন বহন কর। রথ আরোহণ করিও। রুহৎ—রোহেৎ। অত্র কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসি ইতি স্লেরঙ্। বহুলং ছন্দস্য মাঙ্‌যোগেপীত্যড়ভাবোললঙর্থেলুঙ্ চ॥ ইতি পাণিনিঃ॥ এই মন্ত্র হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, দেবতাতৌ—রথচালকদ্বয়; অর্থাৎ গার্ড ও ড্রাইভার ঋত্বিজৌ, দেবতাতৌ॥

৬ষ্ঠ মন্ত্র—"পার্থিবানি দত্তম্" "ত্রির্নো অশ্বিনা ত্রিধাতু শর্মবহতং" ইহার এই অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য। পার্থিব=পৃথিবীর বিকাররূপ কাষ্ঠ বা পাথুরে কয়লা-দ্বারা উত্তাপ উৎপাদন। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের লৌহ, তাম্র ও পিত্তলনির্ম্মিত গৃহবৎ রথ বহন কর; শর্ম্ম—গৃহ। নিঘণ্টু।

৭ম মন্ত্র—ত্রির্নো অশ্বিনা যজতা দিবে দিবে পরি-ত্রিধাতু পৃথিবীমশায়তম্। তিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতম্॥

পুনশ্চ অশ্বিরথ কিরূপে প্রস্তুত করা যায়, তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে;—(ত্রির্নো অশ্বিনা যজতা ০ ০ ০) (পৃথিবীমশায়তম্) অর্থাৎ যে যানাদিদ্বারা আমরা ভূমি, জল ও আকাশে প্রতিদিন আনন্দে বিচরণ করিতে পারি, (পরিত্রিধাতু পৃ ০ ০) উহা তাম্র, লৌহ ও রৌপ্যাদি তিনরূপ ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত হয়। এবং (রথ্যাপরাবতঃ) যেরূপ নগর বা গ্রামের গলি রাস্তা দ্বারা কোনও স্থানে অতি সহজে ও শীঘ্র যাতায়াত করা যায়, তদ্রূপ দূর দেশে উপরোক্ত যান দ্বারা সত্বর গতায়াতে সমর্থ হওয়া যায়। (নাসত্যা) এইরূপে যানাদি পূর্ব্বোক্ত অশ্বি বলে, অতি বৃহৎ বৃহৎ কঠিন মার্গেও শীঘ্র এবং সুগমতার সহিত পরিচালনার্থ প্রস্তুত করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য; (আত্মেব বাতস্ব) মনের ন্যায় দ্রুতগামী যানাদিদ্বারা প্রতিসুখে ভূগোলমধ্যে বিচরণ করিবে। রথ্যা—রথগমনপথ—রেল-রোড।

৯ম মন্ত্র—ক্ব ১ ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ব ১ ত্রয়োবন্ধুরো যে সনীড়া। কদাযোগো বাজিনো রাসভস্য যেন যজ্ঞং নাসত্যোপযাথঃ॥

হে (নাসত্যা) সত্যগুণ ও স্বভাববান্ শিল্পীদ্বয়! তোমরা [কদা] কবে [যজ্ঞম্] বিমানাদি অশ্বিযানে আরোহণ পূর্ব্বক গমনাগমনযোগ্য মার্গদ্বারা [উপ-যাথঃ] শীঘ্র অভীষ্ট স্থানে যাইবে? এবং [যেন] যে রথদ্বারা যাইবে, তাহা [রাসভস্য] রাসভবৎ শব্দ-কারক [বাজিনম্] প্রশংসনীয় বেগবান্ [ত্রিবৃতঃ] রথচালনাদিদ্রব্যপূর্ণ [রথস্য] ভূমি, জল ও অন্তরীক্ষ-গামী বিমানে [ক্ব] কোথায় [ত্রী, চক্রাঃ] তিন চক্র রচনা করা দরকার? এবং এই রথে [যে, সনীড়াঃ] যে বন্ধনস্থান বা অগ্ন্যাগার [বন্ধুষঃ] ও নিয়মপূর্ব্বক চালনার্থ যে প্রকোষ্ঠ, উহার [যোগঃ] স্থাপন বা রচনা [ক্ব] কোথায় করা যাইবে?

ভাবার্থ—এই মন্ত্রে কথিত প্রশ্নত্রয়ের উত্তর এইরূপ জানিতে হইবে—বিভূতিকামী পুরুষের ইহাই কর্ত্তব্য যে, রথের আদি, মধ্য ও অন্তে কলাবন্ধনের আধারের জন্য তিনি বন্ধন বিশেষ সম্পাদন করিবেন; এবং তিনটী কলা ভ্রমণ ও ভ্রামণের জন্য সম্পাদন করিবেন। আর মানবের উপবেশন, অগ্নিস্থাপন ও জলরক্ষণ জন্য এই তিনটী কোষ্ঠ অন্ততঃ রচনা

করিবে। তথা স্থানান্তর গমনের ইচ্ছা হইলে জল, কাষ্ঠ ও অগ্নিদ্বারা বাষ্প উৎপাদনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সুদূর স্থানেও নিকটবৎ সত্বর গমনে সমর্থ হইবে। কারণ এইরূপ না করিলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে সত্বর স্থানান্তরে যাইতে পারে না।

এই মন্ত্রে জানিতে পাইলাম রথে অগ্নি, জল ও মানবের জন্য প্রকোষ্ঠ রাখিতে হইবে, এবং ঐ রথের শব্দ "কর্কশরাসভবৎ" হইবে। দেখুন বর্ত্তমান এঞ্জিনের সহিত ইহার মিলন আছে কি না?

১০ম মন্ত্র—অগ্নি উৎপাদক দ্রব্য এঞ্জিনে দরকার; উহাকে বৈদিক ভাষায় "হবিঃ" বলা হইয়া থাকে। "ঘৃতবন্তম্ চিত্রম্ রথম্" বহু জলপূর্ণ বা জীবপূর্ণ আশ্চর্য্য বেগাদিগুণান্বিত চিত্রিত রথ। সুতরাং হবিকে কাষ্ঠ ও কয়লা ইত্যাদি বলা যাইতে পারে।

১১শ মন্ত্র—আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা। প্রায়ুস্তারিষ্টং নীরপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সঞ্চাভুবা॥

হে শিল্পি! তোমরা উভয়ে (নাসত্যা) সত্যগুণ-স্বভাবযুক্ত (সচাভুবা) মিলনকারক জল ও অগ্নিবৎ (দেবেভিঃ) বিদ্বানদিগের সহিত (ইহ) এই উত্তমরথে বসিয়া (ত্রিভিঃ) তিন অহোরাত্রে মহাসমুদ্র পার হও; এবং (একাদশৈঃ) ১১শ অহোরাত্রে ভূগোলের অন্তে (যাতম্) যাও। তথা (দ্বেষঃ) শত্রু ও (রপাংসি) পাপ (নির্মক্ষতম্) সর্ব্বথা দূরীভূত কর; (মধুপেয়ম্) মধুরগুণযুক্ত পানীয় ও (আয়ুঃ) আয়ু (প্রতারিষ্টম্) প্রযত্নে বৃদ্ধি কর ও বিবিধ সুখ (সেধতম্) সিদ্ধকর, আর শত্রুজয়ী (ভবতম্) হও।

এই মন্ত্রস্থ "ত্রিভিরেকাদশৈরিহদেবেভির্যাতম্" এই অংশটী হইতে সাগর পার ৩দিনে এবং সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ যে ১১ দিনে অশ্বিরথদ্বারা শেষ করিতে পারা যায়, তাহাই ব্যক্ত হইতেছে।

১২শ মন্ত্র—"আনো অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেনার্বাঞ্চ রয়িং বহতং সুবীরম্"—"বৃধে চনো ভবতং বাজ সাতৌ॥" এই অংশদ্বয় গৃহীত মন্ত্রে চিন্তনীয়। অর্থ—হে যানচালকদ্বয়! জল স্থল ও অন্তরীক্ষে পূর্ণ-গতিতে যাইবার জন্য বর্ত্তমান রথদ্বারা আমাদিগকে উপর হইতে অভীষ্ট নিম্নস্থানে লইয়া চল এবং যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত এই বীরবৃন্দ ও ধনসমূহ তথায় বহন করিয়া লইয়া চল। এই মন্ত্রে যুদ্ধ-রথ বিষয়ে উক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। ২য় অংশের অর্থ এই—সংগ্রামে আমাদিগকে বিজয় দিও। ইহা দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যুদ্ধে "অশ্বি-রথ" সহায়ক ছিল।

১মণ্ডল, ৩৭সূক্ত, ১মন্ত্র—ঘোরঃকণ্বঋষিঃ
মরুতো দেবতা।

ক্রীড়ং বঃ শর্ধো মারুতমনর্বাণং রথে শুভম্।
কণ্বা অভি প্রগায়ত॥

অন্বয়ঃ—হে কণ্বা মেধাবিনো বিদ্বাংসো যূয়ং যদ্বোনর্বাণং রথে ক্রীড়ং ক্রিয়ায়ং শুভমারুতং শর্ধোঽস্তি তদভিপ্রসায়ত।

হে বিদ্বন্মণ্ডলি! যে বাষ্পদত্তবলদ্বারা অশ্বহীন রথ চালিত হয়, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন।

এই মন্ত্রস্থ "অনবাণং রথে" (মারুতম্ শাধঃ) এই অংশদ্বয় মন্তব্য।

সায়ণাচার্য্য [মারুতম্] এই পদ [তস্যেদম্] এই সূত্রদ্বারা অণ্ প্রত্যয়, ও ব্যত্যয় করিয়া আদ্যুদাত্তস্বর-

সংযোগপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অশুদ্ধ জানিতে হইবে। মোক্ষমূলর সাহেবও এই মন্ত্রস্থ "অর্ব" শব্দের অদ্ভুত অর্থ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র "অর্ব" শব্দের অশ্ব অর্থ করিয়া, কেবল এই মন্ত্রস্থ "অর্ব" শব্দে অশ্ব গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন! আশ্চর্য্য বটে! হয়ত পাছে ভারতীয়গণও যে পশুরূপহীন "মারুতন্ শর্ধঃ" বাষ্পবেগরূপ অশ্বদ্বারা রথ চালনা করিত, এই কথা স্বীকার করিতে হয়, সেই জন্য তিনি এই কৌশলাবলম্বন করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার অর্থ আবার অধিকতর ভ্রমাত্মক।

১ম মণ্ডল, ৩৮সূ, ১২ মন্ত্র, ঘোরঃকণ্বঋষিঃ
মরুতো দেবতা।

স্থিরা বঃ সন্তু নেমথো রথ অশ্বাস এষাম্
সুসংস্কৃতা অভীশথঃ॥

হে বিদ্বান্ মনুষ্য! তোমাদের এই মরুতদ্বারা সংস্কৃত ও চালিত, কলাচক্রযুক্ত রথ মার্গব্যাপক অগ্নি আদি তুরঙ্গবৎ দৃঢ়বলযুক্ত হউক।

এই মন্ত্রস্থ "অশ্বাসঃ" পদ হইতে সিদ্ধ হইতেছে, উহা অশ্বি নামক অনশ্ব তুরঙ্গ চালিত; এবং এই মন্ত্রের দেবতা মরুত বলিয়া, "এষাম্" পদটী তাহার বাচক, সুতরাং এই মন্ত্রে বাষ্পদ্বারা রথ চালনার মন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে।

১ম, ৩৯ সূ, ৬ মন্ত্র, ঘোরপুত্রঃ কণ্ব
ঋষিঃ মরুতো দেবতা।

উপো রথেষু পৃষতীরযুগ্ধং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ।
আবো যামায় পৃথিবী চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ।

হে [মানুষাঃ] বিদ্বান্ লোকগণ! তোমরা [বঃ] স্বকীয় [যামায়] স্থানান্তরে গমনার্থ [পৃষ্টিঃ] প্রশ্নোত্তরাদি বিদ্যাব্যবহারদ্বারা বিদিত [রোহিতঃ] রক্তগুণবিশিষ্ট অগ্নির বেগাদি গুণসমূহ [রোহিতোগ্নে-রিত্যাযোজনামদিষ্টো পঠিতম্-নিঘন্টু ১।৩] পৃথিবী স্থল জল ও অন্তরীক্ষে যাহাকে [উপবহতি] উত্তমরূপে বহন করে ও যাহার শব্দ [অশ্রোৎ] শ্রবণ করিয়া (অভীয়ন্ত) ভয় প্রাপ্ত হয়, সেই (রথেষু) রথসমূহে (পৃষতীঃ) (পর্ষন্তি সিঞ্চন্তি যাভিস্তাঃ শীঘ্রগতীঃ মরুতাং ধারণবেগাদয়োইশ্চঃ; পৃষত্যো-মরুতামিত্যাদিষ্টোপয়োজন-নামৎসু-পঠিতম্। নিঘং ১।১৫।) ধারণ ও বেগাদি গুণবান্ মরুত—বাষ্পরূপী অশ্ব (অযুগ্ধম্) যুক্ত কর।

এই মন্ত্রে যে রথের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গমনকালে সুগভীর শব্দ হয় এবং সেই শব্দে জীবকুল ভীত হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই রথ পর্ষতী—বাষ্প দ্বারা চালিত হয়।

৪৬ সূ, ৩ম, প্রকণ্ব ঋষিঃ, অশ্বিনৌ দেবতে।

"অধি বিটপি যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ"।

তোমাদের নির্ম্মিত পক্ষীতুল্য রথ অন্তরীক্ষে চলুক। এই মন্ত্রে বিমানের কথা বলা হইয়াছে।

৭ম মন্ত্র—আনো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে। যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম্। হে [অশ্বিনা] চালক ও রক্ষকদ্বয় আপনারা উভয়ে [মতীনাম্] (নাবা) নৌকা দ্বারা সাগরাদির পার গমনার্থ (নঃ) আমাদের (রথম্) বিমানাদি রথসমূহ (যুঞ্জথাম্) যুক্ত করিয়া চালাও।

সাগরাদি পার হইবার জন্য নৌ এবং স্থলগমনের জন্য রথ, আর খ-গমনার্থ বিমান প্রস্তুত করা দরকার ইহাই ঈশ্বরের আদেশ।

৮ম মন্ত্র।--অরিত্রং বাং দিবাপৃথুতীর্থে সিন্ধুনাং রথঃ। ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ॥

(অরিত্রম্) অরিত্র অর্থাৎ স্তম্ভনার্থে যে যন্ত্র প্রস্তুত করা যায়. (তীর্থে দিবাপৃথু সিন্ধুনাং) তাহা বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র ও নদীর এক পার হইতে পরপারে যাইবার অতি শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ। এবং ঐ রথ বিস্তীর্ণ আকাশ ও সমুদ্রে যাতায়াতের উত্তম উপায়-স্বরূপ। এইরূপ রথের যন্ত্র যিনি সিদ্ধ করেন, তিনি নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হন। (ধিয়া যুযুজ্র) এইরূপ তিন প্রকার যান মধ্যে (ইন্দবঃ) বাষ্পবেগ জন্য এক জলাধার প্রস্তুত করিয়া তম্মধ্যে জল সেচন কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই তখনই যান বেগে গমন করিতে সমর্থ হইবে।

"অরিত্র" শব্দের অর্থ যানস্তম্ভন বা জল ও বাষ্পের পরিমাণ সাধন—যথাহ দয়ানন্দ—'যানস্তম্ভ-নার্থ জলগাধ গ্রহণার্থং বা লোহময়ং সাধনম্"॥ ঋঃ ভাঃ॥ সুতরাং অরিত্র—যানস্তম্ভন, জল ও বাষ্প-পরিমাপক যন্ত্র।

৫২ সূক্ত, ১মন্ত্র, আঙ্গিরসঃ সব্য ঋষিঃ
ইন্দ্রোদেবতা।

তাং সুমেঘং মহয়া সর্ব্বিদং শতং যস্য সুভ্বঃ মাকমীরতে। অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমেন্দ্রং ববৃত্যামাবসে সুবৃক্তিভিঃ॥

[যস্য] যে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত সভাধ্যক্ষের [শতম্] অসংখ্যাত [সুভ্বঃ] সুখকর দ্রব্যোৎপাদক শিল্পী [সুবৃক্তিভিঃ] দুঃখহারী কার্য্য দ্বারা [সাকম্], [অত্যম্] [ন] ও অশ্ববৎ অগ্নিজলাদিদ্বারা [অবসে] রক্ষণার্থ [হবনস্যদম্] আকাশমার্গপ্রাপক [বাজম্] বেগযুক্ত [ইন্দ্রম্] ঐশ্বর্য্যদাতা [স্বর্বিদম্] আকাশগামী [রথম্] বিমানাদি যান [ঈরতে] প্রাপ্ত হয় ও যাহাতে আমি [ববৃত্যাম্] রহিয়াছি; [তাম্] সেই [মেষম্] সুখ-বর্ষককে [সুমহয়] উত্তমরূপে সৎকার কর।

বাজম্—গতি, Speed; এই মন্ত্রে "অত্যম্. ন" পদ হইতে বুঝা যায় অশ্ববৎ কোনও বেগগামী পদার্থ-দ্বারা রথ চালান যাইতে পারে। "স্বর্বিদম্ রথম্"—বিমান—Baloon, Airo-plane ইত্যাদি।

১ মণ্ডল, ১০৮ সূক্ত, ১ম মন্ত্র, ইন্দ্রাগ্নী
দেবতে আঙ্গিরসঃ কুৎসঋষিঃ।

য ইন্দ্রাগ্নী চিত্রতমো রথো বামভি বিশ্বানি ভুবনানি চাষ্ট।"

অদ্ভুত কলা-বিজ্ঞান-সাধিত-চিত্রিত এই বিমানাদি রথে জল ও অগ্নি অথবা বায়ু ও বিদ্যুৎস্থাপিত হইলে, তৎসাহায্যে বিবিধ ভুবনে গমনাগমন করা যায়। এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বিদ্যুৎরূপ সূক্ষ্ম অগ্নিসাহায্যে রথ চালনা করিতে পারা যায়। এবং বায়ু ও জলের চাপ দ্বারা চালিত হইতে পারে। এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়েও হইতে পারে।

৪র্থ মন্ত্র—সমিদ্ধেষগ্নিস্বানজানা যতশ্রুচা বর্হিরু তিস্তিরাণা। তীব্রৈঃ সোমৈঃ পরিষিক্তেভি রবাগেন্দ্রাগ্নী সৌমনসায় যাতম্॥ হে মনুষ্য! [যতশ্রুচা] শ্রুচবৎ কলাঘরবান্ [তিস্তিরাণা] যন্ত্র-কলাদি দ্বারা আচ্ছাদিত [আনজানা] স্বয়ং প্রসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধিকারক [ইন্দ্রাগ্নী] জল ও বিদ্যুৎ বা বায়ু ও বিদ্যুৎ [তীব্রৈঃ] তীক্ষ্ণ-বেগাদিবিশিষ্ট [সোমৈঃ] রসরূপ জল দ্বারা [পরিষিক্তেভিঃ] সর্ব্বতোভাবে কৃত সেচন ও [সমিদ্ধেষু—অগ্নিষু] প্রদীপ্ত কলাঘরস্থিত অগ্নির সাহায্যে [অর্বাক]

পশ্চাতে ও [বর্হিঃ] আকাশে (যাতম্) গমন করে (উ) এবং (সৌমনসায়) অনুত্তম সুখলাভের জন্য (আ) আগমন করে, সুতরাং কলা-যন্ত্রে ইহারা যোজনীয়।

এই মন্ত্র হইতে সিদ্ধ হইতেছে, রথে "শ্রুচ" অর্থাৎ অগ্নি ও জলাগার রাখিতে হইবে এবং ইন্দ্রাগ্নিকে ঐ শ্রুচে স্থাপিত করিতে হইবে। আর বেগোৎপাদন জন্য উহাতে জল ও "সমিৎ" দিতে হইবে। এবং ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, বিদ্যুৎ ও অগ্নি-সাহায্যে জল হইতে বাষ্প উৎপাদনপূর্ব্বক তৎ সাহায্যে যান পরিচালন করিতে পারা যায়।

১০৯ সূ, ৪ মন্ত্র, অঙ্গিরসঃ কুৎসঋষিঃ,
ইন্দ্রাগ্নিদেবতে।

যুবাভ্যাং দেবী ধিষণা মদায়েন্দ্রাগ্নি সোমমুশতী সুনোতি। তাবশ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী আ ধাবতং মধুনা পৃঙ্ক্তমপ্সু।

এই মন্ত্র হইতে আমরা ইহাই পাইতেছি—"ইন্দ্রাগ্নি অপ্সু মধুনা পৃঙ্ক্তং ভদ্রহস্তা সুপাণী অশ্বিঃ নাস্ততাবিন্দ্রাগ্নি যানেষু সংপ্রযুক্তৌ সন্তাবাধাবতং সমন্তাৎ যানানি ধাবয়তম্॥

অর্থাৎ ইন্দ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভৌতিকাগ্নি কলাঘর-স্থিত জলের সম্পর্কিত হইয়া বেগোৎপাদন পূর্ব্বক যানাদিকে ধাবিত করে,

১১১ সূক্ত, ১ম মন্ত্র, আঙ্গিরসঃ কুৎস ঋষিঃ।
ঋভবো দেবতা।

"তক্ষন্ রথং......" ইত্যাদি। এই মন্ত্রস্থ "ইন্দ্র-বাহাতক্ষন্" "সুবৃতম্ রথম্ তক্ষন্" আদি অংশ হইতে সিদ্ধ হইতেছে, জলকে অগ্নির সাহায্যে সূক্ষ্ম করিতে হইবে এবং রথে প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এবং বৃষণ্বস্থ পদ হইতে সিদ্ধ হইতেছে, আরোহী (Passenger) কে বৈদিক ভাষায় "বসু" বলে। Passenger train বসুবা; Goods train ইন্দ্র, রয়ি, শ্রববা।

১১২ সূক্ত, ১২শ মন্ত্র; আঙ্গিরসঃ কুৎস ঋষিঃ
অশ্বিনৌ দেবতে।

"অনশ্বং রথমাবতং" ইত্যাদি পশু ঘোড়া রহিত অথচ অশ্বাদিরূপ অশ্বচালিত রথ রক্ষা কর।

১১৬সূ, ১ মন্ত্র; কাক্ষীবান্ ঋষিঃ
অশ্বিনৌ দেবতে।

এই মন্ত্রস্থ "স্তোমান্ পরিবৃঞ্জে" পথ শোধনের জন্য পর্ব্বতাদি ছিন্ন ভিন্ন করি। এস্থল হইতে অনুমান হয়, স্তোম—Rail Road এবং রথ্যাকেও "রেল-রোড" বলা যায়।

এক্ষণে নৌ-আদি নির্ম্মাণ-বিদ্যা উপদিষ্ট হইতেছে:—

৩য় মন্ত্র:—তুগ্রোহ তুজ্যমশ্বিনোদ মেঘে রয়িন কশ্চিন্মমৃবাং আবাহঃ তমূহথুর্নৌভি রাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥

(তুগ্রোহ) "তুজি" ধাতুকে রক্ প্রত্যয় করিয়া "তুগ্র" পদ সিদ্ধ হয়; এই তুগ্র শব্দ হিংসক, বলবান্, গ্রহণকারী, ও স্থানকারী এই চারি প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৈদিক শব্দের অর্থ সামান্য (ধাত্বর্থে) বিদ্যমান্ থাকে; এজন্য তুগ্র শব্দের অর্থ এইরূপ—যে জন শত্রুকে হিংসা বা হনন পূর্ব্বক নিজ বিজয় ও পরাক্রম দ্বারা বলবান্ হইয়া ধনাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যিনি অশ্ব, রথ, নৌকা ও

বিমানাদি যান সকল প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন। (রয়িং) যিনি উত্তম বিদ্যা ও সুবর্ণাদি পদার্থের কমনাকারী বা আকাঙ্ক্ষী, তাঁহার পক্ষে ধনাদি পদার্থের কিরূপে পালন ও ভোগ সাধন করিতে হয়, এক্ষণে তদ্বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে যথা—(অশ্বিনা) অর্থাৎ যে কেহ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিত্তল ও কাষ্ঠাদি পদার্থ দ্বারা বিবিধ কলাযুক্ত নৌকাদি যান ও বিমানাদি রচনা করিয়া, তাহাতে যথাবৎ অগ্নি, বায়ু ও জলাদি দ্রব্য প্রয়োগপূর্ব্বক তন্মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যাদি পূর্ণ করিয়া ব্যবসায়ার্থে (উদমেঘে) সমুদ্র ও নদী আদিতে যাত্রা পূর্ব্বক দ্বীপদ্বীপান্তরে গমন করে, তদ্দ্বারা তাঁহার পদার্থের উন্নতি ঘটে। যিনি এইরূপ পুরুষকারে রত থাকেন, তিনি (ন কশ্চিন্ মমৃবান্) পদার্থের প্রাপ্তি ও রক্ষণে সমর্থ হন, ও ঐহিক ক্লেশে প্রাণত্যাগ করেন না; কারণ তিনি পুরুষকার পরায়ণ হইয়া বাণিজ্যদ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, সুতরাং বাণিজ্য মানবের শ্রীবর্দ্ধনার্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়। নৌকাদি যানের সিদ্ধি দ্বারাই লোকে বিভবশালী হইয়া থাকেন। অগ্নি, বায়ু ও পৃথিব্যাদি পদার্থে যে শীঘ্র গমনাদি করিবার গুণ বিদ্যমান আছে, তাহাকে "অশ্বি" বলে। এই সকল পদার্থযোগে রথ চালনা করিলে, ঐ সকল পদার্থের স্বভাবতঃ গমনাগমনাদি গুণ থাকায়, ঐ যান সকলও বেগবান্ হইয়া থাকে। বেদোক্ত বিদ্যা ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ এইরূপ নৌ, বিমানাদি যানদ্বারা লোকে সুখের সহিত দেশান্তরে গাতায়াত করিতে পারে। এক্ষণে কিরূপ যান দ্বারা বিদেশগমন সিদ্ধ হয়, তাহাই বলিতেছেন—(নৌভিঃ) নদী, সমুদ্রাদিতে গতায়াত জন্য নৌকাই শ্রেষ্ঠ যান; (আত্মন্বতীভিঃ) সেই নৌকা উহার স্বামী বা ভৃত্যদ্বারা পরিচালিত হইবে। ব্যবসায়ী তথা রাজপুরুষেরা এইরূপ নৌকা রোহণ দ্বারা ব্যবসায়ার্থে সমুদ্রে গতায়াত করিবেন। এইরূপে আকাশে গমনের জন্য বিমানই শ্রেষ্ঠ; (অপোদকাভিঃ) উক্ত বিমান এরূপ শুষ্ক ও চিক্কণ হওয়া উচিত যে, উহাতে জল লাগিলে গলিয়া, ছিঁড়িয়া বা ছিদ্রাযুক্ত হইয়া না যায়।

এই তিনরূপ যান সিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

ত্রিবিধ যান যথা—"রথ" (ভূমির জন্য); "নৌ" (জলের জন্য); "বিমান" অন্তরীক্ষ গমন জন্য। অথবা "অশ্বিরথ" "অশ্বি-নৌ" এবং "অশ্বি-বিমান"।

৪র্থ মন্ত্র— তিস্রক্ষপস্ত্রিরহাতি ব্রজদ্ভির্নাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ। সমুদ্রস্য ধন্বনার্দ্রস্য পারে ত্রিভীরথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষড়শ্বৈঃ

(তিস্রঃ-ক্ষপস্ত্রি-নাসত্যা) পূর্ব্বোক্ত অশ্বি (ভুজ্যুমূহথুঃ) বিবিধভোগ প্রাপ্ত করায়; যেহেতু তাহার বেগ বলে তিনি অহোরাত্রে নৌকা, বিমান ও রথ দ্বারা সুখে (সমুদ্রে) সাগর (ধন্বন্) আকাশ ও ভূমি উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। (ত্রিভীরথৈঃ) উপরোক্ত যানত্রয় দ্বারা মানবের গমনাগমন কর্ত্তব্য। তথা (ষড়শ্বৈঃ) ছয়টী অশ্ব অর্থাৎ যানাদিতে অগ্নি ও জলাদির জন্য ছয়টী গৃহ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থান প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য; অথবা উহা অন্ততঃ ছয়টী অশ্বের তুল্য বেগবিশিষ্ট করিয়া প্রস্তুত করা উচিত; যাহাতে ঐ যান দ্বারা সর্ব্বত্র গমনাগমনের সুবিধা হয়; এবং

(পতঙ্গৈঃ) যেন তদ্দ্বারা তিনরূপ পথেই যাইতে সমর্থ হওয়া যায়।

পূর্ব্বে বহু মন্ত্রে সমুদ্র-পার গমনের ঈশ্বরাদেশ উল্লিখিত হইয়াছে, এখানেও "উহথুঃ সমুদ্রস্য পারে" এই অংশ উক্তার্থ সিদ্ধ করিতেছে। এবং "ষড়শ্বৈ রথৈঃ" হইতে ছয় অশ্বের বলযুক্ত রথের কথা পাওয়া যাইতেছে i. c. Engine, possessing six horse power. তথা "শতপদ্ভি" হইতে সিদ্ধ হইতেছে, উহা অসংখ্য পদরূপ চক্র বিশিষ্ট এবং অসংখ্যপদবৎ বেগে গমনশীল। এখানে "অতি প্রজদ্ভিঃ পতঙ্গৈঃ ষড়শ্বৈঃ শতপদ্ভিঃ রথৈঃ" হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রথ পশুরূপী অশ্ব চালিত নহে, কারণ তাহা হইলে ৬টী অশ্বের কখনই ১০০ পদ হইবে না।

৫ম মন্ত্রঃ—অনারম্ভনে তদবীরয়েথামনা স্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে। যদশ্বিনা উহ থুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্॥

(অনারম্ভনে) হে মনুষ্যগণ! তোমরা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনারম্ভন অর্থাৎ অবলম্বন রহিত সমুদ্রে নিজ কার্য্য সিদ্ধি করণযোগ্য যান রচনা করিবে! (তদবীরয়েথাম) যে যান পূর্ব্বোক্ত অশ্বিদ্বারা যাতায়াতের সিদ্ধ হয়। (অনাস্থানে) অর্থাৎ আকাশ ও সমুদ্রে বিনাবলম্বনে কিছুই স্থির থাকিতে পারে না, (অকামিদোন) যেস্থানে হস্তদ্বারা ধরিবার কিছুই আলম্বন পাওয়া যায় না, এরূপ সাগরে ও অন্তরিক্ষে (কারণ অন্তরিক্ষও জলপূর্ণ থাকে) গমনের জন্য পুরুষকার দ্বারা ঐ যান রচনা কর। (যদশ্বিনা, উহথুঃ) যে যান, বায়ু, আদি অশ্বি দ্বারা চালিত হয়, তদ্দ্বারা বিবিধ উত্তম ভোগ্য বিষয় লাভ হয়। (অস্তং) এইরূপে চালিত যান দ্বারা সমুদ্র, ভূ ও খে উত্তমরূপে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, পুনশ্চ কিরূপ নৌকা সমুদ্রাদিতে চালাইতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে—(শতারিত্রাম্) অর্থাৎ ঐ সমুদ্রযানে শত প্রকার লৌহময় কল থাকিবে, যদ্দ্বারা বন্ধন, স্তম্ভন, অভিচালন (সম্মুখে চালন) অবচালন ক্রিয়া (পশ্চাৎ-গমন), জল-গভীরতা, উত্তাপ ও বাষ্প-পরিমাপন, ব্যাত্যামাপন, দিঙ্‌নির্ণয়, আপৎরক্ষা ও নঙ্গরাদি হইতে পারে। কারণ তাহা হইলে উহাদ্বারা অনায়াসে ইচ্ছামত স্থানে বন্ধন ও স্তম্ভন করিয়া রাখিতে পারা যাইবে। এইরূপ সাধন রচনা করিলে, (তস্থিবাংসম্) মনুষ্যগণ স্থির ভোগ প্রাপ্ত হয়, অথাৎ সর্ব্ববিধ পার্থিব অভ্যুদয় ভোগে সমর্থ হয়।

৬ষ্ঠ মন্ত্র—যমশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমাশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎ স্বস্তি। তদ্বাং দাত্রং মহি কীর্ত্তেন্যং ভূতপৈদ্বো বাজী সদমিদ্ধব্যো অর্যঃ।

(যমশ্বিনা) জল ও অগ্নিরূপী অশ্বির সংযোগদ্বারা, (শ্বেতমশ্বং) শুক্লবর্ণ বাষ্পরূপা অশ্ব, অত্যন্ত বেগশালী হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা শিল্পিগণ যানাদিকে (অঘাশ্বায়) শীঘ্র গমন জন্য বেগযুক্ত করিয়া দেন, অর্থাৎ যেন বেগের হ্রাস না হয়, বরং ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে পারা যায়; (শশ্বদিৎ স্বস্তি) ও যেখানে বসিয়া সমুদ্র, অন্তরীক্ষ ভ্রমণপূর্ব্বক স্বস্তি অর্থাৎ নিত্যসুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (দদথুঃ) যে বেগ ও গুণ বায়ু, জল ও অগ্নিদ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা যেন মনুষ্যগণ সুবিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। (বাম্) এইরূপ সামর্থ্য কেবল পূর্ব্বোক্ত অশ্বিসংযুক্ত পদার্থেই আছে। এক্ষণে সেই সামর্থ্য কিরূপ তাহাই বর্ণিত হইতেছে:—যথা প্রশ্ন:—

(তৎ) সেই সামর্থ্য কিরূপ? উত্তর—(দাত্রম্) দানের যোগ্য, (মহি) শ্রেষ্ঠগুণান্বিত, (কীর্জেন্যম্) প্রশংসার যোগ্য ও উপকারী (ভূৎ) হইয়া থাকে; যেহেতু ঐ (পৈদ্বঃ) অশ্ব মার্গে চালকস্বরূপ হয়। (সমমিৎ) এবং উহাঁ অত্যন্ত বেগশালী আর (হবাঃ) গ্রহণ ও দানযোগ্য হইয়া থাকে; (অর্য্যঃ) বৈশ্য অর্থাৎ শিল্পবিদ্যাবিশারদগণ ইহা অবশ্য গ্রহণ করিবেন, কারণ এইরূপ যান বিনা দ্বীপদ্বীপান্তরে যাতায়াত কঠিন ব্যাপার। "পৈদ্বঃ"—অশ্বঃ। নিঘং ১।১৪॥ "অর্য্যঃ"—"সামিবৈশ্বয়োঃ" ইতি পাণিনিসূত্রাৎ। অর্য্যো বৈশ্যস্বামিবাচীতি॥

"শ্বেতমশ্বং"—জলীয় বাষ্পরূপী শ্বেতাশ্ব।

৭ম মন্ত্র—"শফাৎ অসিঞ্চতম্" খুববৎ জলাধার হইতে জল সেচন কর। "শফ" জলাধার।

৯ম মন্ত্র:—"তৃষ্যাতে পায়নাবাপঃ ক্ষরন্" ইহাতে বস্তু—আরোহীদিগের পানের জন্য যানে জল রক্ষণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৭ সূক্ত, ২য় মন্ত্র, কক্ষীবানৃষিঃ,

অশ্বিনৌ দেবতে।

"স্বশ্বঃ, সুকৃতঃ, মনসঃ জবীয়ান্, রথঃ" "যেন দূরোণং গচ্ছমঃ।"

সুন্দর-নিষ্পাদিত, মনের অপেক্ষা বেগবান্ রথদ্বারা গৃহে গমন কর। "সুকৃতঃ অশ্বঃ" হইতে সিদ্ধ হইতেছে, এই অশ্ব পশুরূপী নহে।

৯ম মন্ত্র—"পেদবে শ্রবস্যম্ অপ্রতীতম্ বাজিনম্ অহিহনম্ সহস্রসাম্ আশুম্ তরুত্রম্ অশ্বম্ নূহথুঃ" এই অংশটাই প্রয়োজনীয়। ইহার অর্থ—শীঘ্র গমনার্থ, পৃথিব্যাদি বিবিধ পদার্থে গুপ্ত বেগবান্ মেঘনাশক, অসংখ্য কর্ম্মসাধক শীঘ্রগামী সমুদ্রাদিতারক বিদ্যুদগ্নিকে চালনা কর। ইহাদ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিদ্যুৎ দ্বারাও রথ চালনা করা যায়॥

১৪শ মন্ত্র:—"বিভিঃ ঋজ্রেভিঃ অশ্বৈঃ অর্ণসঃ সমুদ্রাৎ ভুজ্যুম্ নিরূহথুঃ" ইহাতে এই অংশটাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার অর্থ—আকাশগামী পক্ষীর তুল্য ঋজুগামী বিদ্যুদাদি চালিত বিমানাদি যানদ্বারা অগাধজলপূর্ণ সমুদ্রপারে ভোগযোগ্য পদার্থসমূহ নিরন্তর পাঠাও। ইহাতে সাগর-পারস্থ দ্বীপান্তরে ব্যবসার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৮সূ, ১মন্ত্র, কাক্ষীবান্ ঋষিঃ

অশ্বিনৌ দেবতে।

ত্রিবন্ধুরঃ শ্যেনপত্বা বাতরংহাঃ মর্ত্তস্য মনসঃ জবীয়ান্ সুমৃড়কঃ স্বধান্ রথঃ অর্বাঙ্ আ যাতু॥

উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যে বন্ধনযুক্ত শ্যেন পক্ষীবৎ গমনকারী, বায়ুবৎ বেগবিশিষ্ট এমন কি মানুষের মন হইতেও অধিকতর ধাবনশীল, উত্তম সুখদাতা স্বকীয় ভৃত্য ও দ্রব্যবাহী রথ নিম্নে আসুক।

২য় মন্ত্র—হে সভাসেনাধীশ! তোমরা উভয়ে ত্রিবন্ধনযুক্ত, ত্রিচক্রচালিত, ত্রিআবরণযুক্ত, মনুষ্যাদি সহ বর্ত্তমান যে রথ উহাদ্বারা ভূমির নিম্ন প্রদেশে আইস; আমাদের রাজত্বে ভ্রমণ কর; ঘোড়াকে রথাকর্ষণকার্য্য হইতে বিদায় দিয়া তাহাকে জীবন দাও, এবং আমাদের শূরবীর বর্দ্ধন কর।

৩য় মন্ত্র:—"প্রবত্মনা সুবৃতা রথেন অদ্রেঃ গচ্ছন্তৌ" এই মন্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে গমন সুদৃঢ়সাধনযুক্ত রথে পর্ব্বোতোপরি গমন করিবার বিষয় বলা হইয়াছে।

৪র্থ মন্ত্র—আ বাং শ্যেনাসো...।

যে রথ অন্তরীক্ষে শীঘ্র চলনশীল, উত্তমক্রীড়া সাধক ও গৃধ্র পক্ষীর তুল্য অভিপ্রেত স্থানে সর্ব্বদা পঁহুছায়, সেই বাজপক্ষীবৎ চলনশীল সূর্য্যবৎ প্রকাশমান্ শীঘ্রগামী অগ্ন্যাদি পদার্থ, বিমানাদি রথে যুক্ত হইয়া তোমাদের উভয়কে বহন করিতেছে।

গৃধ্র ও শ্যেনবৎ রথ—বিমান; আশবঃ চালিত বিমান।

৫ম মন্ত্র:—অরুষাঃ বরঃ অশ্বাঃ বাম্ পরিবহন্ত অভীকে। রক্তবর্ণ, পক্ষীর তুল্য অশ্ব তোমাদের উভয়কে সংগ্রামে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। "অপরঃ বয়ঃ অশ্বাঃ" হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে—পশুরূপী অশ্ব ভিন্ন অন্য অশ্বদ্বারা রথ চালনা করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ মন্ত্র—"উদ্বন্দনম্" ইত্যাদি—"যুবানম্ সমুদ্রাৎ নিঃ পারয়থঃ, পুনঃ উৎ চক্রথুঃ"। যুবাদিগকে সমুদ্রের পারে পাঠাও এবং পুনঃ আনয়ন কর। এই মন্ত্রে সভাধ্যক্ষদ্বারা রাজার নিকট তাঁহার যুবা পুত্রকে সাগর-পারে পাঠাইবার এবং অন্য ধনী যুবা পুত্রকে সাগর পারে পাঠাইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

১১৯ সূ, ১ম মন্ত্র,—দৈর্ঘ্যতমসঃ কক্ষীবানৃষিঃ

অশ্বিনৌ দেবতে।

আ বাং রথং ইত্যাদি।

জীরাশ্বম্, যজ্ঞিয়ম্, সহস্রকেতুম্, শতবসুম্, বনিনম্, শ্রুষ্টিবানম্, মনোজুবম্, বরিবোধাম্, রথম্, অভ্যাহুবে॥

বহুজীবাশ্রয়, যজ্ঞদেশগামী, অসংখ্য পতাকাশোভিত, বহুধনবাহী, বহুজলপূর্ণ, ক্ষিপ্রগতি, মনের অপেক্ষা বেগবান্, গমন সুখসাধক রথের প্রশংসা করি।

১২০ সূ, ১০মন্ত্র, উশিক্ পুত্রঃ, কক্ষীবানৃষিঃ

অশ্বিনৌ দেবতে।

"অনশ্বম্ রথম্ অসনম্" অর্থাৎ পশুরূপী অশ্বহীন রথে গমন করিব।

১১শ মন্ত্র—"সুখঃ রথঃ" অর্থাৎ বিস্তীর্ণ রথ; (সু+খ)।

১২১সূক্ত, ১৪ মন্ত্র; উশিজঃ কক্ষীবানৃষিঃ বিশ্বেদেবা ইন্দ্রশ্চ দেবতাঃ।

"রথ্যঃ"—"অশ্ববুধ্যান্" এই পদ দুইটী মন্ত্রের জ্ঞাতব্য। রথ্যঃ—রথস্য বোঢাঃ—রথচালক, অশ্ববুধ্যাম্—অশ্বান্ অন্তরীক্ষা ভবান্ অগ্ন্যাদীম চালয়িতুং বর্দ্ধিতু বুধ্যাস্তে তান্। অন্তরীক্ষস্থ অগ্ন্যাদি পদার্থের চালনা ও বর্দ্ধনোপায়জ্ঞাতা। রথ্যঃ—Driver.

আমরা এই সকল মন্ত্র হইতে বুঝিলাম যে, অশ্বি অর্থাৎ জল ও অগ্নিজাত শ্বেতাশ্ব অর্থাৎ জলীয় বাষ্পদ্বারা যান চালনা করিতে বেদ উপদেশ দিতেছেন; সেই রথ চিত্রিত ও পতাকাশোভিত হইবে। এবং স্থলগমন জন্য "অশ্বি-রথ," জলগমন জন্য "অশ্বি-নৌ" ও অন্তরীক্ষগমন জন্য "অশ্বি-বিমান" প্রস্তুত করিতে হইবে। এই রথগুলি পদার্থ, ধন ও জীব বহন করিবে। যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে। উহাতে বিবিধ যন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে। বিদ্যুৎবেগেও যান চালাইবার উপদেশ বহু মন্ত্রে পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে আমরা জাহাজ বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া নিবৃত্ত হইব—

২য় অষ্টক, ৩অধ্যায়, বর্গ ২৩।২৪, মন্ত্র ৪৭।৪৮।

কৃষ্ণনিযানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপোবসানা দিবমুৎপতন্তি। ত আববৃত্রন্ত্ সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুন্ততে॥

দ্বাদশপ্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উতচ্চিকেত। তস্মিন্তসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচালসঃ।

(কৃষ্ণং নি...) অগ্নিজলযুক্ত, (কৃষ্ণং) আকর্ষণকারী পৃথিবীবিকারময় (নিযানং) যে নিশ্চিত যান, তাহাতে (হরয়ঃ) বেগাদিগুণসম্পন্ন (সুপর্ণাঃ) উত্তম গমনশীল অগ্ন্যাদিরূপী অশ্বি আছে। (অপোবসানাঃ) আচ্ছাদিত জলপাত্রের অধোদেশে জ্বালারূপ কাষ্ঠ প্রজ্বলনপূর্ব্বক বাষ্পোৎপাদন করিয়া এবং কলাকৌশল ভ্রামিত করিয়া রথ চালান হইয়া থাকে; (ত আববৃ...) যখন উহা উপযুক্ত বেগযুক্ত হয়, তখন উহা (ঋতস্য) যথার্থ সুখদায়ক হইয়া থকে।১০।

(দ্বাদশ প্রধয়ঃ) এই সকল যানের অন্তর ও বাহিরে এরূপ কল প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহা ঘুরাইলে সমস্ত কলা আবর্ত্তিত বা ভ্রামত হইবে; (ত্রীণি নভ্যানি) তৎপরে উহার মধ্যে তিনটী চক্র নির্ম্মাণ করিবে, যন্মধ্যে একটী চলিলে, অন্যান্যগুলি রুদ্ধ হয়; ২য়টীকে চালাইলে অগ্রে গমন করিবে এবং তৃতীয়টীকে চালাইলে পশ্চাতে গতিশীল হইবে। (তস্মিন্ সাকং ত্রিশতা) উহাতে তিনশত করিয়া (শঙ্কব) বড় বড় কীলক অর্থাৎ পেরেক বা পেঁচযুক্ত থাকিবে, যদ্দ্বারা অনায়াসে উহার সমস্ত অঙ্গ একত্র করা যায়; এবং ঐগুলি বাহির করিয়া লইলে সকল গুলিকে পৃথক্ করিতে পারা যায়। (ষষ্টির্ন চলাচলসঃ) উহাতে ৬০টী করিয়া কলাযন্ত্র রচনা করিবে, যাহার মধ্যে কতিপয় চলিবে ও কতিপয় বন্ধ থাকিবে অর্থাৎ যখন বিমানকে উর্দ্ধে চালাইবার প্রয়োজন হইবে, তখন বাষ্প নিপীড়িত করিয়া উহার উর্দ্ধগমন-পথ রুদ্ধ করিবে; এবং পৃথিবীর দিকে আসিবার প্রয়োজন হইলে, উহার নিম্নগমন-পথ রুদ্ধ করিয়া উর্দ্ধমুখ অনুমানানুযায়ী খুলিয়া দিবে। এইরূপে যে কোনও দিকে চালাইবে তাহার বিপরীত দিকের বাষ্প নির্গমন-মুখ খুলিয়া অনুকূল মুখ বন্ধ করিবে। (নঃ) এইরূপ ব্যবহারে ভ্রম করিবে না। (ক উত্তশ্চিকেতঃ) এই মহা গভীর শিল্পবিদ্যা সাধারণ মনুষ্য জ্ঞাত হইতে পারে না, কিন্তু যিনি মহাবিদ্বান্ ও হস্ত-ক্রিয়ায় চতুর ও যাঁহারা পুরুষার্থবান্ তাঁহারাই সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। এই বিষয়ে বেদে অনেক মন্ত্র আছে, এস্থলে কেবল তুষ্টি ও পক্ষপুষ্টির জন্য কতিপয় সংগৃহীত হইল; বিদ্বান ব্যক্তি স্বয়ং বেদ দর্শন করিবেন।

সম্ভবতঃ অতঃপর পাঠকগণের বৈদিক রথ-বিদ্যা বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এক্ষণে কোন্ অংশের নাম কি তাহা বলা যাইতেছে—"রেলরোড"—রথ্যা; "ড্রাইভার"—রথ্য; Guard অর্বাক্রথ্যঃ; গার্ড-ড্রাইভার—ঋত্বিজৌ; আরোহী—Passenger—বসু, গুড্স্ ট্রেন—রয়িবা; Passenger train—বসুবা বা বসুরথ।

প্রাচীন সময়ে ভারতে রেল পাতিয়া রথ পরিচালনের এবং এখনকার মত সুবৃহৎ রথ চালনা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রথ যে চলিত, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ; রথ ক্ষুদ্র ও লঘুভার হইলে শুদ্ধ মৃত্তিকার উপরিভাগেও চলিতে পারে। মহাভারত ও পুরাণাদিতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়।"

বৈদিক যুগের রথ বা যান সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইল, তাহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, মধুচ্ছন্দা ঋষি উক্ত রথনির্ম্মাণ বিদ্যার

আবিষ্কারক। তদনন্তর বহু ঋষিকর্ত্তৃক ক্রমে উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। জাতি ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন নানাবিধ শিল্পকলার আবিষ্কার হয়, তাহার অবনতির দিনে তাহার তেমনি অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া থাকে, আর তাহার চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শত শত ঘটনা নিত্য প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে,—বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, আজ যেন তাহাও নাই! যাহা হউক অসংখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও সেই অতি প্রাচীন যুগে প্রবর্ত্তিত বাষ্পীয় রথাদির কোনরূপ আদর্শ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রাচীন ভাস্কর্য্য, যাহা সেই বৈদিক যুগের বহু কাল পরে ভারতের নানা স্থানে গিরিগুহা ও মন্দির-গাত্রে খোদিত হইয়াছে, তাহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত রথ বা যানাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন।

তাই হো'ক-পূর্ণ হো'ক-বাসনা তোমার
অন্তর্য্যামী হে মোর প্রাণেশ—
অকূলে ভাসায়ে তরী দেছ ডুবাইয়ে
নাই মোর কোন দুঃখ লেশ!
ছিল যে আঁধার ঘরে নিশার প্রদীপ
নিজ করে দিয়াছ নিভায়ে;
তীক্ষ্ণ নখে ছিন্ন করি হৃদয় কলিকা
চলে গেছ চরণে দলিয়ে।
হেমন্তের সন্ধ্যাসম ঘনাইয়া আসে
নিষ্ফলতা জীবনের 'পরে—
সুদীর্ঘ-জীবন-পথে চলেছি একাকী
কেহ নাই সাথী হইবারে।
প্রতি ক্ষেপে কণ্টকেতে ছিন্ন করে পদ
রক্তধারা ঝরে অবিরাম।
তথাপি চলেছি প্রভু স্থান কোথা নাই
পালকের পাইতে বিশ্রাম।
উষা দিবা সন্ধ্যা নিশি আলোক আঁধার
মুখপানে চেয়ে চলে যায়;
ভাবে তারা গৃহহারা এমনি করিয়া
কে জানে গো চলেছে কোথায়!
নিজেই জানিনে নাথ নিজে কোথা যাই
পথ যেন মোহমন্ত্রে টানে।
যখন সকলি সুপ্ত—আমি যে জাগিয়া
চেয়ে থাকি সুদূরের পানে।
নিয়ত আঘাত করে নিষ্ঠুর সংসার
ভ্রান্ত বলি করে উপহাস;
ডেকে বলে—ফিরে আয় ওরে রে পাগল
গৃহ ছেড়ে কোথা যেতে চাস!
হায় নাথ—কি বাঁশরী বাজিছে পরাণে,
কেন আমি হ'য়ে গৃহহারা
ঘুরে মরি; আমি জানি—আর জান তুমি
কেমনে গো জানিবে তাহারা।
করুক সকলে ত্যাগ—সর্ব্বারক্ত হ'য়ে
রব আমি অবনীর মাঝে—
এই আশে;—একদিন আসিবে বল্লভ
হৃদি-কুঞ্জে মনোহর সাজে!

দ্বাদশপ্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উতচ্চিকেত। তস্মিন্তসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচালসঃ।

(কৃষ্ণং নি...) অগ্নিজলযুক্ত, (কৃষ্ণং) আকর্ষণকারী পৃথিবীবিকারময় (নিযানং) যে নিশ্চিত যান, তাহাতে (হরয়ঃ) বেগাদিগুণসম্পন্ন (সুপর্ণাঃ) উত্তম গমনশীল অগ্ন্যাদিরূপী অশ্বি আছে। (অপোবসানাঃ) আচ্ছাদিত জলপাত্রের অধোদেশে জ্বালারূপ কাষ্ঠ প্রজ্বলনপূর্ব্বক বাষ্পোৎপাদন করিয়া এবং কলাকৌশল ভ্রামিত করিয়া রথ চালান হইয়া থাকে ; (ত আবৃ...) যথন উহা উপযুক্ত বেগযুক্ত হয়, তখন উহা (ঋতস্য) যথার্থ সুখদায়ক হইয়া থকে।১০।

(দ্বাদশ প্রধয়ঃ) এই সকল যানের অন্তর ও বাহিরে এরূপ কল প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহা ঘুরাইলে সমস্ত কলা আবর্ত্তিত বা ভ্রামিত হইবে ; (ত্রীণি নভ্যানি) তৎপরে উহার মধ্যে তিনটী চক্র নির্ম্মাণ করিবে, যন্মধ্যে একটী চলিলে, অন্যান্যগুলি রুদ্ধ হয় ; ২য়টীকে চালাইলে অগ্রে গমন করিবে এবং তৃতীয়টীকে চালাইলে পশ্চাতে গতিশীল হইবে। (তস্মিন্ সাকং ত্রিশতা) উহাতে তিনশত করিয়া (শঙ্কব) বড় বড় কীলক অর্থাৎ পেরেক বা পেঁচযুক্ত থাকিবে, যদ্দ্বারা অনায়াসে উহার সমস্ত অঙ্গ একত্র করা যায় ; এবং ঐগুলি বাহির করিয়া লইলে সকল গুলিকে পৃথক্ করিতে পারা যায়। (ষষ্টির্ন চলাচলসঃ) উহাতে ৬০টী করিয়া কলাযন্ত্র রচনা করিবে, যাহার মধ্যে কতিপয় চলিবে ও কতিপয় বন্ধ থাকিবে অর্থাৎ যখন বিমানকে উর্দ্ধে চালাইবার প্রয়োজন হইবে, তখন বাষ্প নিপীড়িত করিয়া উহার উর্দ্ধগমন-পথ রুদ্ধ করিবে ; এবং পৃথিবীর দিকে আসিবার প্রয়োজন হইলে, উহার নিম্নগমন-পথ রুদ্ধ করিয়া উর্দ্ধমুখ অনুমানানুযায়ী খুলিয়া দিবে। এইরূপে যে কোনও দিকে চালাইবে তাহার বিপরীত দিকের বাষ্প নির্গমন-মুখ খুলিয়া অনুকূল মুখ বন্ধ করিবে। (মঃ) এইরূপ ব্যবহারে ভ্রম করিবে না। (ক উত্তশ্চিকেতঃ) এই মহা গভীর শিল্পবিদ্যা সাধারণ মনুষ্য জ্ঞাত হইতে পারে না, কিন্তু যিনি মহাবিদ্বান্ ও হস্ত-ক্রিয়ায় চতুর ও যাঁহারা পুরুষার্থবান্ তাঁহারাই সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। এই বিষয়ে বেদে অনেক মন্ত্র আছে, এস্থলে কেবল তুষ্টি ও পক্ষপুষ্টির জন্ত কতিপয় সংগৃহীত হইল ; বিদ্বান ব্যক্তি স্বয়ং বেদ দর্শন করিবেন।

সম্ভবতঃ অতঃপর পাঠকগণের বৈদিক রথ-বিদ্যা বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এক্ষণে কোন্ অংশের নাম কি তাহা বলা যাইতেছে—"রেলরোড"—রথ্যা ; "ড্রাইভার"—রথ্য ; Guard অর্বাক্রথ্যঃ ; গার্ড-ড্রাইভার—ঋত্বিজৌ ; আরোহী—Passenger—বসু, গুড্স্ ট্রেন—রয়িবা ; Passenger train—বসুবা বা বসুরথ।

প্রাচীন সময়ে ভারতে রেল পাতিয়া রথ পরিচালনের এবং এখনকার মত সুবৃহৎ রথ চালনা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রথ যে চলিত, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ ; রথ ক্ষুদ্র ও লঘুভার হইলে শুদ্ধ মৃত্তিকার উপরিভাগেও চলিতে পারে। মহাভারত ও পুরাণাদিতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়।"

বৈদিক যুগের রথ বা যান সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইল, তাহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, মধুচ্ছন্দা ঋষি উক্ত রথনির্ম্মাণ বিদ্যার

আবিষ্কারক। তদনন্তর বহু ঋষিকর্ত্তৃক ক্রমে উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। জাতি ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন নানাবিধ শিল্পকলার আবিষ্কার হয়, তাহার অবনতির দিনে তাহার তেমনি অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া থাকে, আর তাহার চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শত শত ঘটনা নিত্য প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে,—বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, আজ যেন তাহাও নাই! যাহা হউক অসংখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও সেই অতি প্রাচীন যুগে প্রবর্ত্তিত বাষ্পীয় রথাদির কোনরূপ আদর্শ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রাচীন ভাস্কর্য্য, যাহা সেই বৈদিক যুগের বহু কাল পরে ভারতের নানা স্থানে গিরিগুহা ও মন্দির-গাত্রে খোদিত হইয়াছে, তাহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত রথ বা যানাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন।

তাই হো'ক-পূর্ণ হো'ক-বাসনা তোমার
অন্তর্য্যামী হে মোর প্রাণেশ—
অকূলে ভাসায়ে তরী দেছ ডুবাইয়ে
নাই মোর কোন দুঃখ লেশ!
ছিল যে আঁধার ঘরে নিশার প্রদীপ
নিজ করে দিয়াছ নিভায়ে ;
তীক্ষ্ণ নখে ছিন্ন করি হৃদয় কলিকা
চলে গেছ চরণে দলিয়ে।
হেমন্তের সন্ধ্যাসম ঘনাইয়া আসে
নিষ্ফলতা জীবনের
সুদীর্ঘ-জীবন-পথে চলেছি একাকী
কেহ নাই সাথী হ
প্রতি ক্ষেপে কণ্টকেতে ছিন্ন করে পা
রক্তধারা ঝরে অবি
তথাপি চলেছি প্রভু স্থান কোথা না
পালকের পাইতে
ঊষা দিবা সন্ধ্যা নিশি আলোক আঁ
মুখপানে চেয়ে চ
ভাবে তারা গৃহহারা এমনি করিয়া
কে জানে গো চ
নিজেই জানিনে নাথ নিজে কোথা
পথ যেন মোহম
যখন সকলি সুপ্ত—আমি যে জাগিয়
চেয়ে থাকি সুদূ
নিয়ত আঘাত করে নিষ্ঠুর সংসার
ভ্রান্ত বলি করে উ
ডেকে বলে—ফিরে আয় ওরে রে
গৃহ ছেড়ে কোথ
হায় নাথ—কি বাঁশরী বাজিছে পর
কেন আমি হ'য়ে
ঘুরে মরি ; আমি জানি—আর জা
কেমনে গো জা
করুক সকলে ত্যাগ—সর্ব্বারক্ত হ'
রব আমি অবনী
এই আশে ;—একদিন আসিবে ব
হৃদি-কুঞ্জে মনো

তাড়না ত্রিতাপজ্বালা রবেনা তখন
অন্ধকার অরুণ উদয়ে;
সার্থক মানিব জন্ম, বাঞ্ছিত আমার—
একবার চাঁদমুখ চেয়ে!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প ও শিল্পী।

এই বিশাল বিশ্বজগৎ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকার্য্যের সমষ্টিমাত্র। সর্ব্বশক্তির মূলাধার ভূতভাবন ভগবান শিল্পসমষ্টির মধ্যে আদর্শ শিল্পকাররূপে অতি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছেন। সামান্য লতা গুল্ম হইতে শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্য পর্য্যন্ত ভগবানের শিল্প-কুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রথমতঃ প্রত্যেক চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ পদার্থের বাহ্যাবয়বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহাদের জাতি, ব্যক্তি ও বস্তুগত পার্থক্যে নিপুণ-শিল্পীর শিল্প-চাতুর্য্য দর্শনে অবাক হইয়া পড়িতে হয়। তাহার পর তাহাদের প্রণালীবদ্ধ নিয়মাধীনতা দেখিলে হৃদয় আরও পুলকে পুরিয়া উঠে।

রজনীর সুকোমল ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অবসাদ দূর করিবার পর, প্রাণীপুঞ্জের কার্য্যের পথে ছুটিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে প্রতিনিয়ত একটি বর্ত্তুলাকার স্বর্ণপ্রদীপ ধীরে ধীরে আসিয়া পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে প্রকাশিত করিয়া ধরে। আবার কঠোর পরিশ্রমে প্রাণীপুঞ্জ অবসন্ন হইয়া পড়িলে সুবর্ণ-প্রদীপ তাহার প্রখর জ্যোতিঃজাল গুটাইয়া লইয়া প্রস্থান করে; তাহার স্থানে শুভ্র শীতল সুধাংশু আসিয়া স্নিগ্ধ সুধা ঢালিয়া দিয়া শ্রান্ত-হৃদয় জুড়াইয়া দেয়। জীবকুলের জীবন ধারণের জন্য নির্দ্দিষ্টকালে ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন করিতে প্রভূত সলিলরাশির আবশ্যক হইয়া থাকে। এদিকে সময়মত ঐ অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য সমুদ্রজল সূর্য্যতাপের সহায়তায় বাষ্পরূপে পরিণত হইতে থাকে। পরে শস্যোৎপাদনের নির্দ্দিষ্টকালে ঐ সমস্ত বাষ্প শীতলবায়ুর সংস্পর্শে মেঘরূপে পরিণত হয়; মেঘ আরও শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেত্রে বর্ষিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সেই বিশ্বশিল্পীর প্রত্যেক শিল্পকার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যেক শিল্পকার্য্যের মধ্যে যেন তাহার একটা প্রাণ আছে—একটা গতি আছে বলিয়া অনুভূত হয়। শুধু প্রাণ—শুধু গতি নহে; তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য লইয়া ছুটিয়াছে। সুতরাং সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত শিল্পদ্রব্য শুধু চক্ষু পরিতৃপ্তির বিষয়ীভূত নহে—হৃদয়ে অনুভব করিবার জিনিস। যদি প্রদীপ্ত সবিতাকে, বিমল চন্দ্রমাকে, ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট ধূমবৎ বাষ্পরাশির উত্থান-পতনকে স্থিরচিত্তে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের অসামান্য সৌন্দর্য্য-প্রভায় মুগ্ধ হইতে হয় সত্য; কিন্তু তাহাদের নৈমিত্তিক কার্য্যপ্রণালীর নিয়মাধীনতার বিষয় চিন্তা করিলে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িতে হয়, হৃদয়ে তন্ময়তা আইসে। অনুমান হয়, সেই প্রধান শিল্পী-শ্রেষ্ঠ—জগতপতি প্রত্যেক মনুষ্যকে এক একজন ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী করিয়া তুলিতে এবং তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার এই

সমস্ত শিল্পচাতুর্য্য লোক-চক্ষুর গোচরীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। মানব এই সমস্ত শিল্পের আদর্শ লইয়া কেহ বা অনুরূপ এক একটি গাছ ছায়ারূপে চিত্রিত করিতেছে, কেহ বা অবয়ব বিশিষ্ট করিয়া গড়িতেছে; আবার কেহ পাহাড় গাঁথিতেছে, কেহ বা বাদ্যযন্ত্রমধ্যে মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তুর কণ্ঠস্বরের সমাবেশ করিতেছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কলাবিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিতেছে।

এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রতি সামান্য সামান্য কার্য্যে এমন কি, প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে পর্য্যন্ত শিল্প-নিপুণতা পরিদৃষ্ট হয়। আমার হাসিতে তুমি মুগ্ধ হও, তাহার বাকপটুতায় আমি আকৃষ্ট হই, তোমার সকরুণ দৃষ্টিতে সে গলিয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যায় হাসিকে আমি যতখানি সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারি, তুমি তাহা পার না। আবার বাকপটুতায় সে যতদূর কৃতকার্য্য, আমি ততদূর নহি। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সংসার-সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে শিল্প কার্য্য সূচিত হইতেছে। তাই মনে হয় শিল্পে জগৎ ভরিয়া আছে; অথবা শিল্প কার্য্যের সমষ্টিই জগৎ।

এই বিশ্বজগতকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। ভ্রান্ত মানব বহির্জগতের শিল্প লইয়াই ব্যস্ত থাকে; অন্তর্জগতের তত্ত্ব তাহারা খুব কমই গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক মানবের দেহাভ্যন্তরে এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। কেননা সমস্ত জগতে যাহা কিছু আছে প্রতি মানব হৃদয়ে তাহা বিদ্যমান আছে। তাই এক একটি মানব-হৃদয়কে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি জগৎ বলিতে ইচ্ছা করে। সেইজন্য মা[…] অন্তর্জগৎ নামে অভিহিত করিতেছি।

মানবসকল এই অন্তর্জগতের তত্ত্ব গ্র[…] উদাসীন থাকে। মানব বহির্জগতে [...] দেখাইতে পারিলে যেন স্বস্তি লাভ ক[...] অন্তর্জগতের শিল্পচাতুর্য্য সংরক্ষণই যে সব[...] প্রথম কর্ত্তব্য, তাহা তাহারা বুঝে না। [...] নিক পরমেশ্বর প্রত্যেক মানবের অন্তর্জ[...] সম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেককে [...] সাধারণ সম্পত্তি সম্প্রদান করিয়াছেন। [...] দয়া, সত্যবাদিতা ইত্যাদি। তিনি এগুলি [...] পূর্ণ শরীরি করিয়া প্রদান করেন না[...] প্রত্যেক হৃদয়ে আকৃতি অঙ্কিত করিয়[...] মাত্র। তাহার পর যে যত সুচতুর শিল্পী [...] পারে, যে কলাবিদ্যায় যত অধিক নিপুণ হ[...] সে আকৃতিগুলির উপর তত অধিক সৌ[...] তুলিতে সমর্থ হয়—তত অধিক অ[...] করিয়া তুলিবার অধিকারী হয়। আব[...] অলসপ্রবণ, যে যত নিশ্চেষ্ট, যে যত অ[...] যে যত অননুসন্ধিৎসু সে তত অধি[...] হইয়া পড়ে। কারণ ঐ সমস্ত আকৃতি[...] সর্ব্বদা মলিনতা ও দুর্ব্বলতার আবছায়া প[...] তাহারা আকৃতি সকলের অধিকারী[...] দেখিলে, অথবা আকৃতিগুলিকে নিরাশ্রয়[...] থাকিতে দেখিলে, ধীরে ধীরে আসিয়[...] ঘাড়ে চাপিয়া বসে যে তখন সে মলিনত[...] কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। সে দুর্ব্বলতার[...] প্রয়োগ করিতে প্রবল বলের আবশ্যক[...]

উজ্জ্বল লৌহখণ্ড কর্ম্মহীন অবস্থায় যদি মালিক-বিহীনের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে মলিনতা আসিয়া তাহাকে এমতভাবে ঘিরিয়া ফেলে যে, তখন সহজ চেষ্টায় আর তাহার নির্ম্মলতা সম্পাদন করা যায় না; তখন প্রবল শক্তিবিশিষ্ট অগ্নির সাহয্য আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেইরূপ আমাদের হৃদয়াস্থত সদ্‌বৃত্তিগুলি পাপপঙ্কে বিশেষরূপে মলিন হইয়া পড়িলে প্রবল ঐশ্বরিক শক্তি ভিন্ন আর কোন শক্তি তখন সেখানে ঠাঁই পায় না। তাই বলিতেছিলাম, মানব অন্তর্জগতের বড় তত্ত্ব-তলাস লয় না। অন্তর্জ্জগতের সৌষ্ঠব ফুটাইয়া তুলিয়া, ক্ষীণ রেখাগুলিকে পূর্ণাবয়বে পরিণত করিয়া প্রকৃত মানব নামের অধিকারী হইতে, যথার্থ শিল্পী নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে, ঈশ্বরের অভিপ্সিত আজ্ঞা প্রাতপালন করিতে মানব আগ্রহ প্রকাশ করে না।

অন্তর্জগতের শিল্পরক্ষা করা বড় সহজ সাধ্য নহে। বহির্জ্জগতের শিল্পনিপুণতার পুরস্কার মানবের হাতে, আর অন্তর্জ্জগতের শিল্পচাতুর্য্যের পুরস্কার স্বয়ং ভগবানের হাতে। বহির্জগতের কার্য্যকরীশক্তির পুরস্কার ইহকালে, আর অন্তর্জ্জগতের পুরস্কার পরকালে। এখানে কার্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি সকল যত্নচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকে রক্ষা করে; আর সেখানে কার্য্যই কার্য্যের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কার্য্যে অঙ্গহানি ঘটিলে পৃষ্ঠপোষকও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

বহির্জগতে যে কোন একটা কার্য্য সম্পাদন করিয়া যশঃ লাভ করা যায়। যেমন আমি যুদ্ধবিদ্যায় বিচক্ষণ, সে শাস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ইত্যাদি। কিন্তু অন্তর্জগতে তাহা যায় না। অন্তর্জগতে পরমেশ্বর যে সকল সদ্‌বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন সমস্তগুলিরই পূর্ণ পরিপূর্ত্তি চাই। নচেৎ আমি যদি একান্তমনে প্রেমের উৎকর্ষ সাধন করিয়া যাই, আর আমার অন্তরে যদি সত্যের কোন খোঁজ খবর না থাকে তাহা হইলে ভগবান প্রসন্ন হন না। তিনি মানবহৃদয়ের প্রত্যেক সদ্‌বৃত্তিগুলিকে পূর্ণসম্ভারে সৌষ্ঠবসম্পন্ন দেখিতে চান্। তাই যে পারে তাহাকেই তিনি প্রধান শিল্পীরূপে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া ধরেন। তখনই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা মিশিয়া যায়।

অতএব যদি শ্রেষ্ঠ শিল্পী হইতে চাও, তাহা হইলে তোমার অন্তরমন্দিরের কারুকার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হও। তোমার অন্তরস্থিত মধুচক্রে মধু সঞ্চয় কর। একটি ঘরও খালি রাখিও না। প্রতিঘরে পূর্ণ সম্ভারে মধু সঞ্চয় করিয়া লইয়া চল; দেখিবে সেই তুলাদণ্ডধারী বিচারপতি তোমার বহির্জগতের কোন কার্য্যই দেখিতে চাহিবেন না। তোমার অন্তরমন্দিরের কারুকার্য্যখচিত সুন্দর নিষ্কলঙ্ক ছবিটুকু দর্শনে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তোমাকে ক্রোড়ে স্থান দিবেন।

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত।

ইতিহাসের এক অধ্যায়।

(১৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর)

(৩)

মাধোজি সিন্ধিয়ার এক্ষণে প্রবল প্রতাপ। তাঁহার অধীনে যেরূপ পাশ্চাত্য রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি পরিচালিত বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল, তৎকালে

অন্য কোন দেশীয় নরপতির অধীনে তদ্রূপ ছিল না। হোলকার তাঁহার সমকক্ষতা লাভের জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইলেও কৃতকার্য্য হন নাই।

ধনে ও জনে বলীয়ান্ হইয়া সিন্ধিয়া রাজ্যবিস্তারে উৎসুক হইলেন। রাজপুতানা তাঁহার নয়নসমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। মিবারজয়ে তিনি তৎপর হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রিয়পাত্র অম্বাজী ইংলিয়া মিবারের সুবাদারের পদলাভার্থ ব্যাকুল হইলেন। যে মিবার রাজপুতানার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গৌরবস্থল, যে মিবার স্বাধীনতা সংরক্ষণে জগতে অনুপম কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছে—যে মিবার বীরকুলের জন্মভূমি, সেই মিবার করায়ত্ত করণোদ্দেশ্যে সিন্ধিয়ার সৈন্যদল ছুটিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পেরোঁ স্বদলে মিবার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার সহিত অম্বাজী ইংলিয়া এবং রাণাখাঁ চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া পেরোঁ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মিবার জয়ে স্বয়ং সিন্ধিয়াপতিও গমন করিলেন।

মিবার জয় হইল। সেই বিপুল বাহিনীর প্রকোপে মিবারপতিকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। মাধোজী সিন্ধিয়া জয়লক্ষ্মীকে অঙ্কগত হইতে দেখিয়া পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পেরোঁ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মাধোজী পুণায় যাইয়া নিশ্চিন্ত বা অলসভাবে কালযাপন করিতে ছিলেন না। তিনি ১৭৯৪ সালে তাঁহাব বলবৃদ্ধি করিবার মানসে পেরোঁকে দক্ষিণাপথে আহ্বান করিলেন। পেরোঁ মাধোজী সিন্ধিয়ার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মাধোজী ইহধাম ত্যাগ করেন। সিন্ধিয়ার সিংহাসনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলতরাও অধিরোহণ করিলেন। পেরোঁ যদি সেই সময়ে স্বদলে সিন্ধিয়ায় উপনীত না হইতেন, তাহা হইলে দৌলত রাও সিন্ধিয়ার নির্ব্বিবাদে সহজে সিংহাসনারোহণ ঘটিত বলিয়া মনে হয় না।

পরবৎসর উন্নতির চরমসীমা লাভের একটী বিশেষ সুযোগ পেরোঁর পক্ষে উপস্থিত হইল। বহুকাল ধরিয়া হায়দ্রাবাদের নিজামের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা "চৌথ" পাইবার জন্য দাবী করিতেছিলেন, হায়দ্রাবাদের নিজামও উহা প্রদানে অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, কাজেই উভয় পক্ষেই বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা এক্ষণে তিনকোটী টাকা "চৌথ" চাহিলেন। তদনন্তর পেশবার প্রধান মন্ত্রী নানা ফার্ণাবিষ সত্বর উক্ত অর্থ পাইবার জন্য নিজামকে লিখিয়া পাঠাইলেন, নিজাম ইহার যেরূপ উদ্ধত এবং অপমানজনক উত্তর প্রদান করিলেন, তাহার ফলে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয় পক্ষকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল।

পেশবার সাহায্যার্থ যত সামন্ত নরপতি অগ্রসর হইলেন, ইহাদিগের মধ্যে দৌলতরাওই প্রধান। দৌলতরাও পেরোঁর অধিনায়কত্বে সেনাপতি ডি বইলির প্রথম ব্রিগেড ফৌজদল মাইকেল ফিলোনের ছয় দল সেনা, কর্ণেল জন হেসিংয়ের চারিদল সেনা এবং বহুসংখ্যক অশ্বারোহী প্রধাবিত হইল। টুকাজী হোলকার সেনাপতি সিভালিয়ার দদ্রেনেকের (Chevalier Dudrenec) চারিদল সুশিক্ষিত পদাতিক সৈন্য পেশবার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। রঘুজী ভোঁসলা এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সর্দ্দারেরা সৈন্য প্রেরণে ত্রুটি করিলেন না। এইরূপে মহা-

রাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে ১লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য রণযাত্রা করিল। ইহার মধ্যে ২৪ হাজার সুশিক্ষিত পদাতিক ছিল। দৌলতরাও স্বয়ং রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু সৈন্য পরিচালনার ভার পেরেঁার উপর অর্পিত হইল।

এদিকে এই চতুরঙ্গ বাহিনীর গতিরোধার্থ নিজাম আলি খাঁ ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ইহার মধ্যে ১৭ হাজার সুশিক্ষিত পদাতিক ছিল। নিজামের অধীনেও যে সুশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি ছিলেন না, তাহা নহে। উপরে যে সপ্তদশ সহস্র পদাতিকের উল্লেখ করা গেল, উহার মধ্যে কর্ণেল রেমণ্ড নামক জনৈক ফরাসী অধিনায়কের অধীনে একাদশ সহস্র এবং বইও নামক জনৈক মার্কিনবাসীরও কিংলাস নামক জনৈক ইংরাজের অধীনে ছয় সহস্র সৈন্য ছিল।

১৭৯৫ সালের ১১ই মার্চ তারিখে পুরিন্দা নামক স্থানে উভয় সেনার সাক্ষাৎ হয়। নিজামসৈন্য করদ্‌লা (Kardla) নামক স্থান হইতে অগ্রসর হইতেছিল, সুতরাং এই যুদ্ধ করদলা যুদ্ধ বলিয়া ইতিহাসে প্রখ্যাত হইয়াছে। নিজাম-সেনার দক্ষিণভাগে একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনা নিজাম অনিকিণীর পশ্চাদংশ ভীমবেগে আক্রমণ করিল। শত্রু সৈন্যকে সম্মুখে পাইয়া নিজাম-সেনা যুদ্ধার্থ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল। রেমণ্ড সদলে একটা উচ্চস্থানে ২৪টী কামান লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ বিপুল স্বাদী উপস্থিত হইল। পক্ষান্তরে পেশবার-সেনাপতি পরেশরাম ভাও স্বায় অশ্বারোহী সৈন্যদল ও সিভালিয়ার দুদ্রেনেকের সেনাসহ স্বীয় ব্যূহের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণাংশে বেরারের রাজার সৈন্য এবং বামাংশে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পদাতিদল স্থাপিত হইল।

উভয়পক্ষ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন, নিজামের স্বাদী সৈন্য মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীর মধ্যাংশ আক্রমণ করিল। নিজামের এই ভীষণ আক্রমণ পরেশরাম ভাও সহ্য করিতে পারিলেন না। পরেশরাম স্বয়ং আহত হইলেন, তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মধ্যভাগে যখন এইরূপ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন দক্ষিণ ও বামভাগস্থ উভয়পার্শ্বে সৈন্যদল পরস্পরে আসিয়া এত নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল যে, বন্দুকের গুলি উভয়পক্ষই উভয় পক্ষের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পেরেঁা রণনৈপুণ্য সহকারে এরূপ স্থান অধিকার করিলেন যে, সেই স্থান হইতে তাঁহার অধীন ৩৫টী কামান হইতে বজ্রনিনাদে গোলাবর্ষণ হইয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। পেরেঁার অব্যর্থ আগ্নেয়াস্ত্রের বেগ নিজামের অশ্বারোহী সেনা সহ্য করিতে পারিল না, তাহার সেনাপতি রেমণ্ড সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু রেমণ্ডের অধীন রণদক্ষ পতাতিকদল পরাজয় স্বীকার করিল না। উভয় পক্ষে তখন ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল। সেই আহবে কত শত বীরের প্রাণ নষ্ট হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাগলক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন তাহার স্থিরতা নাই। কখন নিজামের পক্ষে, কখন মহারাষ্ট্রীয়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এইবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাজয় বুঝি অবশ্যম্ভাবী হইল। এরূপ সময়ে নিজামের আদেশ হইল—সেনাপতি রেমণ্ড সসৈন্যে যেন রণাঙ্গণ হইতে পিছাইয়া আইসেন।

এই আকস্মিক আদেশে রেমণ্ড মর্ম্মাহত হইলেন। এদেশের যুদ্ধে যে কারণে প্রায় দেশীয় নরপতির পরাজয় ঘটিয়াছে, এক্ষেত্রেও সেই কারণের অভাব ঘটে নাই। নিজাম, অন্তঃপুরাঙ্গনা লইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন উভয়পক্ষে ভীষণ সমর চলিতেছে—কামানের গর্জ্জন, বন্দুকের শব্দ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অশ্বের হ্রেষা, গজের বৃংহতি, আহতের আর্ত্তনাদ প্রভৃতিতে দিগন্ত পূর্ণ হইতেছে—সেই সময়ে নিজামের প্রধানা বেগম ভীতিবিহ্বল-চিত্তে যুদ্ধের কঠোর দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া নিজামকে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুনয় বিনয়, কাকুতি মিনতি নিজামকে বিচলিত করিল। নিজাম কাজেই বাধ্য হইয়া রেমণ্ডকে হটিয়া আসিতে বলিলেন।

এই নিদারুণ আদেশ—এই বিবেক-বিমূঢ়তা রেমণ্ডের মস্তকে বজ্রসম পতিত হইল। রেমণ্ড প্রথমতঃ আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিজাম বারংবার যখন আদেশ প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তখন অনন্যোপায় হইয়া রেমণ্ডসাহেব তাহা শিরোধার্য্য করিলেন। এই সময়ে সন্ধ্যা তাঁহার ধূসরাঞ্চলে যুদ্ধক্ষেত্র আবরণ করিতে লাগিলেন। রেমণ্ড ভাবিলেন, যদি রজনী সমাগমে শত্রুসৈন্য শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করে, তাহা হইলে পর দিবস প্রত্যুষে তিনি নিজামের অনুমতি লইয়া পুনরায় রণপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু রেমণ্ডের এই আশা পূর্ণ হইল না। পেরেঁা এদেশের যুদ্ধব্যাপার সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। তিনি দেখিলেন, এ সু
ক্রমেই পরিহার্য্য নহে। কাজেই তিনি
দ্ধাবনে বিরত হইলেন না। নিশার
শত্রুসৈন্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে ন
তিনি মধ্যে মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ ক
লেন। ইহাতে শত্রুপক্ষ নিশ্চিন্ত হইতে
সুতরাং পলায়নে তাহারাও ক্ষান্ত হইতে

ইতিমধ্যে নিজামের আদেশ এবং প্র
ঘন ঘন আসিতে লাগিল যে, রেমণ্ড কে
করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন
অবশেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একস্থা
করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।
সময় পেরেঁার অগ্রগামী সৈন্যদল রেমণ্ডে
উপর আসিয়া পড়িল। তখন পেরেঁা
য়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন
সেনা ভয়াকুলচিত্তে কামানাদি পরিত
পলায়নপর হইল। নিজামের পরাজি
অবশেষে গিরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য করদ্‌লা দুর্গে
করিল।

পেরেঁা অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন
করদ্‌লা দুর্গ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে
সাহেব বিশেষ বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক নি
করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন
কামানাদি আসিয়া উপস্থিত হইল—
লাভ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইল,
সন্ধির প্রস্তাব না করিয়া থাকিতে
যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিন কোটী টাকা
সার্দ্ধ তিন লক্ষ টাকা আয়ের একটা

নিজাম অব্যাহতি লাভ করেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি যাহাতে রক্ষা হয়, তজ্জন্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে প্রতিভুস্বরূপ পুণাতে প্রেরণ করিতে নিজাম বাধ্য হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কাশীধাম।

(১৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর)

কর্ণঘণ্টা বা ঘণ্টাকর্ণ।

এ প্রদেশবাসী সাধারণ ব্যক্তি এই ঘণ্টাকর্ণ তীর্থকে করণঘণ্টা বা কণ্‌ঘটা বলিয়া উল্লেখ করে। প্রাচীন ইতিহাস সকলের মধ্যে ইহা ঘণ্টাকর্ণ হ্রদ বলিয়াও বর্ণিত আছে। ইহা একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন পুষ্করিণী বা কুণ্ড। ইহারই তীরে ঘণ্টাকর্ণ নামক জনৈক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘণ্টাকর্ণেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। ইহার চারিপার্শ্বস্থ পল্লী 'করণঘণ্টা বা কণ্‌ঘটা মহল্লা' বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান টাউনহলের অনতিদূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এই মহল্লা অবস্থিত।

ঘণ্টাকর্ণ হ্রদের তীরেই বেদব্যাসেশ্বর মন্দির। এই মন্দিরমধ্যে বেদব্যাসের মূর্ত্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ঘণ্টাকর্ণ হ্রদের নিকটেই চিত্রঘণ্টা ও চিত্রঘণ্টেশ্বরীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরস্থিত মূর্ত্তি অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই সকল তীর্থ দর্শন করিবার জন্য প্রতি শ্রাবণ মাসে এখানে বেশ মেলা হইয়া থাকে।

কাশীদেবী।

পূর্ব্বোক্ত মহল্লার অনতিদূরে কাশীপুরা নামক এক মহল্লা আছে, তথায় একটী বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে কাশীর অধিষ্ঠাত্রী কাশীদেবীর অতি প্রাচীন মন্দির এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাশী দর্শনাভিলাষী ভক্ত যাত্রীগণ এই শক্তিপীঠ দর্শন করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। অনেকের বিশ্বাস, এই কাশীদেবীর মন্দিরই কাশীধামের কেন্দ্রস্থল। এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে ভূত ভৈরবের মন্দির, এইস্থানে বারগণেশ ও জগন্নাথাদি বহু দেবমন্দির অবস্থিত।

মৎস্যোদরী।

কাশী সহর হইতে রাজঘাট যাইবার পথে টাউনহল ছাড়াইয়া উত্তর পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই মৎস্যোদরীর প্রাচীন তীর্থ বা কুণ্ড দৃষ্ট হইত। কাশীখণ্ড ও শিবপুরাণাদিতে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। এই তীর্থে স্নান করিলে মানবের বার বার জন্মগ্রহণ জনিত গর্ভযন্ত্রণা বিদূরিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পুণ্যকামী ভক্তের সে বাসনা পরিতৃপ্তির আর উপায় নাই। বহুদিন হইতে মৎস্যোদরী কুণ্ডের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সরকার পক্ষ হইতে তাহা ক্রমে মৃত্তিকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বালককালে মৎস্যোদরীতে সামান্য

জল দেখিয়া ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রায় সমভূমি হইয়া গিয়াছে, সে তীর্থের আর চিহ্নমাত্রও নাই বলিলে হয়। এক্ষণে মাত্র একটী ঘাট বিদ্যমান আছে। এখন আর কাহাকেও তীর্থ বলিয়া তথায় যাইতে দেখা যায় না। উহার নিকটেই একটী অতি জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ময়ূরবাহন মৎস্যেশের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরমধ্যে নরসিংহেরও একটী মূর্ত্তি আছে। নিকটেই মহর্ষি দুর্ব্বাসারও একটী জীর্ণমূর্ত্তি রহিয়াছে। কাশীখণ্ডোক্ত প্রসিদ্ধ ওঁকারেশ্বরলিঙ্গের বা প্রণবেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও এই মৎস্যোদরীর উত্তরদিকে গলির মধ্যে অবস্থিত। এই পল্লী ওঁকারেশ্বর মহল্লা বলিয়া পরিচিত।

গঞ্জীসাহিদান মস্ক।

ইহা একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন মসজীদ। প্রায় পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে ইহা পুনরায় লোকনয়নের নিকট আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজঘাটের সন্নিকট জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের বাটীর পার্শ্বে তাহারই অধিকৃত কয়েক বিঘা পতিত ভূমি ছিল। এক দিবস তাঁহার ভৃত্য কোনও কার্য্যোপলক্ষে সেই স্থানে যাইলে একটী বড় গর্ত্ত দেখিতে পায় ও অনতিবিলম্বে তাহার প্রভুকে এবিষয়ে সংবাদ দেয়। সেই ভদ্রলোকটী সামান্য মৃত্তিকা উঠাইয়াই নিম্নে একটী গৃহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। গুপ্ত ধনাগার ভাবিয়া প্রথমে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তাহা খনন করিতে থাকেন, পরে এই সুন্দর মসজিদটী বাহির হয়। ৬০টী স্তম্ভ বিশিষ্ট সুন্দর গৃহটী মুসলমানীধরণে নির্ম্মিত হইলেও তাহার স্তম্ভাদির কারুকার্য্য দেখিলে বৌদ্ধ স্থাপত্যের সুস্পষ্ট আভাস বলিয়া মনে হয়। অনেকেই অনুমান করেন, পূর্ব্বে ইহা কোন বৌদ্ধবিহার ছিল, পরে মোসলমান আধিপত্য সময়ে মসজিদে পরিণত হইয়া থাকিবে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহা দেখিবার বিষয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

হাট বাজার।

আমাদের হাট বাজার আছে, আমরা হাট বাজার করি। বিবেকেরও হাট বাজার আছে, সে হাট বাজার করে। আমরা হাট বাজার করি আমাদের দেহ রক্ষার জন্য, শরীরের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য। বিবেকও তাহার বিবেকত্ব সংরক্ষণের জন্য হাট বাজার করিয়া থাকে।

আমাদের দেহখানিকে অন্তর ও বাহির এই দুই অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। অন্তরের মালিক বিবেক এবং বাহিরের মালিক মন। কারণ অন্তরস্থ কার্য্যসকলে বিবেক ফুটিয়া বাহির হয় এবং বাহিরের কার্য্যে মনকে প্রকাশমান দেখা যায়। মনের মালিকও বিবেক। মন বিবেকের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। মন বাহির লইয়া ব্যস্ত, আর বিবেক অন্তরভাগ লইয়া ব্যাকুল। বাহিরের জন্য বিবেক মনের উপর ভার অর্পণ করিয়া কিছু

নিরাপদ হয়—কিছু নিশ্চিন্ত হয়—কিছু অলস'ও হইয়া থাকে।

মন আবার ইন্দ্রিয় সকলের আশ্রয়ীভূত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী; এ কারণ ইন্দ্রিয়সকল ক্রমে মনের প্রধান সাহায্যকারী হইয়া দাঁড়ায়। মনে তখন অলসতা আসে।

অন্ধকার যেমন আলোক নষ্ট করে, অলসতাও সেইরূপ ব্যাকুলতাকে শক্তিহীন করে। শক্তিহীন হইলে দৃষ্টিশক্তি কমিয়া আসে। বিবেক ও মনে যখন অলসতা আইসে, তখন তাহারা শক্তিহীন হয়। সে শক্তি তখন সাহায্যকারীদের উপর যাইয়া বিন্যস্ত হয়। সাহায্যকারীদের ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে তাহারা সে শক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া লইয়া গ্রহণ করে।

বিবেক—মন যখন শক্তিহীন হয়, তখন তাহাদের দৃষ্টিশক্তি আর পূর্ব্ববৎ থাকে না। দৃষ্টিশক্তি কমিয়া আসিলে, সাহায্যকারী সমস্ত খাম্-খেয়ালী হইয়া উঠে। একজন জমীদার যতক্ষণ পূর্ণ প্রতাপে অধীনস্থ কর্ম্মচারীসকলকে পরিচালিত করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার জমীদারী অবিকৃত অবস্থায় থাকে; আবার যখন অলসতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কর্ম্মচারীসকল প্রবল হইয়া উঠে। পরে অলসতায় জমীদারকে দৃষ্টিহীন করিয়া ফেলিলে কর্ম্মচারী সমস্ত খাম্-খেয়ালী হয়। তখন কর্ম্মচারীসকল জমীদারকর্ত্তৃক পরিচালিত না হইয়া জমীদারই কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক পরিচালিত হন্। কর্ম্মচারীসকল সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে; তাহারা যেন সমস্ত জমীদারীর মালিক হইয়া পড়ে, জমীদার নিস্তেজভাবে একদিকে অবস্থান করিতে বাধ্য হন।

সেইরূপ বিবেক ও মন অলস হইয়া পড়িলে, তাহারা আর হাট বাজারের খবর লয় না। মন, তাহার অধীনস্থ লোকে যাহা হাট বাজার করিয়া লইয়া আসে, তাহাই গ্রহণ করে। বিবেকও তখন আর মনের কোন কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করে না। তখন তাহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে শিখে। কারণ অলসতা নির্ভরতাকে প্রশ্রয় দেয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়সকল ও মনের অধীনস্থ সমস্ত লোক কিছু স্বাধীন হইয়া পড়ে। স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে, তাহারা হাট বাজারে যেরূপ ইচ্ছা ব্যাপার করে, বিবেক ও মন পক্ষপুষ্ট শাবকের ন্যায় নিস্তেজভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়।

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্যামাসঙ্গীত	(শ্যামানন্দ)	১৮৫
ঠাকুরমা	(কবিরঞ্জন শর্ম্মা)	১৮৬
ভাস্কর্য্য	(শ্রীমন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী)	১৮৮
নিবেদন	(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)	২০৫
শিল্প ও শিল্পী	(শ্রীঅরবিন্দ দত্ত)	২০৬
ইতিহাসের এক অধ্যায়	(শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)	২০৮
কাশীধাম	(শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী)	২১২
হাট বাজার	(শ্রীঅরবিন্দ দত্ত)	২১৩

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বক্তিশ্বাখা—বর্বিয়াকুণ্ড।

THE INDIAN ART SCHOOL, CALCUTTA.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তিরূপে বিরাজমান !

৯ম খণ্ড } ভাদ্র, সন ১৩১৭। { ১২শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

(১)

মাগো !
জানিনে ডাকিতে
কি বলে ডাকিব ?
না ডাকিতে তুমি আসিও।
হৃদয়-আসন
জানিনে পাতিতে
তুমি এসে পেতে বসিও॥

(২)

আঁধার ঘরেতে
কেবলি আঁধার
তুমি এসে আলো জালিও।
হেরিব তোমার
মূরতি মধুর
চোখ্ ছুটি মাগো ! খুলিও॥

(৩)

কোন দিন মাগো !
সাধি নাই বীণা
কেমনে সাধিব বলিও।
সে শুভ মুহূর্ত্তে
যদি ভুলে যাই
তুমি মা ! ঝঙ্কার তুলিও॥

(৪)

শ্রান্ত কলেবরে
হা'ল ছেড়ে দিলে
তুমি এসে হা'ল ধরিও।

পিছিল সংসারে
যদি প'ড়ে যাই
কোলে টেনে মাগো! তুলিও॥

(৫)

যাতনার দিনে
তেয়াগিলে সবে
মুখ তুলে তুমি চাহিও।
নিরাশ হৃদয়ে
আশার সঙ্গীত
ধীরে ধীরে তুমি গাহিও॥

(৬)

অক্ষয় অনন্ত
মাতৃ আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ মনে শিরে ধরিও।
জানিনে গাঁথিতে
ভকতি মালিকা
যা পারি, গলেতে পরিও॥

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত।

বাঙ্গালায় আর্য্যজাতির আগমন।

"পরাক্রান্ত আর্য্যজাতি, করে লয়ে বেদ-বাতি
এল পঞ্চনদ পার হ'য়ে,
ব্যাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তময়, অনার্য্য অসভ্য-চয়
কাননে পলায় প্রাণ ল'য়ে।
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণেতে শিলোদয়,
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দ্দেশ
পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ব্বসীমা নিরূপণ,
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ।
এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্যভূমি পরিহরি,
যে যাইত তার জাতি নাশ
দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে, কিংবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,
ছিল মাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস।
কিন্তু মধুমক্ষিকার, যত বাড়ে পরিবার,
ততই চক্রের সীমা বাড়ে
সেইরূপ আর্য্যবংশ, অনার্য্যে করিয়া ধ্বংস,
ব্যাপ্ত ভারতের চক্র-বাড়ে!
এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে,
আর্য্য ভয়ে ওড্র ভিল্ল কুলি
দ্বাপরের শেষভাগে, রণজয় অনুরাগে,
সমাগত আর্য্য কতগুলি।—

(কাঞ্চী কাবেরী কাব্য—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।)

বাঙ্গালায় আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্য-আধিপত্য বিস্তার হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই অসভ্য অনার্য্যগণ এইস্থানে বসবাস করিত। আর্য্যগণ কখন কি ভাবে বাঙ্গালা-বিজয় করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহাদিগের অপ্রতিহত ক্ষমতাবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইবার উপায় নাই। কারণ পূজনীয় আর্য্যগণ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস হয়ত লিখিয়া রাখিতেন না, অথবা নানা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে তাহার ধ্বংস হইয়া থাকিবে। বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ যাহা এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা

যায় যে, তাঁহারা বাঙ্গালার অনার্য্যগণকে এক সময় পরাস্ত করিয়াই এদেশে বাস করিয়াছিলেন।

যে সকল অনার্য্য জাতি আর্য্যগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরা এখনও বাঙ্গালার সীমান্তে ও নানা স্থানে বাস করিয়া আছে। হিমালয় পর্ব্বতে ভোট, লেগ্‌ছা, লিম্বু, কিরাতী; বাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমায় মুগ, লুসাই, কুকি, কারেণ, তালাইন প্রভৃতি, বাঙ্গালার পশ্চিমদিকে সাঁওতাল, কোল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়ুয়া ও ধাঙড় এবং ব্রহ্মপুত্র-তীরে কাছাড়ী, মেছো ও ধিমাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতি বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেছে।

বিজিত অনার্য্যদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে আর্য্য শূদ্রদিগের সহিত মিশিয়াও গিয়াছে। সেই সুদূর অতীত যুগে যাহারা মিশিয়া গিয়া আর্য্য ঋষি-কুলের স্মরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাদেরই সন্তান সন্ততি-গণ অধুনা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছে। (১) ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন নাই। (২) তাহাদের পৃথক্ ধর্ম্মযাজক আছে। উক্ত ধর্ম্মযাজকগণের নাম 'পণ্ডিত'। উদাহরণ যথা,—কাওরা, মুচি, ডোম, মেথর, হাড়ি ও জেলে। ইহাদের সহিত সৌসাদৃশ্য জাতি অদ্যাপি সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য অসভ্য জাতিগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) অনার্য্যগণ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি ও সম্পূর্ণ অসভ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভাবিশিষ্ট কোন ধর্ম্ম ছিল না। সুসভ্য সাহসী যোদ্ধা আর্য্য-হিন্দুগণকর্ত্তৃক অনায়াসেই তাহারা পরাজিত হইয়া কতক পর্ব্বতে ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, আর কতক আর্য্য-হিন্দুগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল।

বৈদিক কাল।—পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "ভ্রমণশীল" এবং "কর্ষক"। (৪) বোধ হয়, পুরাকালীন যে আদি সভ্য-সম্প্রদায় মানবজাতি হিমলয়ের সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে পৃথিবীর নানাদেশে গমনকরিয়া রাজত্ব-বিস্তার ও কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই আর্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর্য্য-জাতির যে সম্প্রদায় ভারতে নামিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রথমে গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু ও অন্তঃসলিলা সরস্বতী বিধৌত পুণ্যভূমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বসতি করিতেন। পরে সেই সকল আর্য্যপরিবার ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে, অন্যান্য প্রদেশ ক্রমে জয় করিয়া অধিকার করিতে থাকেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশ ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হয়। বাঙ্গালা দেশ তখনও আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে। বৈদিকযুগে আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরের প্রদেশগুলি ম্লেচ্ছপ্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত; সুতরাং বাঙ্গালা তখন ম্লেচ্ছভূমি বলিয়াই পরিগণিত।

এই সময়ে আর্য্যগণ যেমন রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উন্নতি সাধনার্থ তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের ভার পৃথক্ পৃথক্

---

(১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "প্রথম শিক্ষা—বাঙ্গালার ইতিহাস।"
(২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—"বিবিধ প্রবন্ধ।"
(৩) Non. Aryan Dictionary.
(৪) নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—"বিশ্বকোষ।"

সম্প্রদায়ের উপর পড়ায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইল। শরণাগত বিজিত অনার্য্য বা দস্যুজাতি আর্য্য-হিন্দু সমাজের দাস বা শূদ্র-সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিল।

মনুসংহিতা।—বৈদিককালে কেবলমাত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া অভিহিত হইত, কিন্তু পরবর্ত্তী মনুসংহিতাবর্ণিত সময়ে পূর্ব্বদিকে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রকূল এবং উত্তরে ও দক্ষিণে গিরিমধ্যবর্ত্তী প্রদেশগুলি অর্থাৎ সিন্ধুনদ ও বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরি-মধ্যস্থিত প্রদেশগুলিই আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেব নদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"
"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাং শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোনৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥"
"হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যয় যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"
"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণনাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥"
"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাস সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

মনুসংহিতা।

অতএব মানব ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণয়নকালে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের একাংশ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হয় নাই। এবং এতদ্দ্বারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে বহুদিন পরে আর্য্যজাতি বঙ্গদেশে আসিয়া বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু বঙ্গদেশে বৈদিকধর্ম্ম প্রচারের কিংবা মনুসংহিতা-সঙ্কলন-কালের পূর্ব্বে যে আর্য্যজাতি এদেশে আগমন করেন নাই, এমত অনুমান করা যাইতে পারে না; বরং তাঁহারা আসিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়াগিয়াছিলেন ইহাই বলা যাইতে পারে। কেন না মনুসংহিতার এক স্থলে আছে—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রহ্মণাদর্শনেন চ॥"
"পৌণ্ড্রাকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" শীর্ষক প্রস্তাবে ইহাঁদিগকে অনার্য্যজাতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে,—"মনুসংহিতা সংকলন কালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-বিহীন * অনার্য্যজাতির বাসস্থান ছিল"। এইরূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রমসঙ্কুল নহে, তাহাতে সন্দেহ আছে। "ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মবিহীন আর্য্যজাতির বা "ব্রাহ্মণ-বিহীন আর্য্যজাতির" বাসস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানকালে ইংরাজাধিকৃত হইলেও ভারতবর্ষ যেমন ইংরাজ ভূমি † নহে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডা ইংরেজভূমিতে পরিণত হইয়াছে; সেইরূপ ব্রহ্মাবর্ত্ত বা মধ্যদেশের ন্যায় তৎকালে বঙ্গদেশ আর্য্যভূমি-রূপে পরিণত হয় নাই—এই মাত্র বিবেচনা করা যাইতে পারে। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশে স্পৃহনীয় বাসস্থান ছিল না

* অনার্য্যজাতির আবার ব্রাহ্মণ আছে কি?
† ঈংরাজগণ ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকজাতি কি?

বা একেবারে বাস-যোগ্য ছিল না, এমত হইতে পারে।

ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতিপূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না। হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মুখ-নীত কর্দ্দমে বঙ্গদেশ সৃষ্ট হইয়াছে। আজকাল সুন্দরবন অঞ্চলে যেমন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ বাসের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন না, পুরাকালে বোধ হয়, সেইরূপ বঙ্গদেশ হিংস্রাদিজন্তু পূর্ণ বনজঙ্গলে আবৃত ছিল বলিয়া উচ্চশ্রেণীর আর্য্য-হিন্দুগণ বাসযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রথমে বিজিত ও দূরীভূত অনার্য্যগণ আসিয়া বসবাস করে। পরে আর্য্য শূদ্রগণসহ কৃষক বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্য করণাভিলাসে আসিয়া বাসের উপযুক্তরূপে পরিণত করিলে বাণিজ্যকরণাভিলাষী বৈশ্যগণ এবং রাজ্যলোভীব্রাহ্মণক্ষত্রিয় ও মাহিষ্যগণ আসিয়া তাহাদের উপর রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মযাজক পুরোহিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের পশ্চাদনুবর্ত্তী হয়েন।

যাহা হউক স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তৎকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সামাজিক শাসন দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিল। বঙ্গদেশ তখন আর্য্য-ভূমি-রূপে গণ্য হয় নাই। অতএব যে কেহ আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিতেন, তিনি আচারভ্রষ্ট ও আর্য্যসমাজচ্যুত হইতেন। এমন কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-বাসী আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে অনার্য্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলিতেন। সুসভ্য পাশ্চাত্য য়ুরোপদেশেও বর্ত্তমান কালে এরূপ সংস্কার কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইংরাজগণের আধুনিক 'জন্মাধিকার' বা বার্থ-রাইট (Birth-right) ইহার একটী প্রমাণ। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলে ইংরাজগণ ইংলণ্ডীয় জন্মাধিকার হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহারা কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করিতে পারেন্ না। তৎকালীন বঙ্গদেশীয় আর্য্যগণ ও আধুনিক ভারতজাত ইংরাজগণের অবস্থা তুল্যরূপে বিবেচিত হইতে পারে।

অসবর্ণ-বিবাহ ও জাতি-বিভাগ।—বৈদিককালে হিন্দু-সমাজে কেবল চারিবর্ণের উৎপত্তি হয়। মনুর সময়ে অসবর্ণ-বিবাহের রীতিক্রমে বর্ণ-সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। লোকে সবর্ণা স্ত্রী ব্যতীরেকে অন্যবর্ণ হইতেও মনোনীত স্ত্রী বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিতে পারিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যা ব্যতীরেকেও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রকন্যাকে পত্নীত্বে বিধিপূর্ব্বক পরিণয়ে গ্রহণ করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণও ঐরূপ বৈশ্য ও শূদ্রকন্যার পাণি-গ্রহণ করিতেন। অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ-পদ্ধতির ফলে যে, নানাবিধ বর্ণসংকর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহারা মাতা বা পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত না, সুতরাং স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইত। বাঙ্গালাদেশে বৈদিকধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্যভূমি উত্তরপশ্চিম ভারতে একই সুসভ্য আর্য্যজাতির সমাজে বহুবিধ বর্ণসংকর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল ও তাহারা পরস্পর স্বাতন্ত্রতা রক্ষা করিত এবং ব্রাহ্মণেরা সকল বর্ণের বা সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব করিতেন। মনুসংহিতা সংকলনকালের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে আর্য্যদিগের অধিকারবিস্তার হইয়াছিল, কিন্তু সেই আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী আর্য্যসমাজের

বহির্ভূত ও আচারভ্রষ্ট হইয়া অনার্য্যদিগের ন্যায় হীন অবস্থাপন্ন হইতেছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম তথনও বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে নাই, তবে আর্য্যহিন্দু-সমাজের নানাবিধ বর্ণসঙ্কর জাতির আবাসভূমিরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ হইতেছিল। কিয়ৎকাল পরে দ্বাপরযুগের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোতে বঙ্গীয় হিন্দু-ধর্ম্ম ভাসিয়া গেল।

রামায়ণ ও মহাভারত।—রামায়ণ ও মহাভারত-বর্ণিত সমাজের সহিত মনুসংহিতা-বর্ণিত সমাজের কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। তথনও ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের নেতা, শাস্তা, দণ্ড-প্রণেতা, আইনকর্ত্তা, ও ধর্ম্মসংরক্ষক। ক্ষত্রিয়গণ রাজা ও দেশরক্ষক। আর্য্য-সমাজ যেমন নানাবিধ বর্ণসঙ্কর জাতি-বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তেমনই ভারতবর্ষও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। চন্দ্র বা সূর্য্যবংশীয় রাজগণ কথন কথন সমুদায় সামন্তরাজ্যের সম্রাট্ হইতেন। ক্ষত্রিয়রাজগণ কেহ কেহ সম্রাট্ হইবার বাসনায় অন্যপ্রদেশীয় রাজগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। মহাভারত-বর্ণিত কালে মগধাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, উত্তর ভারতের সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার বিনাশ-সাধনের পর চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যুধিষ্ঠির ভারতের রাজচক্রবর্ত্তীত্ব করিয়াছিলেন।

মহাভারতের সভাপর্ব্ব উনত্রিংশত্তম অধ্যায়ে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—*

"অনন্তর মেদোগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকি কচ্ছবাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত ও কর্কটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।"

যদিও রাজগণের নাম বা বিশেষ বিবরণ বিবৃত হয় নাই, তথাপি 'এতদ্বারা বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশে নিশ্চয় আর্য্যরাজকুল রাজত্ব করিতেন। মহাভারতকার এস্থলে বঙ্গদেশাধীশ্বরগণ ও সুহ্মদিগের অধীশ্বরগণকে ম্লেচ্ছ বলিতেছেন না। মহাভারতের অনেক স্থলেই অনার্য্যগণ ম্লেচ্ছ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মহাভারত-বর্ণিত সময়ে দ্বাপর-যুগের শেষভাগে আর্য্য-রাজগণ ম্লেচ্ছগণকে মহাসাগরকূলে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

এই মহাভারত-বর্ণিত বঙ্গদেশ ও আধুনিক বাঙ্গালাদেশ কি একই? পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। এখনকার বাঙ্গালাদেশের কোন নামান্তরও ছিল না। যেখানে মহাভারতীয় মগধ, অঙ্গ, মেদোগিরি, পুণ্ড্র, কোশিকি-কচ্ছ, বঙ্গ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর, তাম্রলিপ্ত, মৎস্য, কলিঙ্গ, ওড্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্ব স্ব প্রধান রাজ্য ছিল, এক্ষণে

* ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

সেই স্থানসমূহ বাঙ্গালাদেশের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর-কালীন পাল বা সেনবংশীয় রাজগণের শাসনকালে গৌড় বা লক্ষণাবতী যেমন একটী রাজ্য ছিল, তেমনই তাম্রলিপ্ত, ওড্র প্রভৃতি আরও স্বতন্ত্র কয়েকটী রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না। এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার একটী অংশ মাত্র। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালার অনেকাংশ কান্যকুব্জের গুপ্তরাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের পর বঙ্গদেশে পুণ্ড্র, কামরূপ, সমতট কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত এই পাঁচটী রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়।

ঐতিহাসিককাল।—মহাভারতের কথা ছাড়িয়া ঐতিহাসিকযুগের প্রাক্কালে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব যে বৎসর মানব-লীলা সংবরণ করেন, সেই বৎসরই বঙ্গদেশের রাজপুত্র "বিজয়সিংহ সাতশত সঙ্গী লইয়া" সমুদ্রযাত্রা করতঃ সিংহল দ্বীপ জয় করেন। "সুতরাং খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর্য্যদিগের অধিকার বিস্তার * হইয়াছিল এবং তাহারা বর্ত্তমান ইংরাজদিগের ন্যায় সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া বিদেশ জয় করিয়াছিলেন।" অতএব "বাঙ্গালার হিন্দুরা † প্রায় দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় তাম্রলিপ্ত (তমলুক) তথন সমুদ্রতীরে একটী প্রধান বন্দর ছিল। সেথান হইতে লোকে সুমাত্রা বালী প্রভৃতি দ্বীপে যাতায়াত করিত। ঢাকাই মসলিন তথনই বিখ্যাত হইয়াছিল। গ্রীস ইটালী প্রভৃতি দেশের বণিকেরা উহা আদরের সহিত কিনিয়া লইয়া যাইতেন।"

বিশ্বকোষ-প্রণেতা লিখিয়াছেন।—"খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ পাশাপাশি চলিতেছিল। এ সময়ে বৈশ্যসমাজ দুই সম্প্রদায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈশালী শ্রাবস্তী পাটলীপুত্র, কান্যকুব্জ, উজ্জয়িনী, সৌরাষ্ট্র, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বহুজনাকীর্ণ ও বাণিজ্যপ্রধান সহরের প্রত্নতত্ত্ব হইতে যে ভূরি ভূরি নিদর্শন বাহির হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় বৈশ্যসমাজের উন্নত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।"

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন উত্তরবঙ্গের ও তাম্রলিপ্ত দক্ষিণ বাঙ্গালার দুইটী প্রধান নগর। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক যুগের প্রাক্কালে বঙ্গদেশে বিশিষ্ট পরিমাণে আর্য্যগণের বসবাস হইয়াছিল। কারণ ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্যগণ পূর্ব্বেই রাজ্যাধিকার করতঃ কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া ধনাগমের পন্থা পরিষ্কার করেন। উন্নত বৈশ্যসমাজও বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণগণও পৌরহিত্য করিতে আসিয়াছিলেন। সেনরাজগণের পূর্ব্বে বৌদ্ধশাসনকালেও যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণপ্রভুত্ব বিদ্যমান ছিল তাহা বারান্তরে প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।

সেবানন্দ—শ্রীবাবুরাম কয়াল।

* রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস।
† ঈশানচন্দ্র ঘোষ—শিশুপাঠ্য বঙ্গদেশের ইতিহাস।

কাশীধাম।

(২১৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর)

লাটভৈরো।

রাজঘাট ষ্টেসন হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড ধরিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেই বেঙ্গল নর্থওয়ে রেলওয়ের ছোট লাইন দৃষ্ট হইবে, সেই রেল পথ পার হইয়াই সামান্য উত্তরদিকে যাইলে এই লাটভৈরবের প্রসিদ্ধ স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বেই একটী বিস্তৃত পুষ্করিণী, অথবা উক্ত পুষ্করিণীর উত্তর পাড়েই এই স্তম্ভটী প্রোথিত। এই পুষ্করিণীর বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে এই স্তম্ভের কথাই বলিতেছি—ইহার সহিত একটী বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে। সাধারণের নিকট ইহা লাটভৈরব বলিয়া পরিচিত হইলেও, ঐতিহাসিকগণ ইহাকে কুলস্তম্ভ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থেও কুলস্তম্ভের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদগণের অনেকে এই স্তম্ভ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ইহা বৌদ্ধরাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত; কেহ বলেন, তাহা নহে বিক্রমাদিত্যই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। যিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা হউন না, ইহা এক্ষণে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থস্তম্ভ বলিয়া পূজিত। কাশীবাসী হিন্দুমাত্রের চিরবিশ্বাস ইহাই সনাতন ধর্ম্মের মূলস্তম্ভ স্বরূপ। ইহা আছে বলিয়াই এখনও ধর্ম্ম আছে—যে দিন ইহা সমূলে ধ্বংস হইবে সেই দিন এই সনাতন ধর্ম্মও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। সেই কারণ কাশীর প্রত্যেক ধর্ম্মযাজক পাণ্ডাগণ অতি সাবধানে ইহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পূর্ব্বে ইহা বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন সেই মন্দির ধ্বংস করিয়া মস্‌জিদে পরিণত করেন, তখনও ইহা অক্ষুন্ন অবস্থায় ছিল, ইহাদ্বারা মসজিদ প্রাঙ্গণের-শোভা-বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই ইহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই, বিশেষ ইহা হিন্দুর যে এত আদরের সামগ্রী, হয়ত তাহা সম্রাট বা তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের আদৌ জানা ছিল না, সুতরাং মসজিদান্তর্গত হইলেও হিন্দুগণ নিরুদ্বেগে যথারীতি স্তম্ভের পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া আসিতেছেন।

ধর্ম্মস্থানাধিকারী যাজক বা পূজারীদিগের অবস্থা সর্ব্বধর্ম্মে সর্ব্বস্থানেই প্রায় একরূপ অর্থলালসায় এই সকল লোক ক্রমে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া ধর্ম্মস্থানের আবর্জ্জনারূপে পরিণত হয়। কোন ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষেই ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ এমনই অনর্থের মূল! হিন্দু যাত্রীগণ মসজিদ-প্রাঙ্গণে আসিয়া সেই স্তম্ভের পূজা করে—রীতিমত দর্শনী দেয়—হিন্দু পাণ্ডারই তাহা প্রাপ্য হইলেও সুবিধামত মোল্লাসাহেব ও তদনুচরগণ তাহাতে ভাগ বসাইতে আরম্ভ করিলেন। লালসা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, পূজা দর্শনীর অংশমাত্র লইয়া তাঁহারা আর তৃপ্ত হইতে পারিলেন না—সর্ব্বগ্রাসই তখন তাঁহাদের অভিপ্রেত হইল। কিন্তু হিন্দুর হৃদয়ে তাহা সহ্য হইবে কেন? দুই এক কথায় অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। অনন্তর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে দৈবদুর্ব্বিপাকে হিন্দুর হোলি ও মুসলমানের মহরম পর্ব্ব একই সময়ে সংঘটিত হইল,

উভয় পক্ষই তখন ধর্ম্মোন্মত্ততার আবরণে যেন রণোন্মত্ত। স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য দাঙ্গা হাঙ্গামাও চলিতেছিল—মোসলমানগণ সহসা সহিষ্ণুতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সেই স্তম্ভের কিয়দংশ ভগ্ন করতঃ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। তাহাতে হিন্দুমাত্রই তখন ক্ষোভে ও রোষে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল, উভয় পক্ষের ভীষণ দাঙ্গায় শত সহস্র ব্যক্তি হতাহত হইল। ক্রোধোন্মত্ত মোসলমানগণকর্ত্তৃক সেই স্তম্ভের মূলোৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল—গোরক্তে হিন্দুর পবিত্র মন্দির সকল কলুষিত হইল। হিন্দুগণও ঘোর প্রতিহিংসাবশে মসজিদসমূহ চূর্ণ ও ভস্ম করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, যোগী সন্ন্যাসী, ধর্ম্মপ্রাণ ও ধর্ম্মভীরু আবাল বৃদ্ধ বণিতা পূর্ব্ব ধারণাবশে কুলস্তম্ভের ধ্বংস, দেবালয় ও দেববিগ্রহ-সমূহের এরূপ দুর্দ্দশা দৃষ্টে সনাতন ধর্ম্মের এককালীন বিনাশ ও প্রলয়ের প্রত্যক্ষ পূর্ব্বাভাস বোধে সকলেই পতিতপাবনী গঙ্গাগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য অকাতরে ঝাঁপ দিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। এ এক অপূর্ব্বঘটনা, হিন্দুসতীর জহর-ব্রতের ন্যায় এরূপ সর্ব্বজনীন অদ্ভুত ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। এক মুহূর্ত্তমধ্যেই কাশীর সকল সন্তপ্ত হিন্দুপ্রজা ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অনতিবিলম্বে বিশিষ্ট ও শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন ও বিবিধ বিধানে সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি সকলকে বলিলেন, যথারীতি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন করিলে বিশ্বনাথের কৃপায় পুনরায় ভারতের ধর্ম্মরক্ষা হইবে, অচিরে সকল গোলযোগ বিদূরিত হইবে এবং বিধর্ম্মীদিগের দ্বারা যাহাতে আর কোনরূপ অত্যাচার না ঘটিতে পারে, সে বিষয় ব্রিটীশ-গবর্ণমেণ্ট বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, এরূপ ভরসা দিলেন ও প্রতিজ্ঞাও করিলেন। অনতিবিলম্বে এই সকল দুর্ঘটনার শান্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীতীরে পুনরায় সেই ভগ্ন কুলস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিন ও তিথি লক্ষ্য করিয়া তখন হইতে প্রতি বৎসর এই স্থানে একটী মহতী মেলা বসিয়া থাকে। সেই ভগ্নস্তম্ভ এক্ষণে তাম্রাবরণে আবৃত আছে। এই স্তম্ভের নিকটেই মসজিদের ভগ্নাবশেষ বহু প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র স্থান মোসলমানগণকর্ত্তৃক অতি যত্নে সংরক্ষিত আছে, তথায় তাহারা নিত্য নেমাজ করিয়া থাকে।

কপালমোচন তীর্থ।

ইতিপূর্ব্বে লাটভৈরবের পার্শ্বে যে পুষ্করিণীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই কপালমোচন-কুণ্ড বা তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, আদিকালে ব্রহ্মাও পঞ্চানন বিশিষ্ট ছিলেন, পরে কালভৈরবকর্ত্তৃক তাঁহার পঞ্চমমস্তক দেহচ্যুত হইলে, তিনি চতুরানন বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু কালভৈরব এই ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্তহইয়া তাহার অপনোদনজন্য সেই ব্রহ্মাকপালহস্তে কাপালিক-ব্রত অবলম্বন করিলেন, নানা তীর্থ-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কোনস্থলেই তিনি

সেই কপাল মোচন করিয়া পাপবিমুক্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পরম পবিত্র পুণ্যভূমি কৈলাসসম কাশীধামে উপস্থিত হইলেন, কাশী পরিক্রমমধ্যে পদা-র্পণ করিবামাত্র তাহার সেই মহাপাপ বিমুক্ত হইল ও হস্ত হইতে সেই ব্রহ্মকপাল নিপতিত হইল। সেই ব্রহ্মকপাল পতিত হইয়াই এই সুবৃহৎ কুণ্ড উৎখাত হইয়াছে। ইহাই কপালমোচন তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাত্রীগণ এখানে আসিয়া স্নান ও পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

বখরিয়াকুণ্ড।

আলাইপুরা বা বেনারাসসিটী ষ্টেসনের দক্ষিণ-দিকে বথরিয়াকুণ্ড। কাশীখণ্ডে ইহাই বর্করিকুণ্ড বা ছাগকুণ্ড বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই কুণ্ড-টীর জলকর প্রায় ১০।১২ বিঘা হইলেও গ্রীষ্মকালে ইহা অনেকটা শুকাইয়া যায়। ইহার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে মোসলমানদিগের বস-বাসই অধিক, সুতরাং বথরিয়াকুণ্ড-মহল্লা অধুনা একপ্রকার দরিদ্র মোসল-মান-পল্লীরূপে পরিণত। এই কুণ্ডের চারিদিকে নানা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর সংস্কার হয় না, ক্রমেই তাহা যেন পরিত্যক্ত জঙ্গলে পরিণত হই-তেছে, ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহার অবস্থা এরূপ ছিল না। সেই অতীত দিবসে ইহার অবস্থার কথা কল্পনারচক্ষে দেখিবার বিষয়, তখন ইহা অতীব সুন্দর পরম শান্তিপ্রদ ও চিত্তবিনোদক ধর্ম্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তখন এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সুন্দর ও মনোহর মন্দির, স্তূপ, চৈত্য ও বৌদ্ধবিহারে সুশোভিত ছিল। আসিয়াখণ্ডের প্রান্ত-চতুষ্টয় হইতে কত শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মালোচনায় সততঃ এই কুণ্ডের চারিধার মুখরিত করিয়া রাখিতেন, সে ভাব এখন চিন্তা করিবামাত্র হৃদয় যেরূপ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়, কুণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলে সেইরূপই গভীর দুঃখ ও পরিতাপে হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। কুণ্ডের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কোনদিকেই আর সেই শ্রেণীবদ্ধ সোপানসমূহ নাই, সোপানের উপর প্রস্তরময় সেই বিস্তৃত পথ নাই, পথিপার্শ্বে সেই পবিত্র চৈত্য, স্তূপ, বা মন্দিরাদি নাই, সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ দলিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রাশি রাশি স্তম্ভ ও ইষ্টক-প্রস্ত-রাদি-উপাদান অপহৃত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। যাহা আছে, তাহা কতক বিধ্বস্ত, কতক ভগ্নাবশেষ প্রস্তর ও আবর্জ্জনা রাশিতে পর্য্যবসিত, আর অব-শিষ্ট পল্লীবাসী মোসলমানদিগের আবাসগৃহ ও মস-জিদে পরিণত হইয়াছে। বহুরূপী মহাকাল, তুমিই-ধন্য; তোমারধর্ম্ম—তোমার ক্রিয়া কলাপাদি কোন কিছুই আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই, তুমি পক্ষপাত-পরিশূন্য অনাদি ও অনন্তকাল; তোমার নিকট হিন্দু মোসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের, বিভেদ নাই; আবার তুমি যে সাক্ষাৎ আশুতোষ, যে তোমাকে ভক্তি করে, তুমি তাহারই যে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যাইয়া তোমায় অনেক সময় তাহারই সেবা করিতে হয়। তাই তোমায় যে যেমন ভাবে সাজাইয়া সুখী হয়, তুমি সেই রূপই ধারণ করিয়া তাহার চিত্ত-বিনোদন কর। ভারতের সেইদিন আর ইহদিন দেখিলে, তুমি মহাকাল, তোমার হয়ত সুখদুঃখ না হইতে পারে,

কিন্তু আমরা দুর্ব্বলচিত্ত মানব, অতীতের সহিত বর্ত্ত-মানের তুলনা করিয়া সন্তপ্ত হই, তোমায় ঠিক ভক্তি-তুষ্ট করিতে পারি না, তবে অক্ষম হৃদয়ের অসন্তো-ষের ফল তোমায় কলঙ্কিত করিয়াই যেন কথঞ্চিত তৃপ্ত হইয়া থাকি।

কুণ্ডের চারিপার্শ্বস্থ পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে সম্মুখভূমির উপর তিনটী উচ্চ মসজিদ এবং তাহার মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত বহুসংখ্যক সমাধিস্তূপ এবং সম্মুখে কুণ্ডে নামিবার প্রস্তরময় ভগ্ন ও জীর্ণ সোপানশ্রেণীর শেষ চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পশ্চিমদিকের মসজিদ-প্রাঙ্গণে একটী অনুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলে (চিরাকৃদান) বাতিদান বলিয়া মনে হয়, পল্লীবাসিগণ এখনও তাহার উপরেই সামান্য তৈলের প্রদীপ রাখিয়া কুণ্ড-পার্শ্বস্থিত সেই অসংস্কৃত পথ আলোকিত করিয়া রাখে। অষ্টস্তম্ভবিশিষ্ট মধ্য-মসজিদটী অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, বিশেষ উহার পশ্চাতের চারিটী স্তম্ভ যেরূপ ধরণে গভীর-ভাবে খোদিত, তাহাতে উহা যে বারাণসীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থাপত্যের আদর্শ সে বিষয়ে বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ এক বাক্যেই স্বীকার করেন। সম্মুখের স্তম্ভচারি-টীর নিম্নদেশ অষ্টপল বিশিষ্ট, মধ্যভাগ ষোড়শ পল বিশিষ্ট এবং উর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ গোলাকার। এই আটটী স্তম্ভই বিশাল দর্শন, কিন্তু অতি অল্পমাত্রই স্থাপত্যা-লঙ্কারে পরিশোভিত। পূর্ব্বপার্শ্বের মসজিদেও চারিটী প্রাচীন স্তম্ভ আছে। চারিটীই প্রায় একরূপ চতু-ষ্কোণ, কিন্তু একটী অতি সামান্য অলঙ্কারযুক্তভাবে খোদিত। এই মসজিদের প্রবেশদ্বার বিশেষ নয়না-কর্ষক। ইহার কারুকার্য্যগুলি প্রস্তরগাত্রে গভীর-ভাবে খোদ্দিত না হইলেও ইহার সুতীব্র সীমারেখা-সমূহ প্রকৃত সুশিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহা দেখিয়া বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য-শিল্প বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। কিন্তু ইহার উপরের অংশের কতক-গুলি কার্য্য দেখিলে আধুনিক অথবা মোসলমানদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যখন তাঁহারা সেই প্রাচীন মঠ ও স্তম্ভগুলিকে লইয়া মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন, তখনই এই সকল নূতন কার্য্য তাঁহাদিগেরদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকের মসজিদটী একটী চতুষ্কোণ চৈত্যের অনুরূপ। ইহার গম্বুজটী মোসলমানীয়, কিন্তু স্তম্ভ চারিটী যে প্রাচীন যুগের সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাদের নিম্নভাগ সরল ও চতুষ্কোণ, কিন্তু উপরের অংশ সারনাথের স্তূপের ন্যায় বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট, ইহার পশ্চিমদিকে 'বত্তিসথাম্বা' নামে একটী গম্বুজ-বিশিষ্ট মন্দির আছে। গম্বুজটী বোধ হয় মোসনমান-দিগের দ্বারা আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু স্তম্ভ-গুলি যে সেই অতীত যুগের, তাহা দর্শনমাত্রই সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার তিনপার্শ্বে তিনটী বারাণ্ডা আছে। ইহার পশ্চিমপার্শ্বে ও উত্তর পশ্চিমদিকে এবং কুণ্ডের পশ্চিমতীরে কয়েকটী মোসলমান ফকিরের সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে। যাহা হউক এই সকল স্থান বহুদিন মোসলমানদিগের অধি-কারভুক্ত রহিয়াছে, সেই কারণেই বোধ হয় কোন পুরাতত্ত্ববিদের দ্বারা মৃদগর্ভস্থিত অন্যান্য অংশ আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। আমাদের মনে হয়—কাশীর

সারনাথ স্তূপের পর এরূপ প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প-পরিপূর্ণ স্থান কাশীর মধ্যে আর নাই। এখনও যে সকল প্রস্তর-স্তম্ভ ও ছাদ স্তূপীকৃত মৃত্তিকায় সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে ইহা যে বৌদ্ধযুগে একটী শ্রেষ্ঠ সংঘারাম ছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় না। যদিও এই পুণ্যময় প্রাচীন তীর্থ ও সংঘারামের বহুসংখ্যক প্রস্তরাদি-উপাদান অপসারিত ও বিনষ্ট হইয়াছে, যদিও 'বেনারস-কলেজ' ও 'বরুণাব্রীজ' প্রস্তুতকালে ইহা হইতে যথেষ্ট উপদান সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি এমন অনেক জিনিস এখনও আছে, যাহাতে কালে প্রাচীন কাশীর অনেক পুরাতত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষা-রহস্য।

(১৮৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতাংশের পর)

মনোরঞ্জন রামেশ্বরের সঙ্গে সাহেবের বাঙ্গলা হইতে দুর্গাদেবীর নিকট আগমনপূর্ব্বক জলপান করিয়া বলিল, "পিসিমা একটা গল্প বলুন্ না।"

তিনি বলিলেন, "তোমরা গল্প শুন্‌তে বড় ভালবাস, তাই আজ আমি একটী গল্প বল্‌বো মনে করেছি। অযোধ্যার নাম বোধ হয় তোমরা দুজনেই শুনে থাক্‌বে। অনেক বছর আগে সেই অযোধ্যায় হরিশ্চন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন। যে সূর্য্যবংশে শ্রীরামচন্দ্র জন্মেছিলেন, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রেরও সেই বংশেই জন্ম। হরিশ্চন্দ্রের কয়েক পুরুষ পরে শ্রীরামচন্দ্র জন্মেছিলেন। এই বংশের রাজারা আজিও পশ্চিমাঞ্চলে আছেন। তবে, তাঁদের অবস্থা আর এখন সে রকম নয়।

তখন আমাদের এদেশে, নানা জায়গায় অনেক বন ছিল। ঐ সকল বনে মুনি ঋষিরা, ভগবানের আরাধনা করতেন, আর বনের ফলমূল খেয়েই দিন কাটাতেন। তাঁরা যে জায়গায় বাস করতেন, তাকে আশ্রম বা তপোবন বলা হ'তো। আশ্রমে যে সব জীব জন্তু থাক্‌তো, তারা সেখানে উপদ্রব করতো না বটে, কিন্তু সময় সময় অন্য জায়গা থেকে হিংস্র জন্তু এসে আশ্রমে উপদ্রব করতো। মুনি ঋষিরা কেবল শাস্ত্র নিয়েই থাক্‌তেন, কখনও অস্ত্র ব্যবহার করতেন না। কাজেই রাজারা এসে, সেই সব হিংস্র জন্তু বধ করে, আশ্রম রক্ষা করতেন।

যাঁরা জ্ঞানচর্চ্চা আর ঈশ্বরচিন্তা করেন, তাঁদের পক্ষে নিরামিষ আহারই ভাল। হবিঃ অর্থাৎ ঘৃত-সংযুক্ত অন্নকে যে হবিষ্যান্ন বলে, তা বোধ হয় তোমরা জান। যাঁরা নিরামিষ আহার করেন, তাঁদের পক্ষে হবিষ্যান্নই বেশ ভাল আহার। কিন্তু যাঁরা বলের কাজ করেন, মাংস আহারটা তাঁদের বড়ই প্রিয় হয়। মৃগমাংস সে সব লোকের খুব প্রিয়।

রাজাদিগকে রাজ্যরক্ষা করবার জন্য প্রায়ই যুদ্ধ প্রভৃতি বলের কাজ করতে হ'তো, সেই জন্য মৃগ মাংসও তাঁদের বড় প্রিয় ছিল। আবার সেকালে মৃগমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধাদি করবারও নিয়ম ছিল, কাজেই তাঁরা মৃগশীকার করবার জন্য মাঝে মাঝে বনে যেতেন। এইরূপ মৃগশিকারের নাম মৃগয়া।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্রও মৃগয়া করতে ভাল বাস্‌তেন'

তিনি একদিন শুন্‌লেন, নিকটস্থ তপোবনে বরাহের উপদ্রব হয়েছে। সেই কথা শুনে তিনি মৃগয়ায় বাহির হ'লেন। সঙ্গে অনেক সৈন্য-সামন্ত চল্‌লো।

তপোবনে বরাহের সন্ধান কর্‌তে কর্‌তে তিনি শুন্‌তে পেলেন, যেন কোনও স্ত্রীলোক, "রক্ষা কর, —রক্ষা কর" বলে কাঁদচে। তোমরা যদি ঐ রকম কান্না শুন্‌তে পাও, তা'হলে কি কর বল দেখি?—তোমাদের কাহাকেও রক্ষা করবার মত শক্তি আজো হয় নি। তা বলে কি তোমরা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার?—আমার বোধ হয় কখনই পার না। নিশ্চয়ই পাঁচজনকে ডেকে—সঙ্গে নিয়ে রক্ষা কর্‌তে যাও। রাজা হরিশ্চন্দ্রের গায়ে শক্তি ছিল—সঙ্গে সৈন্য—সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল, তায় আবার তিনিই দেশের রাজা—কাজেই তাঁকে, আর কা'কেও ডাক্‌তে হলো না। তিনি জান্‌তেন, অত্যাচারকারীরা দলে অনেক হ'লেও, ত'ারা তাঁকে দেখেই পালাবে। কারণ তিনি দেশের রাজা। রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকে দেখে সবাই ভয় করে, সুতরাং তাঁরে দেখে যে তারা ভয়ে পালাবে, তার আর সন্দেহ কি? আর যদি একান্তই না পালায়—তিনি দরকার হ'লে, অনায়াসেই তাহাদের মেরে ফেল্‌তেও পার্‌বেন। সুতরাং যে দিক থেকে কান্নার শব্দ আস্‌ছিল—সেইদিকে তিনি "ভয়নাই, ভয়নাই" বল্‌তে বল্‌তে, তাড়া তাড়ি চল্লেন।

একটু বনের ভিতর গিয়ে দেখ্‌লেন, একজন মুনি, সম্মুখে আগুন জেলে চক্ষুবুজে ধ্যান কর্‌চেন, তাঁর কাছে তিনটি স্ত্রীলোক বাঁধা রয়েচে। রাজা মনে কর্‌লেন, বুঝি এই লোকটা ভণ্ড মুনি—এই তিনটী স্ত্রীলোককে বলিদান করে, আগুণে হোম ক'রবে। সেকালে মানুষ পুড়িয়ে হোম ক[…]
বলি দেওয়া হ'তো। লোকে ধর্ম্মের না[…]
অন্যায় কাজ ক'রতো বটে, কিন্তু তা বলে ব[…]
আর ভাল নয়, কাজেই রাজার রাগ হ'লো।[…]
বল্‌লেন "অরে পাপিষ্ঠ, তুই কে? মিথ্যা ধ[…]
করে স্ত্রী-হত্যার উদ্যোগ করিছিস।" রা[…]
শুনে, মুনি চেয়ে দেখলেন, রাজার দিকে চো[…]
চেয়ে বল্লেন "আরে দুরাত্মা, জানিস্ না, আমি[…]
যে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে নাশ করেছে—[…]
তপোবলে, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেও ব্রাহ্মণ[…]
ক'রেছে—আমি সেই বিশ্বামিত্র।—আমি[…]
না কেন, তোর তাতে কি? তুই কেন[…]
আমার তপোবনে এসে, আমার ধ্যান ভ[…]
আজ এখনি আমি শাপ দিয়ে তো[…]
কর্‌বো।

রাজা দেখ্‌লেন, এ আর কেউ নয় স্ব[…]
বিশ্বামিত্র। তখন বিনয় ক'রে বল্‌তে[…]
"মুনিবর, আমি না বুঝে অত্যন্ত অন্যায় কা[…]
আমায় ক্ষমা করুন। স্ত্রীলোকের আ[…]
বিপন্নকে রক্ষা ক'রবো বলে এখানে এ[…]
কর্ত্তব্যপালন জন্য মন ব্যাকুল ছিল, তাই[…]
চিন্‌তে পারি নি। আমার অপরাধ ক্ষমা[…]

বিশ্বামিত্র বল্‌লেন "বিপন্নকে রক্ষা[…]
রাজধর্ম্ম, উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে দান করা[…]
রাজধর্ম্ম। ভাল, আমি প্রার্থী, আমা[…]
আমায় কিছু দান কর দেখি?"

রাজা বল্‌লেন "আপনার মত ব্য[…]
পৃথিবী দান কর্‌লেও যথেষ্ট হয় না।

করেন, আমি আপনার চরণে, আমার সমস্ত সাম্রাজ্য দান করে কৃতার্থ হই।"

বিশ্বামিত্র বল্লেন "ভাল আমি তোমার এ দান স্বীকার করলাম। এখন দানের উপযুক্ত দক্ষিণা দাও। পৃথিবী দানের উপযুক্ত দক্ষিণা খুব কম হলেও লক্ষ মুদ্রার কম হ'তে পারে না।"

রাজা সমস্তই দান করেছেন, দক্ষিণা কি দিবেন, ভাবিয়া ব্যাকুল হ'লেন, শেষে বল্লেন, "মহর্ষে, এখন ত আমার আর কিছু নাই, আমার দেহের এ রাজবেশ এও ত দে'ওয়া হয়েছে, কেবল, এখন আমার দেহমাত্র সম্বল। আমায় সময় দিন, আমি উপার্জ্জন করে, দক্ষিণা প্রদান করবো।"

বিশ্বামিত্র বল্লেন, "ভাল, ভাল, তাই হোক ; আমি তোমায় এক মাস সময় দিলাম। তোমার, তোমার পত্নীর আর তোমার পুত্রের দেহ ব্যতীত আর কোনও দ্রব্যে তোমার অধিকার নাই। তুমি এখন তোমার প্রদত্ত রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র গমন কর, একমাস পরে আবার দেখা হবে। সেদিন নিশ্চয়ই দক্ষিণার টাকা চাই। না দিলে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করবো।"

রাজা তখনি নিজের রাজবেশ ত্যাগ ক'রে মুনি-দত্ত বল্কল পরলেন, এবং রাজধানী হতে নিজ পত্নী আর পুত্রকে, সঙ্গে করে শিবপুরী বারাণসীতে গেলেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণের নিকট নিজের পত্নী ও পুত্রকে এবং এক শ্মশান-চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় ক'রে, বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করলেন। ভেবে দেখ রাজা কি রকম দাতা।

তোমাদের হয়ত বিশ্বামিত্রের উপর বড় রাগ হ'চ্চে। কিন্তু, তা হবার কিছু কারণ নাই। আগুনে না পুড়লে যেমন সোনা খাঁটি কি না বোঝা যায় না। তেমনি বিপদ না হ'লে মানুষের মহত্ব বোঝা যায় না।

রাজা, আত্মবিক্রয় করে চণ্ডালের চাকর হলেন, এখন তাঁর কাজ হলো শ্মশান রক্ষা, আর সেই চণ্ডালের শূকর পালন। শ্মশানে যে সকল লোক সৎকার করতে আসতো, তাদের কাছ থেকে, দান আদায় ক'রে, নিজ প্রভুকে দিতে হ'তো। প্রভু তাই থেকে তাঁর আহারের উপযুক্ত কিঞ্চিৎ অর্থ দিতেন। তাইতে তিনি জীবন রক্ষা করতেন।

এদিকে শৈব্যারাণী আর রাজপুত্র রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকলেন। রাণীকে এখন দাসীর কাজ করতে হতো আর রাজপুত্র ব্রাহ্মণের পূজার ফুল তুলতেন, হঠাৎ একদিন সর্পাঘাতে রাজপুত্রের মৃত্যু হ'লো। সেখানেত আত্মীয় স্বজন কেউ নাই। কাজেই শৈব্যাকে, মৃতপুত্রের সৎকার করতে যেতে হলো। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটি নিয়ে, যেখানে রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের কাজ করতেছিলেন সেইখানে গেলেন। রাজা রাণীতে আবার দেখা হ'লো। এমন সময় বিশ্বামিত্র এসে, রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে দিলেন। তারপর মুনি প্রকাশ করলেন, যে সেই শ্মশানপাল রাজা হরিশ্চন্দ্র, তাই জানতে পেরে, ব্রাহ্মণ শৈব্যা রোহিতাশ্বকে এবং চণ্ডাল রাজাকে দাসত্ব হতে মুক্তি দিলেন।

আর বিশ্বামিত্র, রাজাকে এইরূপে পরীক্ষা করে বড়ই প্রীত হয়ে রাজ্য ফিরে দিতে চাইলেন। রাজা বললেন, যা দান করা যায়, তা আর নিতে নাই। সুতরাং রাজর্ষি, রাজকুমার রোহিতাশ্বকে সমুদায় রাজ্য প্রদান করলেন। এখন আর বোধ হয় তোমাদের বিশ্বামিত্রের উপর রাগ নাই, কি বল? এখন বলদেখি, কেমন গল্প?"

রামেশ্বর বলিলেন "আমি একথা বাবার কাছে শুনেছিলাম। মনোরঞ্জনভাই বোধ হয় কখনও শোনে নাই।"

মনোরঞ্জন। "না, আমি কখনও শুনি নাই। এখন চল দাদা, একটু পুকুর-ধারে বেড়াইগিয়ে।" তখন দুইজনে, পুষ্করিণীর সন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে লাগিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

মহারাজ

অশোক সংক্রান্ত কিম্বদন্তী।

(১)

মগধের রাজা কালাশোকের দশটী পুত্র ছিল। কালাশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার দশটী পুত্র ক্রমান্বয়ে সিংহাসনারোহণ করিয়া ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন করেন। তাঁহারা দ্বাবিংশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, নন্দবংশীয় নয়জন রাজা সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ইহারাও ক্রমে ক্রমে দ্বাবিংশ বৎসর রাজত্ব করেন।

চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন এবং মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতের উপর আধি-
পত্যবিস্তার করিয়া চৌত্রিশ বৎসর রাজদণ্ড প
করেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র
অষ্টাবিংশ বৎসর রাজত্ব করেন। বিন্দুসারের
রাজ্ঞীর গর্ভে একশত এক পুত্র জন্মগ্রহণ
জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুমান এবং কনিষ্ঠের
রাখা হয়। অন্যতম পুত্র অশোক, বিন্দুস
পশ্চিম ভারতের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। বি
গুরুতর ব্যাধির বিষয় অবগত হইয়া অশোক
পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পাটলিপুত্রে
করেন। রাজধানী পৌছিয়া তিনি জ্যে
সুমান ও অন্য অষ্টানব্বই ভ্রাতায় প্রাণসংহ
সিংহাসনাধিরোহণ করেন। তিনি কেবলমা
প্রাণহানি করেন নাই। অশোক এই হইত
অশোক এই নামে আখ্যাত হইতে থাকেন

রাজকুমার সুমান যখন মৃত্যুমুখে পতিত
তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন এবং বহুকষ্টে
হইতে পলায়ন করিয়া অসভ্যদের সহিত বা
থাকেন। এই অসভ্যগণের দলপতি দয়াদ্র
সাত বৎসর সুমানপত্নীকে আশ্রয় দান করে
প্রাসাদ হইতে যেদিন তিনি পলায়ন করেন,
তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মে। জন্মমাত্র
মান হইল যে, এই বালক কালে বিশেষ ধা
এবং সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম কালেই বা
গ্রহণ করিবে।

একদিন এই স্বধর্ম্মনিরত বালক অশো
পথে পড়াতে, রাজা তাঁহাকে রাজসভায়
কহিতে অনুরোধ করিলেন। বালক রাজ
কোন যতি না থাকায় সিংহাসনই তাঁহ

আসন বিবেচনা করিয়া রাজসিংহাসনেরদিকে অগ্রসর হইলেন। অশোক ইহাতে বুঝিতে পারিলেন যে, বালক সামান্য নয় এবং তাহাকে নিজ সিংহাসনে বসাইয়া বিশেষ সমাদরের সহিত আহারাদি করাইলেন।

আহারান্তে রাজা বালককে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক এত সুন্দররূপে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিলেন যে, রাজা তদ্দণ্ডেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং শ্রমণদিগকে যথেষ্ট ধনদান করিলেন। পরদিন বালক বত্রিশজন বৌদ্ধ-যতিসহ রাজপ্রাসাদে আসিয়া জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই ঘটনা অশোকের সিংহাসনারোহণের চারি বৎসর পরে ঘটে। যে ষষ্টি-সহস্র ব্রাহ্মণ নিত্য অশোকদত্ত নানারূপ সুখাদ্য আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেন, তাহাদের অশোক দূরীভূত করিয়া দিলেন। তাহাদের স্থানে ঐ সংখ্যক বৌদ্ধযতিদের রাজা রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিয়া ষোড়শোপচারে সেবা করিতে লাগিলেন। একদিবস আহারান্তে রাজা বৌদ্ধ কর্ম্মপদ্ধতির ধারার সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে যতিগণ উত্তর করিলেন যে, ধারার সংখ্যা চুরাশী হাজার। এই সংবাদে তিনি চুরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজশিল্পীদের ভারতের স্থলে স্থলে চুরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণেব আদেশ প্রদান করিলেন। শীঘ্রই রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল। এতদ্ব্যতীত রাজধানীতেও তিনি একটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিলেন। এই সকল স্তূপ নির্ম্মাণে মাত্র তিন বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল এবং একই দিনে এই স্তূপ-নির্ম্মাণ-সংবাদ মহারাজের নিকট পৌঁছিয়াছিল। ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অশোক এক নিমেষেই এই সকল স্তূপ দর্শনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যক্ষগণ রাজা অশোকের ভৃত্যের কার্য্য করিত এবং তাঁহার ব্যবহারের জন্য প্রত্যহ জল, সুস্বাদু-ফল আনয়ন করিত।

(২)

বিন্দুসার বর্ত্তমানে অশোক যখন অবন্তীপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি দেবীনাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার মহেন্দ্রনামে একপুত্র ও সঙ্ঘমিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অশোক রাজসিংহাসনারোহণ করিলে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা পাটলীপুত্র-গমন করেন। তথায় সঙ্ঘমিত্রের অগ্নিব্রহ্মের সহিত শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের ফলে সুমান নামক এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন।

অশোকের সিংহাসনারোহণের তিনবৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা তিষ্য, অগ্নিবর্ম্ম ও সুমান যতি-ব্রত গ্রহণ করেন। এই সময়ে চুরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছিল এবং অশোক লক্ষ লক্ষ যতি নিমন্ত্রণ করিয়া এক মহতীসভা আহ্বান করেন। এই সময় হইতেই অশোক, ধার্ম্মিক অশোক নামে পরিচিত হইতে থাকেন। কিছুদিন পরে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা ব্রতগ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে অর্থাৎ বুদ্ধের জন্মের ২৩৬ বৎসর পরে পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসভার অধিষ্ঠান হয়।

এই সময় লঙ্কায় রাজা তিষ্য নামে এক নরপতি ছিলেন। যদিও অশোকের সহিত তাঁহার কোন দিনও সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই, তথাপি তিনি অশোকের সহিত মৈত্র্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। লঙ্কার অধীশ্বর অশোকের প্রতি তাঁহার সম্মান ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ, পাটলিপুত্রে এক দৌত্য-বাহিনী প্রেরণ করেন। লঙ্কা হইতে তাম্রলিপ্ত-বন্দরে পৌঁছিতে তাহাদের সাত দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল; পরে তাম্রলিপ্ত হইতে রাজধানী পৌঁছিতে আরও সাত দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। অশোক বিশেষ সমাদর ও যত্নের সহিত দৌত্য-বাহিনীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মিত্র যে সকল মূল্যবান উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া মিত্রকেও নানাবিধ উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিংহলরাজ-প্রেরিত-দূত পাঁচমাস পাটলিপুত্রে অতিবাহিত করিয়া পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। অশোক দূতমুখে নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন "আমি বুদ্ধদেবে আশ্রয় লইয়া তাঁহার উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। আপনিও এই মতাবলম্বী হইয়া বুদ্ধে আশ্রয় লউন।"

পাটলিপুত্রনগরে তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসভা নয়মাস-কাল অধিষ্ঠানান্তে রাজগুরু তিষ্য স্থির করিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্ধতি বিদেশে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক এবং সেই হেতু, কাশ্মীর, গান্ধার, মহীশূর, কানাড়া, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, যাবনিকদেশ, সুবর্ণ-ভূমি এবং সিংহলে দূত প্রেরণ করিলেন। সিংহলে যে দৌত্য-বাহিনী প্রেরিত হয়, তাহাতে রাজপুত্র মহেন্দ্র এবং অশোকের ভাগিনেয় সুমান প্রেরিত হইয়া-
ছিলেন। রাজার অনুমতি লইয়া মহেন্দ্র
যাইবার পথে তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ
ছিলেন। এই ব্যাপারে পূর্ণ ছয়মাস স
বাহিত হইয়াছিল। মহেন্দ্র তাঁহার মাত
পৌঁছিলে তিনি বিশেষ আহ্লাদিত হইয়া
বক্ষে ধারণ করিলেন এবং তিনি যে চৈ
করিয়াছিলেন, তথায় কুমারকে বাস করিতে
দিলেন। মহেন্দ্রের আদর্শে বন্ধুনা
মাতার এক আত্মীয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ
মহেন্দ্র তথায় আরও একমাস অতিবাহি
পরে বন্ধু ও অন্যান্য সহকারীসহ
পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইয়া সিংহলের অ
পর্ব্বতের উপর অবতরণ করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে মহেন্দ্র যে প্রথম ব
করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সিংহলর
চল্লিশ সহস্র প্রজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে
কুমারী অনুলা তাঁহার পাঁচশত স
অভিনব ধর্ম্ম গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন,
স্ত্রীগণকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে ব্রতী করিতে পা
জন্য রাজকুমারী ও সঙ্গিনীগণ বে
করিতে পারিলেন না। সিংহলরাজ বি
পর পুনরায় তাঁহার ভাগিনেয়কে পা
করিলেন। অশোক রাজকুমারী
বোধি-বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া
করিলেন। তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত রাজা
মিত্রাকে পৌঁছাইয়া দিয়া পাটলিপু
ফিরিলেন।

যে তরীতে বোধিবৃক্ষের শাখা

ছিল, সেই তরীর যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সেই জন্য সমুদ্র প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। নানাপ্রকার পুষ্প সেই তরীর চতুঃপার্শ্বে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং শ্রুতিমধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে বৃক্ষশাখা সিংহল পৌছিলে সিংহলরাজ বিশেষ সমাদরের সহিত মহামেঘোদ্যানে বৃক্ষশাখা প্রোথিত করিলেন। শাখা হইতে আটটী প্রশাখা শীঘ্রই দেখা দিল এবং সিংহলের আট-স্থানে এই আটটী প্রশাখা প্রোথিত হইল। সিংহল-রাজ মহেন্দ্রের বাসের জন্য মহাবিহার নামক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সিংহলে এই মঠই সর্ব্ব-প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এই মঠ নির্ম্মাণের অব্যবহিতপরেই চৈত্যগিরি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজকুমারী সঙ্ঘামিত্রা সিংহল পৌছিয়া তত্রত্য রাজকুমারী অনুলা ও তাঁহার একসহস্র সঙ্গিনীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। সিংহলরাজ সঙ্ঘা-মিত্রার বাসের জন্য মঠ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সঙ্ঘা-মিত্রা এই স্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মহেন্দ্র সঙ্ঘামিত্রার মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন বোধিবৃক্ষের শাখা প্রেরণে অশোক ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার পৌত্র সুমান বুদ্ধদেবের স্মৃতি-চিহ্নের জন্য সিংহল হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অশোক তাঁহার মিত্র সিংহলরাজকে নানারূপ চিহ্ন প্রদান করেন এবং দেবতাধিপতি শক্র সিংহলে প্রেরণ জন্য বুদ্ধের অস্থি প্রদান করেন। মহাসমারোহে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া এই সকল চিহ্ন স্থাপনা করা হয় এবং স্থাপনকালীন ভূমিকম্প হওয়াতে লক্ষ লক্ষ লোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। সিংহল-রাজ-ভ্রাতাও এই সময় যতিব্রত গ্রহণ করেন এবং সিংহলে সেই সময় ত্রিংশ সহস্র ব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

(৩)

সাত বৎসর ধরিয়া দেশে অধর্ম্ম প্রচারিত হই-তেছিল এবং যতিগণ হতাশ হইয়া ক্রিয়াকাণ্ড স্থগিত রাখিয়াছিলেন। ইহার প্রতিকারকল্পে অশোক তাঁহার এক মন্ত্রীকে আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী তথায় পৌছিয়া যতিগণের নিকট রাজাদেশ প্রচার করিলে, যতিগণ এ আদেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। এই হেতু মন্ত্রী ক্রোধান্ধ হইয়া নিজহস্তে যতিগণের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করেন। রাজ-ভ্রাতা তিষ্য তাহাকে প্রতিহত করেন।

রাজা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া প্রায়শ্চিত্তের ইচ্ছা করিলেন এবং সেই হেতু বৃদ্ধ যতি তিষ্যকে আহ্বান করিলেন। তিষ্য রাজধানী পৌছিলে রাজা তাঁহাকে যথোপযুক্ত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে কোনও অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করিতে বলিলেন এবং স্থানবিশেষে ভূমিকম্পের প্রকোপ দেখা-ইতে অনুরোধ করিলেন। ঋষিকল্প তিষ্য একটী চতুষ্কোণ স্থলের দুইদিকে একখানি রথ, একটী অশ্ব, একটী মনুষ্য ও একপাত্র জল স্থাপন করিলেন। এই সকল দ্রব্যগুলির অর্দ্ধাংশ ঋষির আদেশে কম্পিত হইতে লাগিল। অপরার্দ্ধ স্থির হইয়া থাকিল। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মন্ত্রীর অপরাধের জন্য রাজা দোষী হইয়াছেন কি না? ঋষি উত্তর করিলেন যে, অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য অশোক দায়ী নহেন।

রাজা ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহে এবং নগরে নগরে আদেশ পাঠাইলেন যে, সকল যতিগণই যেন, পাটলিপুত্রতে সমবেত হয়েন। সকলে সমবেত হইলে রাজা রাজগুরুর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক যতিকে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে রাজগুরু ব্যবস্থাদিলেন যে. বৈবাজ্যবাদি সম্প্রদায়ের মতই প্রশস্ত এবং সকলেরই সেই মত গ্রহণ করা উচিৎ। ষষ্ঠিসহস্র যতি এই মত গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেন। সহস্র যতি লইয়া একটী সভাগঠিত হইল। এই সভা নয়মাস অধিষ্ঠান থাকিয়া মতামত ঠিক করিয়া দিলেন। সভা ভঙ্গান্তে ভূমিকম্প হইল ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিলেন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৪)

রাজভ্রাতা তিষ্য একদিন উদ্যানে ভ্রমণকালীন দেখিতে পাইলেন যে, একদল হরিণ ইচ্ছামত বনে বিহার করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজভ্রাতার মনে উদয় হইল যে, যতিগণ ইচ্ছামত আহারাদি করিলে তাঁহারাও যথেষ্ট সুখী হইতে পারেন। তিষ্য অশোকের নিকট এই বিষয়টী নিবেদন করিলে অশোক তিষ্যকে সাতদিবসের জন্য রাজপদে প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন এবং বলিলেন যে, সাতদিবসান্তে তিনি তিষ্যকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। সাত-দিবসান্তে অশোক তিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি এই সাত দিবসে এত রুগ্ন হইয়াছেন কেন? তিষ্য উত্তর করিলেন যে, মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়াতে এত রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন যে বৎস, সাতদিন রাজদণ্ড পরিচালনা কালীনও তুমি আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়াছ, কেননা তুমি মৃত্যুভয়ে ভীত। যতিরা যদি আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইবে এবং মোক্ষফল লাভের জন্য তাহারা আর ব্যগ্র হইবেনা।

তিষ্য সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মহাধর্ম্মরক্ষিত নামক একবৃদ্ধ যতি বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন এবং এক ভীমাকার হস্তী তাহার শুণ্ডদ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। রাজভ্রাতা এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি কিরূপে এই প্রকার হইতে পারেন, সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহা-ধর্ম্মরক্ষিত তাঁহার মনের অবস্থা প্রণিধান করিয়া এবং আরও অলৌকিক দৃশ্য দেখাইবার জন্য ব্যোম-চারী হইয়া অশোকরম্য পুষ্করিণীতে অবগহনার্থ শূন্যে তাঁহার বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া স্নান সমাপন করিলেন। তিষ্য এই দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যতি-ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক যতিব্রত গ্রহণ করিল।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

সাময়িকসংবাদ ও বিবিধপ্রসঙ্গ।

এই ভাদ্র সংখ্যায় "শিল্প ও সাহিত্যের" ৯ম খণ্ড সম্পূর্ণ হইল।

* * *

শ্রীশ্রী৺ দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই ১০ম খণ্ড "শিল্প ও সাহিত্যের" প্রথম অর্থাৎ আশ্বিন বা শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

শারদীয় সংখ্যায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সুলেখকগণের বিবিধ সুচিন্তিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইতেছে।

* * *

শ্রীমতী আনিবেসান্তের বিশেষ চেষ্টায় ও যত্নে লণ্ডনপ্রবাসী ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত ৩৯ নং ফেলোজ রোড, হেমষ্টেতে একটী বাসা সংস্থাপন করা হইয়াছে। এখানে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইবে, এবং ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প লাগিবে।

* * *

পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষার জন্য, সার আর্ণেষ্ট কেসেল ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইংলণ্ডপ্রবাসী দরিদ্র জর্ম্মাণ ও জর্ম্মণী-প্রবাসী দরিদ্র ইংরাজদিগের ভরণ পোষণের জন্য রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাট্ উইলিয়মের অনুমত্যনুসারে এই টাকা ব্যয়িত হইবে।

* * *

লর্ড মিণ্টো কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এই উপলক্ষে পঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায় ১১ই সেপ্টেম্বর ও তথাকার হিন্দু সম্প্রদায় ১৮ই সেপ্টেম্বর লর্ড মিণ্টোর সম্বর্দ্ধনা করিবেন স্থির করিয়াছেন। আগামী ১৫ই নবেম্বর টাউনহলে সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ হইতে একটী পার্টি দেওয়া হইবে।

* * *

সিমলার সন্নিহিত ধর্ম্মপুরে মিঃ বি, এস মালাবারির প্রতিষ্ঠিত যে যক্ষ্মারোগীর আশ্রম আছে, তাহা অতঃপর সম্রাট এডওয়ার্ডের নামে অভিহিত হইবে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ইহাতে সম্মতি ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

* * *

দিনে বায়স্কোপ।—পূর্ব্বে অন্ধকার না হইলে বায়স্কোপ দেখান যাইত না। নূতন এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহাদ্বারা দিনে জীবন্ত-মূর্ত্তি প্রদর্শন করান যাইবে। রৌদ্রের তেজ যতই বেশী হইবে, চিত্র ততই পরিষ্কার দেখাইবে। ইহার প্রণালী অতি সহজ।

* * *

দেশীয় পেন্সিল।—স্মল ইন্‌ডাষ্ট্রী ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোম্পানী হইতে পেন্সিলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সম্প্রতি বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারল মিঃ কটন ও প্রিণ্টিং ষ্টেসনারী প্রভৃতির কণ্ট্রোলার মিঃ কগ্‌সোরেল ও মিঃ গ্রেহাম পেন্সিলের কারখানা পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, উৎকৃষ্ট গ্রাফাইট প্রস্তুত হইয়াছে। কপিং পেন্সিল, রঙ্গীন পেন্সিল উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সকলে এই দেশীয় 'তারা' পেন্সিল ব্যবহার করিবেন, ইহাই আশা করি।

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রার্থনা	(শ্রীঅরবিন্দ দত্ত)	২১৫
বাঙ্গালায় আর্য্যজাতির আগমন	(সেবানন্দ—শ্রীবাবুরাম কয়াল)	২১৬
কাশীধাম	(শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী)	২২২
শিক্ষা-রহস্য	(শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব)	২২৬
মহারাজ অশোক সংক্রান্ত কিম্বদন্তী	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার)	২২৯
সাময়িকসংবাদ ও বিবিধপ্রসঙ্গ।		২৩৩